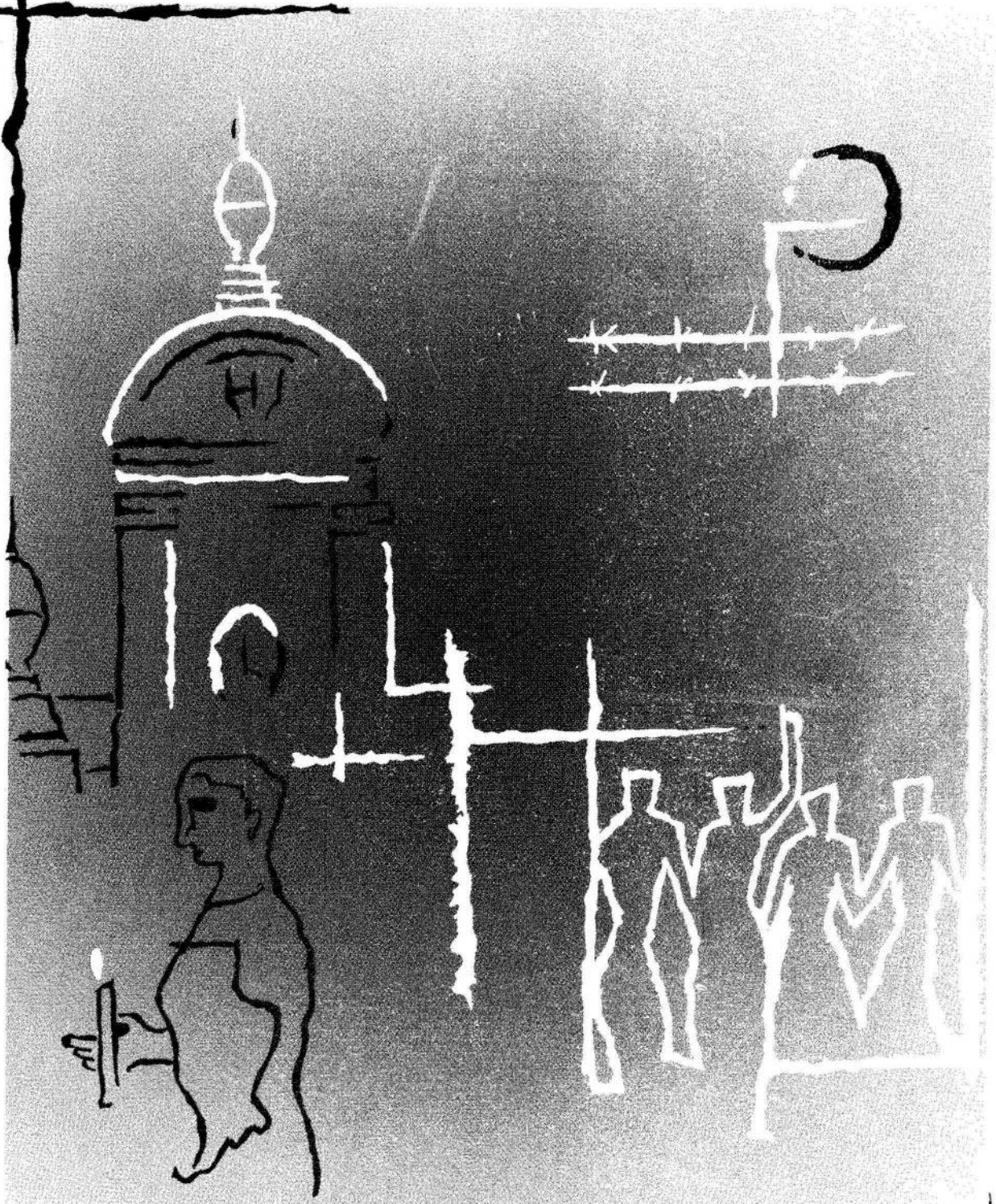

2007-'08

THE PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

এবার

আপনিও সংবাদ শিরোনামে !!!

আপনিও রিপোর্টার বা ফোটোগ্রাফার !!!!!

প্রতি পক্ষে সবার মনের কথা,

অলি গলির সব খবর নিয়ে.....

আসছে

আপনার নিজস্ব প্রতিনিধি

রানার

.....সময় হয়েছে নতুন খবর আনার

"SHILPANGAN" , PHASE - I I, PLOT NO. LB- 1
SECTOR- III, KOLKATA - 700 091
E-mail : runner_kolkata@yahoo.co.in

The Presidency College Magazine

(Volume 68)

2007—2008

...Shall always be Victorious (Acknowledgements)

Sanjib Ghosh	(Principal)
Devasish Sen	(Bursar)
Abhijit Dutta	(Teacher-in-charge of Publications)
Shravani Ray	
Himungshu Kumar	(Teacher Editors)
Amitava Chatterjee	
Debnarayan Chakrabarti	(Senior Librarian)
Bijoy De	(Librarian)
Swapan Kumar Mukherjee	(Library Staff)

- Cover Design & Illustrations : ANITESH CHAKRABORTY

MAGAZINE COMMITTEE

Sanjib Ghosh	(Principal)
Devasish Sen	(Bursar)
Abhijit Dutta	(Teacher-incharge, Publication Council)
Shravani Roy	
Amitava Chatterjee	(Teacher Editors)
Himangshu Kumar	
Avishek Ghoshal	(General Editor)
Sharmishtha Roy	(Editor, Hindi Section)
Soumik Ghosh	(Publications Secretary)

All Rights of Publication reserved by the Presidency College, Kolkata

Printers : Jayasree Press, 91/1B, Baithakkhana Road, Kolkata-9

Published in 2008 by The Magazine Committee, Presidency College, Kolkata

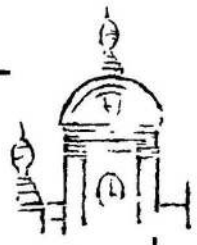

● *Contents*

■ **Forward**	Sanjib Ghosh	5
■ সম্পাদকীয়	অভিষেক ঘোষাল	7
■ सम्पादकीय -- *साहित्य : एक संजीवनी*	শর্মিষ্ঠা ঘোষ	8
■ **Muhammed Yunus—The Saviour of the Poor**	Amitava Chatterjee	9
Women—Boundary and Beyond	Debalina Banerjee	10
■ **Technology and Transformation of Sikh Warfare : Dal Khalsa Aganist The Lal Paltans, 1800-1849**	Kaushik Roy	13
■ **Thousand years of thoughts on food in Bengali poetry**	Abhijit Datta	23
■ মানুষের ভাষায় না-মানুষেরা	ডঃ দিলীপ নাহা	24
■ হুমায়ুন কবির ঃ এক অনন্য ব্যক্তিত্ব	স্বপন কুমার দে	28
■ সহজ কবিত্ব-উচ্ছ্বাস থেকে মনন— দীপিত সচেতন কবিত্বে উত্তরণ : বুদ্ধদেব বসুর কবিতা	ডঃ মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়	31
■ অমিতাভ দাশগুপ্ত, অমিতদা	দীপঙ্কর ভট্টাচার্য	34
■ 'উলগুলান'-এর পরে	জয়িতা দত্ত	37
■ রক্তকরবীর নামকরণ প্রসঙ্গে কিছু কথা	মলয় রক্ষিত	40
■ स्त्री अस्मिता की चुनौतियाँ	डॉ. रंजना शर्मा	41
■ শান্তি জল	সব্যসাচী দেব	43
■ তোমাকেই.....	সংহিতা সেন	43
■ দুটি কবিতা	ঋত্বিক মল্লিক	43
■ প্রান্তিক	তোর্সা বন্দ্যোপাধ্যায়	44
■ একটি কবিতা	সুদীপ্ত চৌধুরী	44
■ ক্ষনজন্মা	নবমিতা সান্যাল	45
■ হায়	রাতুল ঘোষ	45
■ অস্তিত্ব	অনিতেশ চক্রবর্তী	46
■ স্মৃতি, বিপন্নতা ইত্যাদি	সৌমিক ঘোষ	46
■ বাদীর কথা	স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী	47
■ পরিব্যক্তি	শ্রুতি গোস্বামী	47
■ মুঠো ভর্তি আমি	ছন্দক চ্যাটার্জী	47
■ ***Translation of* Two Famous Poems of Benoy Majumdar**	Samir Kumar Mukhopadhyay	48
■ **Lights Off**	Kausik Baisya	49
■ बुढ़ी आँखें	संध्या सिंह	50
■ वाह रे बेरोजगारी	बबीता प्रजापति	50

■ पहचान	निधि सिंह	51
■ समर अभी बाकी है	आनंद प्रसाद नोनियाँ	51
■ पूर्णता	कुसुम उपाध्याय	52
■ घर बसाने को	दीपक कुमार	52
■ हर्ज कर सकता है	दीपक कुमार	53
■ बहुत दिनों के बाद	प्रियंका कुमारी सिंह	53
■ उसका ईश्वर	शर्मिष्ठा घोष	54
■ **A Return to Holofernes**	Krishna Ghose	55
■ **Offending The Text : Mr. Peter Handke Speak-in-g!**	Arka Chattopadhyay	56
■ **The Seventh Seal : A search for the Divine...**	Anuparna Mukherjee	58
■ **Third World' and the dilemma of the 'left' : Rethinking the discourse of development**	Prosit Das	61
■ **An Ikebana of Fermi Problems**	Amrit Kumar	64
■ **Joie De Vivre**	Debajyoti Dutta	65
■ ঋত্বিক ঘটক ঃ সত্যানুসন্ধান, আত্মিকতা ও 'সুবর্ণরেখা'	দেবল ব্যানার্জী	67
■ বাজে গল্প	অভিজিত ঘোষ	69
■ শান্তিবাদী আইনস্টাইন	সঞ্জয় কুমার দে	72
■ শিল্প হিসেবে আবৃত্তি ঃ স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা এক "অকথ্য অলীক" বাস্তবতার খণ্ডচিত্র ও পূর্ণতার খোঁজ...	অভিষেক ঘোষাল	75
■ অসীম রায় ঃ কয়েকটি রাজনৈতিক গল্প	ঐশিক দাশগুপ্ত	78
■ উল্টো হাওয়া	মলয় ভট্টাচার্য	81
■ প্রত্যয়, অপ্রত্যয় ঃ পথিক, তরুণ, একজন কবি	দেবরাজ দাশ	83
■ তমসো মা জ্যোতির্গময়	শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়	86
■ 'কুটুম-কাটাম'	শুচিস্মিতা ঘোষ	87
■ চিত্ত যেথা ভয়শূন্য	অঙ্গনা	89
■ जौहर की प्रासंगिकता	प्रियांका कुमारी सिंह	90
■ **The Liberal Ideal**	Prof. Amlan Datta	93
■ **On Knowing : An Attempt at a Linear Epistemological Model**	Dipanjan Rai Chaudhuri	96
■ 'পথের দেবতা'র উৎস সন্ধানে	তপোব্রত ঘোষ	101
■ অমর্ত্য সেন — কোথা থেকে কোথায়	প্রফেসর দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়	106
■ **Editors and Publication Secretaries of the presidency college magazine**		111

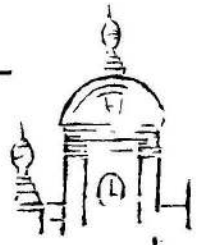

FORWARD

I feel very happy that the passage of the Presidency College Magazine that begun its journey way back in 1914—15 is continued through the publication of the 68th volume this month (February 2008). The enthusiasm and vigour of a galaxy of very bright young men and women is an inseparable part of the history of the College magazine; the annual publication of the magazine is an opportunity for all of us to remember with pride and gratitude the contribution of those who have made such a continued venture possible.

Bright contributions representing the creative genius of human minds at its best while reflecting on issues of our contemporary socio-cultural and personal lives find ventilation in the numbers of the Presidency College Magazine, An initiative to digitize the numbers has already been taken up to preserve the intellectual assets and to make them accessible to a wider audience in the future.

As a pioneer institution for Higher Education and learning in the country for nearly two centuries, Presidency College has been upholding the mission of education as a means to sustain greater human values through a combination of intellectual excellence and a passionate loyalty to academic integrity. Responding to the call of the hour the College his introduced a couple of inter-disciplinary programmes at the Undergraduate and Post Graduate Studies level, viz. B.Sc. Honours Programme in Biochemistry, P.G. Diploma Programme in Petroleum Exploration and Production (in collaboration with the Reliance Industries Ltd.). Another remarkable achievement of the College in this year has been the signing up of Memorandum of Understanding with the famous Ecole Polytechnic, Pairs for an academic exchange leading to admission to the Masters' Degree Programme for the selected students of the Mathematics and Physics Department with full scholarship.

The College has also submitted a plan to set up a national center for Biotechnology in the college. Plants to begin PG programmes in Biotechnology and Nanotechnology in near future are being seriously considered. The college will soon house a center for North East Studies under the leadership of Hindi Department : the process to set up the center has reached its final stage. Processes to offer Masters' Degree Programmes in Bengali have already been initiated. We are also trying to offer programmes in foreign languages in collaboration with international partners in near future.

The publication of this Magazine is in perfect harmony with the ongoing scheme of useful work at the College through a very eventful year. I wish to express my appreciation and gratitude to teachers, teacher editors, the publication secretary and each student involved with this work for their hard valuable work, commitment to excellence and sincere efforts without which this publication would not have been possible. I hope that this venture will pave the way for its continuity along the path of past glory and forthcoming innovation in future also.

Sanjib Ghosh
Principal
Presidency College, Kolkata

সম্পাদকীয়

"মৃত কতো পৌত্তলিক খ্রীষ্টান সিন্ধুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন;
কতো কাছে— তবু কতো দূর।"

প্রায় সেরকমই। প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশিত হবার পথ সম্ভাবনা প্রায় ছিলই না আর বলা যায়! অবশেষে... এগিয়ে এলেন যাঁরা, ধন্যবাদ তাঁদের। নিষ্কাম প্রেম বা ঐ জাতীয় কিছুই হবে হয়তো।

"হাল ছেড়ো না..."

নাকি...???

হতাশা, উত্তেজনা... কন্‌ফিউজড। চিন্তাশীল হবার ইঙ্গিত? হতেও তো পারে, আমরা সকলেই জানলা খোলা রাখতেই বেশী ভালোবাসি। উঁকি দেওয়ার প্রবৃত্তিও তো আমাদেরই। ফলে...

চিন্তা কিসের? বন্ধ রাখি সবকিছু। আর সান্ত্বনা দিই নিজেদের।

"দুই এক্‌কে দুই,
—পুড়ছে পুড়ুক, তুই আমি আয় লেপ মুড়ি দে' শুই।"

কিংবা

"পাঁচ এক্‌কে পাঁচ
—উটপাখি কি পার পাবে হায়, লাগবে গায়ে আঁচ!"

কত পড়া মুখস্থ করবো পরীক্ষার জন্য? অসহায় যাপনচিত্র। মনে তো পড়বেই বাকী পৃথিবী!! আঁচ তো লাগবেই যতো কমই হোক! আর তখনই...

আঁচ... থেকে আঁচর... থেকে ভালোবেসে লিখে ফেলা... আঁচর কাটা... হয়তো প্রথমবারের জন্যই... স্বপ্নভঙ্গের প্লুতস্বর স্বপ্নহীনতাকে প্রমাণ করে না, এই যা রক্ষে।...

কিছু লেখা এখনও বোঝায় সব শেষ হয়ে যাবার নয় এতো সহজেই...

স্নাতকোত্তর বিভাগ থেকে সাড়া পাওয়া গেল না এবারও তেমন। হয়তো আমাদেরই ব্যর্থতা।... আমাদের সব্বার।

"বেসুরো হয় মাঝে মাঝে, এটাও সত্যি কথা
সুর বেসুরের দ্বন্দ্ব নিয়ে এই তো নিজস্বতা..."

এক নিবিড়তর খোঁজ...। আরও খুঁজতে চাওয়া...। খুঁজে পেয়েও হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণা... হয়তো একটু অগোছালোই। তবুও...

"নাচতে নাচতে বাঁচো
ওই তো ডিস্কোথেক।
মনোরমা পড়ে আছে,
যৌবন তুমি মিলিও না তাল
রাষ্ট্রীয় কোন নাচে।..."

শোধনবাদ নয়, একে জীবন বলাই শ্রেয়। অন্ততঃ আজকের প্রেক্ষিতে...। ছাপার ভুল অকাতরে হতে পারে। কিই বা করতে পারি? ক্ষমাপ্রার্থী। একশো আটটা নীলপদ্ম খুঁজে আনতে প্রাণ হাতে নিতে পারি। নিতে পারি... এটুকু ভেবেই ক্ষান্ত থাকা যাক আপাতত।

"তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।"

কোপ পড়ে বেচারি ধূলোর উপর। নিপাট নিরীহ ধূলো। যা কিনা ঐতিহ্যানুসারী। প্রেসিডেন্সির দেয়ালে পোস্টার মারা নিয়ে আপত্তি ওঠে।... এমনকি ছাত্রমহলেও। ভগবান কি তবে সত্যিই নিদ্রা গিয়েছেন? 'এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;'

আপাততঃ, "ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কি ফল পাবে?"

ভালোবাসি, আমাদের কলেজকে। ভালোবাসি আমাদের কলেজজীবনকে।

ভালোবাসি, চলো, আবার নতুন করে ভালোবাসি আমাদের প্রেসিডেন্সির অলি-গলি-পাকস্থলী...

"মাথায় তবুও রক্ত-উন্মাদনা
এতোগুলো লাল, চিহ্নিত করি সব।
বিরুদ্ধে জাগে অকাল প্রস্তাবনা,
বলো প্রেম, আজ চুম্বন সম্ভব?"

—অভিষেক ঘোষাল

सम्पादकीय

साहित्य : एक संजीवनी

सामाजिक तथा मानवीय क्रिया-कलापों की सार्थक अभिव्यक्ति का प्रतिफलन साहित्य है। हमारी मानसिकता और भावात्मकता का परिचय हमारे साहित्य में मिलता है। साथ ही साथ भविष्य की दिशा भी तय होती है। साहित्य का उद्देश्य है- मानव के जीवन-संघर्षों की विकासगाथा को सामने लाना।

वर्तमान समय में बाजार उछाल पर है, पर 'मूल्य' क्षीण होते जा रहें हैं। एक तरफ सेंसेक्स बीस हजार के आँकड़े को पार कर नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नंदीग्राम और सिंगूर में 'मार्केट' बनाने के लिए 'मरघट' बनाया जा रहा है। ग्लोबल मार्केट के दबाव ने 'सेज' के लिए किसानों और मजदूरों का गला घोंटना शुरू कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक बदहाली के कगार पर खड़ा हैं। लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। सामान्य आदमी बदहाल होता जा रहा है और कारतूस की ब्रिकी जारी है।

अब प्रश्न उठता है कि इन सबमें आम आदमी कहाँ है? भूमंडलीकरण के इस दौर में हम अपने-अपने दायरे में सिमटते जा रहें हैं। मानवीय संवेदनाएँ क्षीण हेकर नष्ट हो रही है। समाचारपत्रों में हिंसा की खबर आम हो गई है और उन्हें पढ़कर पाठकों में कुछ खास प्रतिक्रिया भी नहीं होती।

मनुष्य की इसी संवेदना को साहित्य जीवित रखता है। तभी तो निराला की 'भिक्षुक' कविता में उस भिक्षुक की छवि साकार हो उठती है और तब 'पाठक' पाठक न रहकर 'सहृदय' हो उठता है। पंत के प्रकृति-चित्रण में प्रकृति क्रीड़ा करती है। यही कारण है कि कबीर की 'साखी' और रहीम के 'दोहे' आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सूर के 'पद' पढ़कर आज भी सहृदय के हृदय में बाल गोपाल के दर्शन होते हैं। परसाई व धूमिल के व्यंग, उनके लक्ष्य से कभी नहीं चूकते। आज भी एक बहुत बड़ी संख्या हैं, जिसमें प्रेमचंद सदा जीवित रहेंगे।

साहित्य केवल किसी कालविशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन-मात्र नहीं है, बल्कि यह संवेदना की स्वच्छ धारा को निरंतरता से प्रवाहित करता रहता है। यह एक संजीवनी है, जो हृदयहीन को सहृदय बनाता है और सहृदय को जीवन का सच्चा संदेश देता है। अतः हमारा यह कर्त्तव्य है कि इस संजीवनी को और समृद्ध बनाए, इस धारा को समाज में प्रवाहित करके समाज की बुराइयों को अच्छाइयों में बदलें।

इसी कर्त्तव्यपरायणता का एक छोटा-सा प्रयास 'प्रेसिडेन्सी कॉलेज मैगजीन' के माध्यम से वर्ष 1914-15 ई. से होता रहा है। इसी प्रयास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह अंक प्रस्तुत है। मैं आशा करती हूँ, कि हमारा यह प्रयास सफल रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रेसिडेन्सी कॉलेज के सभी गुरूजनों, सहपाठियों, अग्रजों तथा अनुजों को पत्रिका के प्रकाशन में सहयोग देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर से कामना करती हूँ कि नववर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो।

शर्मिष्ठा घोष

রানার

.....সময় হয়েছে নতুন খবর আনার

SUBSCRIPTION FORM

(Please give complete details)

RUNNER SUBSCRIPTION (26 ISSUES) AT RS. 50/-

Favouring Mindframe Publishers & Printers Private Limited, Payable at Kolkata

Cheque/DD No. ____________________

Drawn on (Specify Bank) ____________________ Dated ____________________

Name ____________________ Date of Birth ____________________

Address ____________________

City ____________________ State ____________________ Pin ____________________

Profession ____________________ Telephone ____________________ Mobile ____________________

Email ____________________

Terms & Condition : Subscription with effect from ____________________

● In case of out station cheque Rs. 10/- will charged extra. ● In case of cheque payment processing for subscription will start after realisation of the cheque. This is a limited period offer. ● Rates and offer valid in Kolkata only. ● Allow 3-4 weeks to processing of subscription. ● Please write your name and address on the reverse of the DD. ● Do not send cash. ● Mindframe Publishers & Printers Private Limited will not be responsible for postal delays, transit losses or mutilation of the subscription form. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts and forums in Kolkata only. ● Mindframe Publishers & Printers Private Limited reserves the right to terminate or extend this offer or any part there of at any time or to accept or reject any or all forms received at their absolute discretion without assigning any reason. Information regarding such cancellation/extension/discontinuance will however be published subsequently in the magazine.

Subscription forms are also available at, Mindframe Publishers & Printers Private Limited, Shilpangan, Phase II, Plot No. LB-1, Sector-III, Kolkata-700 091.

All requests that reach us by the 15th of a month will be processed in the same month. Subscription copies are delivered free at your door step between 2-8 days after release.

I agree to the terms & conditions.

Signature ____________________ Name ____________________

RECEIPT

Received with thanks from ....

Rs. .... by Cash/Cheque/DD No. ....

drawe Bank .... dated .... for 26 issues of RUNNER.

Subscription with effect from ....

Signature with seal

Mindframe Publishers & Printers Private Limited

Muhammed Yunus—The Saviour of the Poor

AMITAVA CHATTERJEE
Professor, Economics Department

The 2006 Nobel s award for peace has been given to Muhammad Yunus. It could not have been more appreciated. Peace may prevail only if social tensions may be reduced as far as possible. In capitalist economies that is only possible if the poor acquire a minimum amount of intitlement, which may be achieved by different routes Microfinance is one such route.

Muhammad Yunus is not particularly interested in developed economics and their assortment of problems. He is particularly interested in how to bring the people above the poverty line. He invented the concept of the 'Grameen Bank'. Bangladesh, as is well known, is not only one of the poorest among the LDC's but also the attitudes of the masses in that country is also very ancient and totally inimical to economic development. On this problem of the wrong attitude and mindset, I have heard an interesting anecdote from the revered Professor Yunees himself.

Once an extremely enterprising lady-entrepreneur went up to a large commercial bank in Bangladesh to ask for a large business loan. After the manager was completely satisfied about the fesibility of the proposal, he asked her most peculiar question 'Does your husband know about your project proposal?' She was taken back and replied whether it was absolutely essential for getting the sanctioning nod. The bank manager insisted that she bring her husband to the bank and confirm that he was aware of the project. Only then the loan could be sanctioned. Prof. Yunus thought that if it were the other way around and a gentleman came up to the bank with a business project proposal, would the manager asks the question 'Does your wife know about this project of yours? You should bring her to me.'

This story is highly suggestive about the mindset is Bangladesh. It shows the extent of gender bias in that country and gives us an important reason why the country lags behind in development. A huge group of people do not participate at all in the efforts of that country to develop the women of the country. They are looked down upon by their male country parts.

Muhammad Yunus took the following decisaion that very day he would mainly lend money to women entrepreneurs. Today 97% of the beneficiaries are women and the rate of return of loans taken by women is close to 100%.

This little story tells us a lot about the essence of economic development. It not only involves increase in per capita income and ensuring a better distribution of resources in the country, but also fundamental changes in attitudes of people and sociological and political changes as well. Hence the process of economic development is a complex and a multi-dimensional one. This complex process is being repeatedly emphasized by the other Nobel winning economist Prof. Amartya Sen, very much an alummus (1951 to 1953) of our great college.

Women—Boundary and Beyond

DEBALINA BANERJEE
Reader in English

The necessary function of **'society'** in literature should be to instill awareness in the readers not only of the world around them, its ambience, its underplaying vibrations, its different layers of consciousness and degrees of wavelength, but mostly of relationships and the resulting divergent and convergent interactions. For example, the issues of love (The definition of which still bewilders me!) and human compassion and their conforming to socio-romantic norms are matters not yet the subject of universal agreement and may be considered to be still obscured by a great deal of illusion and conventional wisdom. Relationships and their varied dimensions, become more significant in the context of women who are generally viewed as marginalised and victims to social ideologies much propagated by the influential sponsors of the intellect. Yet, perspectives have changed over the years and literatures has gained a certain freedom of readership and authorship where the present generation is concerned. Formerly, a woman-writer was heavily under criticism if she dared to transcend the taboo of expression. The work of the famous 18th Century Telugu poet Muddupalan — the classic **'Radhika Santwanam'** (Appeasing Radhika) was condemned by Kandu krui Veareshalingam, father of the social reform movement in Andhra and a novelist himself, who said that Muddupalani was an adulteress and a considerable portion of the book should never be heard by a woman, leave alone composed by one. The use of 'sringara rasa' in the book was a mere facade for the crude description of eroticism or sex. The fact did not surprise him, he said, since she belonged to the community of prostitutes and did not have the modesty natural to women. The classic was edited and reprinted by Bangalore Nagaratnamma in 1910, a learned woman, a patron of the arts, a musician and a distinguished courtesan. Nagaratnamma had retorted to Veereshalingam, writing that perhaps he considered modesty natural to women only. ".... it should be just as wrong for men who are considered respectable to write in that manner. But, several great men have written ever more 'crudely' about sex." Despite all efforts **Radhika Santwanam** was declared obscene, but clearly continued to circulate. Days have changed, and the greater the furor over a 'banned' book, the more it sells! However, The pretext of this presentation is certainly not publication and modes of circulation, but women in society as presented in literature in context. The canvas cannot be apical as it is governed by temporal limitations as prescribed by the seminar organisors as well as by my own responsibilities to my institution, but it can certainly explore the various in the depiction of women as characters in literature which is both a concave and convex mirror to society. It is not only the manner in which women have been pictured which must be considered but also the situations which have influenced their characterisations, and the inherent issues brought up is their character analysis. It may be expected that the stalwarts of Indian literature be discussed like Vyasdev, Valmiki, Chandidas, Tulsidas, Kabir, Bankim Chandra Chattopadhyay, Saratchandra Chattopadhyay, Premchand, R. K. Narayan, Amitava Ghosh and their peers, but I am sure that most of us are aware of the range of their works and a lot of material is available on them. I, therefore, selected three other writers on whom I would like to focus, inviting attention on how they have presented women in society in their writings. I have chosen Sudha Chauhan, Gouri Dutta, Ayyub and Manoj Das, selecting short pieces from their writing. It is interesting to note how they have explored the nature of social problems and codes of conduct prescribed by socio-economic situations. These situations are neither time nor area-specific, nor are they gender-specific. I am afraid there would be no focused feminist attitudes explored or feminist statements intended. My endeavour would be to share basically human relationships within the periphery of socio-economic scenario, and open to readers questions which come to our mind whenever we meet such incidents, and generally pass them by.

Sudha Chauhan was born in 1924 in Jabalpur amidst of The History of Indian Independence Movement. She grew up in the midst of political and literary interactions and activist participation by her

parents. After graduating from Nagpur University in 1944, she was married to Amrit Rai in 1945, the son of the distinguished Urdu novelist Premchand. It was one of the celebrated intercaste marriages of the time. She did her postgraduation from Benaras in 1956. Best known for her children's poetry, her major work for adult readers in **Mila Tej Se Tej** (As Strength Met strength) written in 1975. It provides a backdrop to her mother Subhadra Kumari Chauhan's works against the activities of the 1930s. Few women of the time wrote about their experiences or about public events, though several actively participated in the movements of the time. The origins of Subhadra Kumari Chauhan's writings were in real life, which were then transformed into something different by the magic of her imagination. In most of Subhadra-ji's stories, the dependent women in social fetters or the

woman voting her wrath finds expression. In her works, dated against an early background, we find women demanding the respect of society for themselves or establishing relationships of equality with the males. But often, a spirited woman is defeated and broken by the unjust, social norms of her days. [Ex. 'Manjli Rani', She was turned out of her in-law's and did not find shelter at her parents either. Pg 410, Women writing in India.] A woman's struggle to establish her identity and selfhood is the persistent core of her writings. It was not from personal experience, but from the general lot of her gender that she wrote. She herself was never in purdah and was a focus of talk due to her activities. She certainly felt the social pressure, a victim of building-social-strictures or constructs at a time of illiteracy and purdah. (Her own husband was a man of liberal views, within and without). Her mother-in-law's orthodoxy finds expression in **Dristikon**, a story about a heroine wishing to provide shelter to a pregnant child-window abandoned by her family. In real life too, she actively rebelled against class-caste barrier (story of the marriage feast with **Kaca-kana** : a nonfried cooked food that carries with it the possibility of ritual pollution through the touch of a person of a lower caste). **Ekadasi** portrays a brahmin child-widow propped against the traditional rituals of the time.

Gauri Dutta Ayyub was born in 1931 at Patna and educated at Patna and Viswabharati. She was a B.A. B.T. M.Ed. and retired from Srishikshayatan college. She was also against any class-caste-religion barrier. She actively participated in various committees and during the Bangladesh Freedom movement in 1971 and 1975 Emergency. She also actively in involved establishing 'Khelaghar' for primarily the Bangladesh war orphans. She was the wife of the famous philosopher and writer Abu Saiyed Ayyub and daughter of the philosopher Prof. Dhirendra Mohan Dutta. She has innumerable publications to her name. My focus is on four short stories from her collection called 'তুচ্ছ কিছু সুখ-দুঃখ'. The stories were written between 1957 and 1969. The first story **'দায়'** presents subtly the relationship between Rani and her nephew (brother-in-law's son) Subimol. It is certainly a relationship which is social, ideally filial, in our Indian context, but from that point it has departed and transcended traditional codes. What does the widowed Rani, aged thirtynine expect from Subimol aged thirty two? Why does she feel betrayed when the latter, at long last, consents to marry? How does she react to the evidence of affection and physical passion in him? Is it human, or, are her expectations and reactions immoral? On the other side of the coin is the story **'বেজোড়'**, portraying the companionship of lonely souls in widowed Sati and widower Ramesh Nandi, both grandparents but socially connected by the marriage of Sati's son to Ramesh's daughter. Their togetherness meets criticism in the eyes of Nilima, Ramesh's daughter. Is it mere jealousy of Nilima, missing out on her father's attention during childbirth, or is it the raised brow of social outlook criticising the intimacy of such relationships? Deep emotional involvement is certainly more significant that mere physical affairs! As the story draws to a close, Sati's right hand is clutched in both the hands of Ramesh as he views with deep discontent and anguish the imminent separation with her on his return to his residence at Asansol.

From a different perspective Gouri Ayyub deals with the apparent issue of the custom of dowry in 'বর' and 'চিরন্তনী'। The former questions the validity of relationship which commences with material demands in a Bengali middle-class scenario while the latter examines the question of marital security within the framework of a working-class Muslim community. In the latter a teenage girl, Husna, desires marriage in all its rainbow hues while her guardians bicker over the 'payment' which would cover the marriage expenses. In the background lurks the issue of immature motherhood which would certainly have its toll on the young

girl. It also reflects the layout of the family structure where the man of the family is dead or ill. The position of the women here is more pronounced, than in 'বর' which brings forth the guilt-consciousness of the elder sister who has made an intercaste marriage without dowry but whose sister is compelled to marry into a family and a person about whom she has reservations, only in consideration of her father's social status which has been supposedly demeaned by her elder sister's intercaste marriage. The subtle comparison between the two young husband is significant as is the remark at the end of the narration — 'শাস্ত্রে নাকি বলে বর সেই যাকে কন্যা বরণ করেছে। তা'হলে যে পণ্যকে শ্বশুর পণ আর যৌতুক দিয়ে কিনেছেন তাকে কী বলা হবে?— সভ্য সমাজে তাকে সম্ভবত ক্রীতদাস বলা হবে, তবে আমাদের সমাজে তার অন্য নাম।' She left the stories open-ended.

Manoj Das was born in 1934 at Balasore in Orissa. While still in school he published a collection of poems and started a periodical named **'Diganta'.** His stories in English were first published in 1967 and continued thereafter. A Marxist youth leader at one time, he gradually turned away from politics and in 1963 joined the Sri Aurobindo Ashram at Pondicherry where he is a Professor of English literature at the International Centre for Education. He edited a prestigious monthly **'The Heritage'** from 1985 to 1989. He received several honours including the Sahitya Akademi Award in 1972. In his collection **'Farewell To a Ghost'**, the story **'The Misty Hour'** relates the story of Aunt Roopwati, who, in her old age, suddenly revives an old passion, with disastrous consequences. Aunt Roopwati's aged advances, her apparently mean narrations and the refuting of them by Dhani Chowdhury brought about Chinmoy Babu's moral victory. Then what was the reason behind his offering of tears and flowers as a secret tribute at Roopwati's funeral pyre? Was she what she demanded to be?

The **'Concubine'** beautifully elevates the position of a supposed mistress of a Rajah to the heights of a faithful nurse and foster-mother of the prince and the confidante of the queen. What appeared to be was not what was! Sati Dei's reaction to the intended insult and humiliation by the young progressive Makhan Roy and his associates is subtly intellectual. It removed the stigma of the immoral association to the term 'concunbine' with an honest courage and defeated their purpose!

'Miss Moberley's Target' portrays Miss Moberley, an aged single-woman from the Anglo-Indian community of a small township, residing in an Old-Age Home. Her pre-occupation lies in throwing crumbs of bread and biscuits to Robinson, Mac and Badat, three dogs on whom she had been target practising. The three names belonged to the three men in her life with whom she felt emotionally involved, and the reactions which set in after the refusal of the first, the deception of the second and the death of the third created a turmoil within her solitary self. The woman in her felt betrayed and she felt she had missed the targets in her life which was become a tragedy of failures! The story building up to the moment when she attempts to shoot the dogs is certainly a climax in fury of self-disgust and an attempt at self-justification.

The stories highlight the position of women in various capacities and raise a number of issues universally important, especially in the context of India, even today! We have really not progressed far from these issues explored in the second half of the 20th century, though apparently we have reached a zenith in progress in the modern world.

Technology and Transformation of Sikh Warfare : Dal Khalsa Aganist The Lal Paltans, 1800-1849

KAUSHIK ROY
Professor, History Department

Key words : Campoos, *Dal Khalsa, Deras, Durbar, Feranghis, Grande Armee, Jagir, Karigar, Karkhana, Khalsa* Kingdom, *Lal Paltans, Pahul, Pancas, Pugris.*

Introduction

After 1600, a military transformation occurred in west Europe which in turn had global consequences. The rise of canon-equipped oceanic navies enabled the European maritime powers to establish coastal enclaves along the rim land of Afro-Asia. The new capital intensive armies of the west allowed the European trading companies to project power inland. The firepower heavy European infantry ealisy brushed aside the feudal cavalry forces of the Asian potentates. However, rapid diffusion of western military technology also occurred among the various non-western powers which in turn had wide social and political ramifications. The Asian monarchies adopted western military hardware in order to survive the onslaught of the European powers, For westernizing the militaries, the Asian dynasties were dependent on European technicians. In the 1620s, the Portuguese technicians at Macao were not only teaching the Chinese workers the art of casting guns but Ming officials also wanted Portuguese gunners for fighting the Manchus. This article examines the technological adaptation of the Sikh monarchy (Khalsa Kingdom) in Punjab when faced with the military threat of the *Lal paltans* (red coated soliders) of the East India company (hereafter EIC). A comparative analysis of the military establishment of the EIC with the *Khalsa* Kingdom's military infrastructure is attempted in order to explain British supremacy in 1849.

Traditional Sikh Warfare and Western Warfare Of the East India Company

The late sixteenth century witnessed Europe's new way of making warfare which involved scientific gunnery and disciplined infantry tactics. All these resulted in a battlefield revolution.[2] One of the chief characteristics of the firearms-equipped European infantry, was that the men were drilled in the style of the Roman legions.[3] In 1607, Maurice of Nassau introduced the first modern drill manuals for inculcating discipline and enhancing tactical capabilities of the infantry.[4] The gunpowder warfare seemed to have aided the emergence of modern state structure, which in turn was able to sustain the costly firepower armies. For instance, by the fifteenth century, firearm equipped infantry-artillery combination allowed the French monarchy to discipline the refractory chieftains thus giving birth to a centralized state structure backed by a fiscal system.[5] After 1550, armour penetrating frearms used by the infantry in the state's payroll, drove away the feudal cavalry armed with lance from the field.[6] The decline of feudalism resulted in the rise of absolute monarchical state. From the mid-seventeenth century, the impersonal bureaucracy pushed the semi-independent military entrepreneurs who had dominated warfare during the Thirty Years War to the margin of the European military landscape. As a result, the structre of the European armies was transformed. Instead of the rabbles delivered by the venal military contractors, the 'absolute' rulers raised standing armies. Permanent employment generated professional competence, as it was necessary to have minimum twelve months training to produce steady infantry soldiers.[7] In the sixteenth century Charles V's Spain created permanent regiments with its own uniforms, traditions and group loyalties. These units known as *tercios* emphasized camaraderie and martial spirit among the personnel.[8] During the seventeenth century, the French crown granted commissions to regimental commanders (i.e. Colonels) for supplying men.[9] But, from 1700 onwards, the French monarchy created a centralized bureaucratic machinery for mobilizing men, food and fodder for the rising number of soldiers under the crown.[10] In the eighteenth century West Europe experienced the rise of a civil bureaucracy

for administering the army. The impersonal bureaucrats were in charge of recruiting, equipping, feeding and clothing the soldiers.[11] Superior administrative and political capability of the centralized polities generated effective discipline on part of the Western forces. Further, the Europeans were well advanced in the field of international finance. The international credit network sustained the Western military activities across the globe.[12]

As early as the seventeenth century, at the technical level, the Indian method of warfare proved ineffective against the European warfare characterized by the use of bayonets, flintlocks, prefabricated paper cartridges, standardization of artillery's ball, ball weight and firing procedures.[13] During the eighteenth century the EIC's infantry armed with flintlock muskets and supported by light field artillery established military superiority over the Indian opponents.[14] Despite the rising effectiveness of artillery, most of the Indian powers due to their innate conservatism and inflexibility remain wedded to elephants and horses.[15] Let us analyze the nature of warfare in Punjab before the advent of Ranjit Singh.

George Forster, an EIC official made the following observation about the Sikh military in the last decade of the eighteenth century, 'Their military force may be said to consist essentially of cavalry; for though some artillery is maintained, it is awkwardly managed, and its uses ill understood; and their infantry, held in low estimation, usually garrison the forts, and are employed in the meaner duties of the service. A Sikh horseman is armed with a matchlock and saber of excellent material, and his horse is strong and well formed.'[16] In the 1780s, the Sikh chieftains were collectively able to mobilize about 100,000 horsemen.[17] Occasionally, the Sikh cavalry was accompanied by *zamburaks* (light guns mounted on camels) of 1.25 inch bore.[18]

A.L.H. Polier gives an account of the warfare conducted by the Sikh horsemen of the chieftains of Punjab. In 1775, he wrote :

'They [Sikhs] satisfied themselves in making a kind of Hussar war of it, cutting of stragglers and intercepting provisions. In this they excel. To say the truth they are indefatigable, mounted on the best horses that Indians can afford, each carries a matchlock of a large bore, which they handle dexterously enough, and with which they annoy considerably, avoiding at the same time going in large bodies or approaching too near. Such is their way of making war, which can only appear dangerous to the wretched Hindustani troops of these quarters, who tremble as much as the name of a Sikh.'[19]

The Sikh cavalry tactics was somewhat similar to the technique followed by the mounted Moroccan troops in the sixteenth century. The latter used arquebusiers from horseback for harassing the enemy.[20] In Germany during the 1540s the cavalry armed with short barrelled firearms practised the technique of trotting up to the enemy, firing and then trotting back. After reloading they advanced again to fire. The result was that the enemy in front of them faced a constant stream of fire. This was known as caracole tactics of the *reiters*. But, during the mid sixteenth century, the *caracole tactics* in Germany was replaced by the tecnhique of cavalry charging with sabers in hand.[21]

In general, the Sikhs avoided battles. A confrontation between the Sikh forces, writes Fauja Singh Bajwa, was disorderly and tumultuous affair in which men fought caring more for their individual gain and personal display of valour than for mutual collaboration and support in the common task of winning a victory collectively over the enemy.[22] It seems that traditional Sikh warfare was somewhat similar to medieval Irish warfare that was characterized by avoidance of battles, infliction of damage on the enemy's countryside, cattle raiding and diplomatic ability to exploit alliances.[23] This view is backed by the interpretations of the European observers who witnessed Indian warfare from the sharp end of the battlefield. According to a European officer of the second half of the eighteenth century, the aim of the Sikh chieftains leading force was to plunder the countryside and to burn towns and villages. In order to destroy the cultivation of the enemy country, the Sikh raiders carried off cattle.[24]

Dal Khalsa and Its Military Policy and Infrastructure

The *Khalsa* Kingdom and the *Dal Khalsa* (army of the Sikh theocracy) were creations of Ranjit Singh. In 1792, at the age of twelve, Ranjit succeeded to the leadership of Sukerchakia *misl* which controlled the terriotory between Lahore and river Attock.[25] In 1805, Jaswant Rao retreating before the EIC's force under General Lake arrived in Punjab. Ranjit then visited Jaswant Rao and learned many warlike exploits of the British from him. The *Maharaja* started to dread the power

of the British. Another incident raised the status of the western style infantry in Ranjit's eyes. In 1808, Thomas Matcalfe arrived at Amritsar from Delhi as the envoy of the British. Some of the Muslim sepoys of Metcalfe's escort were celebrating *Muharram*. Seeing this, about 4,000 *Akalis* attacked them. The 500 sepoys belonging to Metcalfe's escort easily checked the disorderly onsalught of the *Akalis* and killed a large number of them. The *Maharaja* was witnessing the scene from a distance. Ranjit saw that the arms and discipline of a few hundred sepoys were able to put to fight a few thousands of his most fierce warriors. After this in-cident, Rajnit decided that the must raise large numbers of westernized infantry.[26]

Whenever Rajnit Singh got a chance, he discussed military affairs with foreign visitors. Baron Charles Hugel while visiting Punjab had an audience with the *Maharaja*. Hugel made the following entry in his journal:

He asked me if I had served as a soldier, to which I answered in the affirmative, upon which he questioned me about our Austrain Army, and our wars with France .... asked me what I thought of his army, and whether it was in a state to encounter a European force. I answered that the Sikhs had long been remarkable for their bravery, and the discipline now introduced must no doubt have rendered them quite equal to such an encounter, "With equal forces?" he asked. "Doubtless," Said I.[27]

Ranjit like Haidar Ali, Tipu Sultan and Mahadji Sindia depended on the European instructors for westernizing his army. In total there were over 100 European officers in the *Dal Khalsa*.[28] In 1822, two officers of the Napoleon's *Grande Armee*, Jean Baptiste Ventura and Jean Francois Allard arrived at Lahore and sought employment with the *Maharaja*.[29] Ventura trained the Sikh infantry in western style. He encouraged enlistment of the Gurkhas.[30] Ironically, the EIC also followed the policy of recrufting Gurkhas in the Sepoy Army. Allard was in charge of training the cavalry.[31] An Italian named Avitabile had served with Napoleon's cavalry general Murat and was pupil of the Polytechnic School at Paris.[32] Avitabile and the American soldier of James Gardner were artillery instructors.[33]

Ranjit knew about the treachery of the European officers in the Maratha *Campoos* (westernized infantry brigade). Though the *Maharaja* was forced to depend on the European instructors due to their technical skill, he never trusted them. While sacking the German officer named Mevius, Ranjit Singha in a rage uttered: 'German, French of English, all these European bastards are alike'.[34] Ranjit evaluated them well before giving them employment. And once employed, Ranjit was loath to allow them to leave his service. Allard said to John Martin Honigberger : 'It is difficult to get an appointment here, but when obtained, it is still more difficult to quit it.[35] Ranjit tried to domesticate his European officer corps. The European officers were bound to marry Indian ladies and were barred to do anything that went against the tenets of Sikh religion. In addition the officers were forced to grow beards, wear *pugris* and take an oath that if required they would fight their mother country.[36] Besides the European mercenaries, the Indian soldiers from the disbanded Maratha *Campoos* who joined the *Dal Khalsa*, functioned as transmitters of western military knowledge. By offering them higher pay, Ranjit Singh also recruited deserters from the EIC's Sepoy Army.[37]

One becomes a Sikh through the institution of *pahul*. The observance of this institution makes one a member of the *Khalsa* or the Sikh Commonwealth. Partly due to their religion, the Sikhs were filled with martial ardour. The Skihs in Ranjit's time believed that in accordance to Sikhism, the pursuit of arms was not only admissible but was the religious duty of all the followers. Many Sikhs interpreted soldiering as the leading tenet of Guru Govind Singh's religion. The sacred book of Guru Govind is not confined to religious affairs only. Rather it abounds in accounts of battles which he fought, and of the actions which were performed by his most valiant followers. Courage is regarded as the highest virtue. In fact, Guru Govind makes martyrdom for their respective faith the highest virtue. Many leading interpreters of Sikh religion believed that Guru Govind had ordered his followers to plunder the Hindus and kill the Muslims.[38]

Nevertheless, the Sikh martial culture posed problems in westernizing the Sikh infantry. Initially the Sikhs were not eager to serve on foot. They looked down upon the culture of fighting on foot with a gun. The style of infantry fighting was against the Sikh warriors' masculine identity. In the Sikh cultural paradigm, a true warrior was a mounted soldier. The system of marching in step seemed silly to the Sikhs. The *sirdars* sneered at it and called it as *ruqsi-i-lulooan* i.e. bloody fool's ballet. So, initially the infantry battalions were raised

from the Hindustanis, Gurkhas and the Dogras. Till the end of the *Khalsa* Kingdom, these communities consitututed half of the westernized infantry of *Dal Khalsa*.[39] It is to be noted that the *Mamluk* military aristocracy oriented towards cavalry warfare obstructed the programme of several *Mamluk* Sultans to introduce firearms on a large scale.[40] Similarly, in Japan, the *Samurai* class which liked fighting from horseback with swords, bows and arrows prevented the rise of firearms equipped infantry on a large scale till the mid nineteenth century.[41]

Despite opposition from his *sirdars* in particular and the Sikh community in genral, Ranjit Singh was quite successful in westernizing part of his army. Ranjit used to spend three to four hours every day watching the parade and frequently rewarded selected soldiers for good performance.[42] The *Dal Khalsa*'s westernized infantry was dressed in red jackets, white trousers, black cross belts and pink silk *turbans*.[43] The westernized troops armed with muskets had French words of command.[44] A memorandum issued on 23 November 1833 from Amritsar provides a detalied account of a unit (*Akal* Regiment) which at that time was commanded by *Sirdar* Tej Singh. It possessed 383 pieces of guns. The total strength of the regiment was 811 men. As regards the officer corps. there were 10 commissioned officers, 8 Subedars, 29 Jemadars and 4 Nishanchis.[45] The *sirdars* were also indifferent towards guns. But, Ranjit emphasized on building up an artillery establishment.[46] The state set up *karkhanas* (workshops) under the direction of European officers for manufacturing military hardware. Saltpeter for manufacturing gunpowder was found in large quantities around Lahore.[47] Sulphur was found from the Salt Range which stretches from Jhelum to Indus.[48] Honigberger was appointed as the superintendent of a gunpowder factory.[49] Cannons and mortars were cast at the gun foundry of Suchetgarh.[50]

Horse artillery was introduced by Frederick the Great in 1759.[51] By December 1810, Ranjit Singh had started manufacturing guns pulled by horses.[52] At least some Sikhs acquired the technology of producing replicas of state of art hardware. In October 1831, at Roopur, Ranjit witnessed the sharpnell shells used by the EIC's tropps. By 1838, Lena Singh a mechanic was casting sharpnell shells for the *Dal Khalsa*.[53]

The *Dal Khalsa*'s westernized contingents seemed to have reached a high level of perfection. On 26 March 1837, Isabella Fane, daughter of the EIC's General Henry Fane noted in her journal : 'Shocking to relate, at daylight there was a military spectacle of our cavalry and artillery for Ranjeet, which I grieve to say I could not resist attending. They did their maneu-vers very well. After ours had finished. Ranjit's infantry and artillery went through, for the first time, some maneuvers which they had picked up from us since our residence at Lahore; and wonderfully well they said to have done them.'[54]

Ranjit Singh's military programme transformed the structure of the state. In 1808, Bhowani Das arrived from Peshawar and joined Ranjit's service. He established a finance office and a pay office for the troops. Das controlled the treasury which paid the westernized soliders regularly in cash. On 17 November 1833, an order issued from Amritsar states : 'A demand order for Rs 12.000 on Misr Rup Lal ..... has been received by Sirdar sahib (Tej Singh) for collection for the purpose of disbursing four months' salary, from Baisakh to Sawan 1890, to the artillery of General Sultan Mahmud Khan'.[55] A regulated scale of payment for the soldiers according to the lenght and nature of services was introduced.[56] The monthly pay of a sepoy came to about Rs 8 per month. He was given a red coat and arms but the had to feed himself. The Jemadars (equivalent to Lieutenants) were paid Rs 30 per month.[57] Each horseman's pay came to about Rs 24 month.[58] A *karigar* (workmen) manufactured leather pouches and belts at the cost of Rs 1 Anna 4 per piece. All the regiments bought these equipments in cash before the *Dussehra* festival. The mint at Amritsar manufactured Nanak Shahi rupees.[59] Banking facilities were available through the system of hundis.[60] The net result was monetization of Punjab's economy.

The Amritsar based banker named Ramanand supervised the revenue collection. The state held the nomopoly of salt and the salt mines at Pir Dadan Khan.[61] The shafts inside the salt mines were 20 yeards long. The largest mine employed about 100 miners. In 1848, the cost of salt at the bazaar of Pir Dadan Khan as Rs 1 per maund. Another source of revenue was the gold that was found in the sand of river Attock close to Mukhud. Custom duties levied on trade also brought money to the exchequer. Merchants from Kabul and Russian Tartary used to visit Punjab. They bought silk from Bukhara and conveyed it to the manufactures at

Multan and Amritsar.[62] Multan was famous for its silk and cotton garments, woolen carpets, shawls, glazed pottery and enameled silver goods.[63] Lahore was famous for the production of salt, arms (like matchlocks, swords, bows and arrows), cotton and silk clothes, mules and horses.[64] Roughly, Ranjit Singh's kingdom covered 8,000 square miles with 5 million inhabitants and the revenue varied between 2-3 million pounds annually.[65]

Lal Paltans and The Fiscal Military Structure of EIC

The red coated soldiers of EIC were known as *Lal Paltans*. The EIC built up a military-fiscal state in the subcontinent using the revenue extracted from agriculture plus trade and commerce. Use of indigenous raw materials aided firepower superiority of the EIC's troops. In 1819-20, sulphur was sent from England for the manufacture of gunpowder. However, on storage the material deteriorated. So, it was decided to use the local product. Sulphur was procured from the Indian *bazars*.[66] By 1822, Fort William amased a huge stock of sulphur and it supplied the demands of the other two presidencies.[67] In 1822, Sicca Rs. 23,010 Anna 12 Paise 7 were spent for repairing and expanding the buildings of the Gun Carriage Agency at Cossipore.[68] In the same year, land worth Sicca Rs 5289, Anna 12 and paise 10 around Ishapore Powder Works was bought for expanding the establishment.[69] An explosion of gunpowder on 5 January 1847 destroyed the Number 3 mill house of Ishapore. For reconstructing the mill house at Ishapore, the Company had to spend Rs 892, Anna 1 Paise 4.[70] Gradually the ordnance establishment expanded beyond Bengal and the EIC was willing to invest considerable sum for this project. In 1822, construction of sheds for ordnance bullocks was completed at Allahabad.[71] By 1830, the Gun Carriage Factory at Fatehgarh was producing carriages, limbers, swivel collar iron bars, swivel yokes for the bullocks as well as ammunition.[72] In April 1830, Sonaut Rs 58, Anna 9 and Paise 8.5 were spent for repairing the gun shed at Shahjahanpur.[73] In 1830 a new powder magazine was constructed at Dinapore at the cost of Rs. 4,000. The capacity of this new magazine was to hold 2,600 barrels of powder. And the Superintending Engineer of the Lower Province was ordered to repair the old magazine.[74] During the 1830s, each presidency had an establishment for making gunpowder. The factories making gunpowder generally pursued policies on the assumption of three years peace consumption.[75]

Some British military officers wanted to import latest military hardware from the West, while the poli-ticians wanted to pursue the programme of indigenous military industrialization. In 1822, 11,186 barrels of defective gunpowder was manufactured at Allahabad.[76] It provided grist to the mills of the lobby which wanted to import military hardware from Britain. But, the Court of Directors in a letter dated 30 September 1829 informed the Bengal Presidency : 'The cost of supplying all the stores from England is prohibitive. So, you must try to obtain as much as possible from the subcontinent. It would be cheaper. You should purchase and manufacture some goods in India.[77] Lord Bentinck, the Governor-General agreed with this proposal. However, the Court of Directors warned that there should be no compromise on quality. The Military Board was given the task of inspecting the hardware manufactured in India.[78] But, some officers demurred. Brigadier A. Macleod, Commandant of the Artillery on 6 July 1830 wrote to Bentinck : 'As regards the Court of Directors' letter, we must judge Indian manufacture with regards to quality and price, it might be a case of false economy. We demand special shells for the 9-pdr. field guns and Royal Pattern cavalry swords.[79] In 1830, some military officers claimed that the brass 24-pdr. howitzer and the 9-pdr. field pieces and their carriages manufactured in India were defective. While firing, due to recoil the gun carriage burst. However, the Governor-General replied that further tests are required before a decision could be taken. The Select Committee of Artillery Officers at Dum Dum was required to find out the requisite proportion of the metal used in the gun and the charge of powder used.[80] Captain G. Hutchinson, the Superintendent and Director of the Foundry at Fort William in a letter dated 3 July 1830 replied to the Secretary of the Military Board : 'I have the honour to inform you that the brass cylinders cast in the foundry agreeable to the Board's order of the 8th December last, and reported ready for delivery in my letter number 292 of the 26th February last, are still in the Foundry, they are quite perfect without a single flaw and are bored and finished according to the dimensions stated in Mr. Edwardes' letter to the Commissary General.'[81]

Despite obstruction, the ordinance establishment continued to expand. In the 1830s, Cossipore was mainly

producing gun carriages. Major L. Taylor the Garrison Engineer at Fort William in a letter dated 21 June 1830 informed Lieutenant-Colonel Rickett, Superintendent Engineer of the Lower Province :

'There is great difficulty in obtaining wood from the Agency Yard at Cossipore. Initially we procured some timber but after cutting up they proved to be unworkable for our purpose. It caused much additional expenses. There is the difficulty of procuring hackeries to carry such heave timber, several of them having broken down, the hackery men being unwilling to undertake the job. The Military Board should give permission to Captain Hutchinson to cut up the timbers and to supply me with wood in the half wrought state'.[82]

Rickett argued that timber must be cut at the Agency Yard at Cossipore.[83] On 6 July 1830, John Craigie, Secretary of the Military Board replied to Rickett : 'I am directed by the Military Board to acknowledge the receipt of your letter no. 535 dated the 28th ultimo, and to acquaint you in reply, that the Board deems it expedient to adhere to the arrangement at present in force which required Executive Officers at the Presidency to indent for the whole timber. The Board observes that if the Garrison Engineer will attend at the Cossipore Yard to ascertain that the timber selected for him are of good quality; the evils he complains of would not occur'.[84]

The British were ever conscious of maintaining firepower superiority over their indigenous opponents. So, the military officials took care to upgrade their artillery regularly and to store the latest pieces in the arsenals and magazines. In July 1830, the Military Board decided that 6-pdr. and 5.2-inch howitzers should be replaced by the 9-pdr. and 24-pdr. howitzers. And these new guns should be kept stored in the magazine at Katak. The magazines and arsenals at Mewar and Neemuch were ordered to maintain 12-pdr. brass guns.[85] Captain George Hutchinson was appointed Superintendent of the Fort William Foundry. He moved it to Cossipore about 8.6km north of Fort William. The Cossipore fundry opened in 1834 under Hutchinson produced 30pdr. guns which had a range of 1 km.[86] In 1840, Captain Archdale Wilson was put in charge of the foundry at Cossipore, and he supervised the casting of most of the guns.[87] From 1841, he started manufacturing bronze 4.5-inch mortars.[88] Cossipore also manufactured carriages for 32-pdr. and 24-pdr. guns, elevating screws for 24-pdr., 9 and 6-pdr. guns.[89]

The EIC took care to keep the arsenals and the magazines in good repair. In 1830, a *pucca* road was constructed inside the Dum Dum magazine for better drainage.[90] In 1841, an aqueduct was constructed within Fort William Arsenal at a cost of Rs 6,072 for continuous supply of water in order to extinguish any fire, if it breaks out. After six years, for repairing the reservoirs and aqueduct of Fort William Arsenal, Rs 449, Anna 2 Paise 6 was spent. The British took care to protect their arsenals and magazines. In 1847, Rs. 707 was spent for constructing a redoubt around the magazine at Ambala.[91] The arsenals and magazines stored balled cartridges, flints, lead, pistols and gun-powder.[92] They also maintained carts and bullocks for transportation of guns and ammunition to the field detachments both during war and peace.[93]

The land forces of the EIC comprised of regiments of the British Army, regiments raised by the Company in Britain plus the Sepoy Army. The latter comprised of Indian ranks and files but commanded by the white officers. During 1837, 14,780 men of the British Army were deployed in India.[94] From the 1790s, each regiment of the Sepoy Army recruited under the direction of the British regimental colonels. Between 1845-48, on an average an Indian infantry regiment had 1 British officer for 80 sepoys.[95] The British resorted to gradual westernization of the sepoys. Uniform was a technique for raising cohesion among the disciplined soldiers. In 1804, jackets and pantaloons were issued for the men. The discipline the troops, the Company separated its Indian military labourers from the indigenous society by housing the soldiers into lines. Initially the men were armed with flintlock muskets. In 1844, percussion firelocks were issued.[96] Unlike the *Khalsa* Kingdom, the British Empire had several institutions for imparting professional training to the commissioned officers. To give an example, Captain George Wingate after passing from Addisombe received his appointment on 12 June 1829. He joined as an engineer officer in the corps of sappers and miners at Bombay Presidency during May 1831. He commanded detached pioneer companies for making roads.[97] It is to be noted that sappers and miners under the engineer officers played a very important role in demolishing Sikh defensive field constructions during the First Anglo-Sikh War (1845-46).[98]

Combat Effectiveness of the Dal Khalsa and The Lal Paltans : A Comparative Study

Despite Ranjit Singh's strenuous attempts, the *Dal Khalsa* suffered from certain grievous tactical and organizational limitations. The *Khalsa* military establishment like the Maratha Confedercy failed to develop disciplined heavy cavalry. The Sikh horsemen opposed imposition of uniform and European discipline. The porponents of irregular (indisciplined forces under the semi-autonomous chiefs) cavalry argued that till 1822, Ranjit Singh's army was almost totally composed of such horsemen. And in that period, Ranjit gained most of his kingdom. This anti-European lobby questioned the utility of employing European officers and reorganization of the army equipment and its doctrine in accordance with the western norms. Since the horsemen i.e. the landed class, constituted the most powerful social group in the *Khalsa* Kingdom, Ranjit could not overcome them totally. The *Maharaja* was afraid that if he tried to run roughshod over the landowners and their retainers who constituted the irregular cavalry, then they might rebel.[99] Also Ranjit could not totally abolish the irregular *Akali* light cavalry because the Sikh community believed that the *Akalis* were semi-sacred people.[100] A European officer in the *Dal Khalsa* informed H.M.L. Lawrence that the cavalry was inferior and ill mounted. Against an European enemy, after the first discharge they would only be an incumbrance.[101] And due to the absence of adequate number of disciplined heavy cavalry capable of launching a co-ordinated charge against the enemy, the Sikhs would pay heavily in the battles against the EIC. The British heavy cavalry repeatedly drove away the light irregular cavalry of the Sikhs and turned the flanks of the Sikh westernized infantry.

The trasition to the system where each soldier was paid regularly in cash by the state was incomplete in the *Khalsa* Kingdom. While the Europeanized contingents of Ranjit Singh's army was paid in *naqdi* (cash), the troopers maintained by the *sirdars* were paid by assigning *them jagirsy*"[102]. Each colonel commanding artillery detachments was granted *a jagir* yielding an annual revenue of Rs 15,000.[103] Even under Ranjit Singh, the soldiers of the *Khalsa* were not paid regularly. Generally they were six months in arrears and received no pensions.[104] All these made the soldiers indisciplined and reduced their ardour for combat. Also Ranjit failed to construct a centralized polity that possessed a monopoly for raising armies equipped with high technology-weapons. The *sirdars* of the Bhangi family possessed large number of *jagirs*. And they had 10,000 troops under their own control.[105] Lord Auckland's sister Fanny Eden noted in 1838 that many Sikh irregular soldiers continuted to use matchlocks.[106]

On 29 June 1839, Ranjit Singh, the 'Lion of Punjab' died.[107] After his death, the *durbar* lost control over the army. Meehan Singh, the governor of Kashmir was killed by the rebellious troops.[108] Opposition against the European officer corps increased. Most of the Sikh *sirdars* were hostile towards the European officer corps because the latter were given higher wages than Indians of equivalent ranks. Even while Ranjit Singh was alive, a strong anti-European lobby operated in teh *durbar*. However, as long as Ranjit was alive, he was able to keep the anti-European faction under control. After the accession of Kharak Singh, the mutinous soldiers plundered the house of General Court. In 1841, Court had to flee for his life. Lieutenant-Colonel Ford was plundered and abused. An English officer named Lieutenant-Colonel Foulkes was put to death. Due to the vicious environment, Ventura and Avitabile decided to retire from Punjab. For this sort of affair, the European officers themselves were partly responsible. They participated in court factionalism. For instance, the French officers (the strongest lobby within the European officer corps) under the leadership of Ventura supported Sher Singh against Kharak Singh. To an extent, Ranjit also tried to construct a Sikh officer corps in charge of the westernized infantry. In the 1830s, several commanders of the Western style infantry units were Sikhs.[109] Since the *sirdars* lacked professional training like the European military officers, the former group lacked the moral authority and skill to lead the westernized contingents effectively during a fire fight.

Those European officers who remained in the *Dal Khalsa* lost all hold over the soldiers. The latter elected *panchas* or *panchayat* (body of five). It was a case of ancient village government being transferred to a state institution. Each company (i.e. 100 men) elected five members and those elected representatives from various companies elected five among them for each battalion (roughly consisting of 1,000 soldiers). And the *panchas* controlled the soldiery.[110] The origin of the *panchas* could be braced back to the defective pattern

of military recruitment that was followed under Ranjit Singh. The soldiers were not recruited individually but in batches from the same village and were frequently members of the same family or clan. The senior member of the family, or the tribal leader who brought the men into the army was granted the rank of officer instead of being promoted on merit. Under each such officer, 15-20 men of the same tribe from a particular locality served. These bands were known as *deras*. This system strenghened clanties within the regimental institution and weakened impersonal authority of the military bureaucracy over the soldiers. The *deradars* bargained for better terms and service conditions for the men under their control. And occasionally the *deracars* encouraged the men under them to rebel. So, the real leadership of the solciters remained with the *deradars* (who became leaders of the *panchas*) and a spirit of trade unionism pervaded the whole army.[111] In 1844, under the leader-ship of the *panchas*, the army forced the *durbar* to raise the pay of the private by half a rupee per month.[112]

When the First Anglo-Sikh War broke out in 1845, the EIC deployed 32,479 men and 68 guns.[113] This force named as the Army of the Sutlej possessed not echnological edge over the Sikhs as regards the weapon systems. The Sikh artillery enjoyed quantitative and qualitative superiority over the EIC's artillery. The Sikh 6-dpr. guns out-ranged the British 6-pdrs. The recoil on the carriages of the Sikh guns was less compared to the British guns on the carriages. In addition, the Sikh guns did not heat up as severely as the British enjoyed no technical advantages. The EIC's infantry and the Sikh westernized infantry were armed with Brown Bess whose effective range was 300 yards.[115]

On 18 December 1845, Lal Singh with 12,000 Sikhs (mostly cavalry) and 22 guns arrived at the village of Mudki.[116] Mudki was a chance encounter which started at about 4 in the afternoon.[117] Lal Singh just happened to stumble upon what he believed to be the advance guard of the EIC's troops. The Sikhs took up position amidst the jungle around the vicinity of Mudki. Thus concealing themselves, the Sikh marksmen aimed at the British officers. This tactic remained constant throught the campaign.[118] The British dragoons with their swords experienced considerable difficulty in penetrating the quilted and padded clothes of the Sikhs. The EIC's infantry deployed in line and advanced towards the Sikh position with support from cavalry and infantry. As the Sikh withdrew, dust and darkness prevented any pursuit by the EIC's troops.[119] But, the Sikhs had to leave behind 17 artillery pieces.[120] The EIC lost 215 killed and 657 wounded.[121] Mudki was a warming up battle for the main confrontation.

On 21 December 1845, the next confrontation occurred 10 miles from Mudki at Ferozeshah where the Sikhs constructed a fortified camp forming a sort of parallelogram. This camp about a mile in length and half in breadth was defended by 35,000 infantry and 25,000 cavalry supported by 100 artillery pieces. The Sikh strategy was to wear out the EIC's forces by encouraging the latter to attack the entrenched camp. Hugh Gough's (the commander of the EIC's force), plan was to soften up the Sikh defence with an artillery bombardment and then to storm the Sikh camp with a bayonet charge by the infantry. Major-General Harry Smith's 1st Division was attacked by 4 battalions of Avitabile's corps. However, due to the absence of European mercenary officers and lack of trust between the Sikh chiefs and the *deradars*, the attack was not pushed to its logical extreme. At Ferozeshah, the EIC lost 3,000 killed and wounded.[122] But, the EIC's victorious troops were able to capture about 70 Sikh guns.[123]

During the next battle at Aliwal fought on 28 January 1846, Harry Smith concentrated 10,000 men, 3,000 cavalry and 30 guns (22 of them were horse artillery guns). The Sikhs under Runjor Singh brought into action 18,000 men and 70 guns. The Sikh infantry occupied a curved line of shallow entrenchments, with artillery in front of them. Their right flank rested on the village of Bhundri and their left on the vilalge of Aliwal. Since Runjor Singh lacked adequate military skill, the position he selected was defective. The Sikh position was without a secure line of retreat because behind the Sikh line was the river Sutlej.[124] When defeated, many Sikh soldiers drowned while trying to cross the river. And Harry Smith's artillery had a field day. On 31 January 1846, one British officer wrote to his wife about the guns captured from the Sikhs after the Battle of Aliwal in the following words : '.... All the Guns taken, very excellent guns most of them heavy 6 pdr., some howitzers and large mortars.[125] Runjor Singh has a massive superiority in artillery. But, Smith's loss was only 200 men. Smith's opinion was that if Runjor had pressed his attack then the Company's *fauj* would have been in a difficult

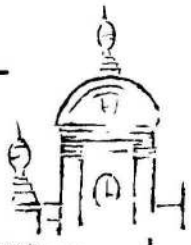

situation.[126] Besides Runjor's inadequate tactical skill, probably lack of co-ordination between the sikh *sirdars* and the *deradars* had its share for the not so good performance of the *Dal Khalsa* in this confrontation.

On 10 February 1846, at Sobraon 30,000 *Khalsa* troops with 70 cannon opposed the EIC's soldiers.[127] The Sikhs constructed the fortified camp in a semi-circular shape with a front of 3,500 yards under guidance of a mercenary Spanish engineer. The Sikh bateries within the camp were protected by flanks and fascines and the westernized infantry took position within the triple line of trenches covered by redoubts and epaulements.[128] Treachery was rampant within the Sikh high command. The *sirdars* were so eager to destroy the power of the disobedient army that on the eve of the encounter, Lal Singh through his agent Shams-un-din sent a report to Gough on the nature of Sikh entrenchment at Sobraon and deployment of the guns within it.[129] This information certainly aided EIC's victory. And the British engineers with the sappers and miners were able to blow up systematically the Sikh field obstruction inside their camp, which facilitated the advance of the EIC's infantry. Nevertheless, in this battle the butcher's bill for the EIC's *paltan* included 320 killed and 2,063 wounded.[130] The *durbar* surrendered after being defeated in the four successive battles — Mudki, Ferozeshah, Aliwal and Sobraon.

In 1846, the *Khalsa* army surrendered the artillery to the British and its size was reduced from 85,000 men to 20,000 infantry and 12,000 irregular cavalry.[131] The disbanded Sikh soldiers at Multan forced *Diwan* Mulraj to become their leader. They appealed to the *durbar* troops to join them in expelling the *ferangis*.[132] Gough possessed 12,000 infantry and 3,000 cavalry, plus 9 light and 2 heavy artillery batteries. Sher Singh commanded a force comprising roughly 25,000 men.[133] Gough had 60 guns against 62 artillery pieces of the Sikhs.[134] Sher Singh started provoking Gough and the latter rose to the bait. Major Mackeson, the agent of the Governor General requested Gough to wait for the arrival of the heavy guns. But, Gough told Mackeson : 'I am the commander-in-Chief of this army and I desire you to be silent'.[135] On the afternoon of 13 Janaury 1849, Gough's troops started advancing towards the village of Chillianwala which the Sikhs had heavily fortified. The Sikh guns opened fire when the EIC's soldiers were 1,500 yards away. For an hour, the Sikh artillery was able to hold the EIC's infantry formations at bay. Then their fire slackened and the EIC's troops were again able to advance.[136] However, the advance of the various briagdes of the EIC was incoherent. Each brigade lost sight of the other and the regiments within the brigades failed to coordinate their action. And the Sikhs attacked each of the regiments on their front, flank and rear simultaneously. Slowly but steadity, the EIC's infantry regiments advanced and spiked the Sikh guns.[137] But, it was a tough fight. The Sikhs retreated into the brushwood jungle and countinued to fight till the night.[138] About 5% of the EIC's force deployed for battle died. And the proportion of wounded amounted to 12% of the EIC's force engaged in battle.[139] On 20 January 1849, Lord Dalhousie in a private letter expressed his feelings about Chillianwala : 'The result is that we have only 12 guns captured and lost 3 of our own, and we have suffered a horrible carnage of 2,375 killed and wounded—about 650 killed .... We have gained a victory for we have routed the enemy, committed great slaughter on him .... and remained masters of the field; but I repeat, another such would ruin us'.[140]

On 16 January 1849, Chattar Singh, joined his son Sher Singh with 6,000 soldiers. The angry young Dalhousie repeatedly pressurized Gough to attack and destroy Sher Singh's army as quickly as possible. However, after the drubbing in the hands of Sikh artillery, Gough decided to wait for heavy artillery and reinforcements from Multan. Sher Singh was also becoming anxious of the fact that Gough would very soon receive reinforcement was on its way to meet Gough. Sher Singh decided to try his luck at Gujerat on the bank of Chenab. On 21 February, Gough about 20,000 soldiers in the field supported by 96 guns.[141] Superior artillery gave victory to the British and the *Khalsa* Kingdom passed into history.

The loss suffered by both the *Dal Khalsa* and the EIC during the two Sikh Wars were miniscule compared to the casualties incurred by the *Grande Armee*. On the EIC's side, the total of killed and wounded during the First Anglo-Sikh War was, 1,291 and 4,915 respectively.[142] In none of the battles, did the EIC suffer more than 3,100 casualties. The *Grande Armee* in one of the bloodiest battle fought by Napoleon i.e. Wagram in 1809 lost 30,000 men.[143] This was because after 1789, the *levy en masse* and mass industrialization which

increased the scope and intensity of warfare in Europe were yet to occur in the subcontinent. However, the two Anglo-Sikh Wars could be compared with other colonial campaigns fought by the EIC in the subcon-tinent. The Borkhs Kingdom that sprawled over the Himalayas was at war with the EIC between 1814-15. The EIC's battle casualties were 3,000 and another 2,000 were lost due to sickness and desertion.[144] The Third Anglo-Maratha War (1817-18) caused 3,260 casualty among the EIC's troops.[145] So, in terms of manpower, the Sikh Wars were more costly compared to the Anglo-Nepal War and the Third Anglo-Maratha War. The First Afghan War (1839-42) cost the EIC 15,000 casualties.[146] So, the Afgan adventure for the EIC was more tough compared to the two Anglo-Sikh Wars.

Conclusion

The most important channel for technology transfer to Punjab was the private European mercenaries. Both the EIC and the *Khalsa* Kingdom tried to construct a self-sufficient military-industrial base for equipping their firepower centric armies. And this in turn stimulated a sort of mini industrialization. Military modernisation forced the proto-feudal monarchical state in Punjab to initiate economic reforms and establish a centralized bureaucracy. Shared power and delegated sovereignty characterized the indigenous regimes. Maintenance of capital intensive armies proved to be a burden for the exchequer. And this in turn forced Ranjit Singh to 'modernizing', restructure the government and initiate new economic policies. The *Khalsa* Kingdom made sterling progress in reducing the technological edge enjoyed by the British. However, technology is not the sole driver of history. Organization factors also coalesce with military hardware. In the last resort, managerial failures coupled with political reasons proved to be the undoing of the *Khalsa* Kingdom. Even Ranjit Singh was forced to maintain large number of irregular cavalry under the big chieftains. And this prevented the emergence of a totally centralized government with a monopoly of military power.

After Ranjit Singh's death, the nature of Sikh warfare was transformed. Instead of conducting harassing warfare with light indisciplined cavalry, the *Dal Khalsa's* doctrine was to conduct set piece battles with infantry and field artillery. The *Khalsa* Kingdom had a chance to defeat the EIC during the First Anglo-Sikh. But, breakdown of civil-military relations between the *sirdars* and the *Dal Khalsa* reduced the combat effectiveness of the latter. The situation was further aggravated by the outflow of European mercenaries. The Sikh *sirdars* were not professional military officers and the *Dal Khalsa* lacked a cadre of non-commissioned officers for leading small units of troops (i.e. platoons and sections) in the battlefield. As a result, the *Dal Khalsa* during all the battles was forced to occupy a static position supported by artillery. Even when the Sikh artillery was able to stop the advance of the *lal paltans* temporarily, the *Dal Khalsa* lacked officers of requisite caliber to launch a coordinated infantry-cavalry counter-attack. In the end, the EIC's tactic of battering the static Sikh camps with heavy artillery and then launching infantry bayonet charges supported by mobile field artillery overcame the Sikhs. The victory of the EIC during the Second Sikh War was a foregone conclusion. Most of the westernized infantry and ordinance establishment of the *Khalsa* Kingdom was destroyed after the First Sikh War. During the Second Sikh War, irregular Sikh cavalry had no chance against the artillery-disciplined infantry combination of the EIC.

Thousand years of thoughts on food - in Bengali poetry

TRANSLATOR : **ABHIJIT DATTA**

1. The chant of the husking pedal / Anonymous :—

The husking pedal is falling, the cow is breeding, the oven is burning; with the sun-baked paddy and the black baby -life may continue with my husband alive.

2. Flood :1366 / Dinesh Das :—

Vast expanse of water is extending through the horizon here and there/ the villages float like corpses: a drowning Peepul like a huge vulture shifts on the corpse: devouring the son of the soil the infertile river is hiding somewhere under the water.

The relief boats creep in like a faint hope, to feed the corpses with last morsel of gram flour and molasses: a few emerge with hot political packets to throw perched rice: sometimes the polished urban peoples also come to rock on the face of the eager water throwing small baits of pity, in between.

The floating corpses rot in autumn sunlight, still the river conspires down under the water in ruthless pleasure. The muddy soil spreads sad smell like salty tear. The paddy trees mourn in blowing wind - the dead paddy weeps.

3. The food-god / Birendra Chattopadhyay :—

Food is the sentence, food is the life, food is the conscience itself; food is the sound, food is the hymn, food is the worship itself.

Food is the thought, food is the song, food is the poetry itself, food is the fire, air, water, star and sun.

Food is the light, food is the glow, the essence of all the religions food is the beginning, food is the end, food is the chest-note itself; he who poisons that food or snatches it away destroy, destroy, destroy him.

4. The chant / Samar Sen :—

The primitive god dresses like man and lady alone he is the saviour of the money-lender and the peasant. every one. Black like Krishna, in the sky a huge cloud slopes its' dark-coloured image is the peasant's hope the money-lender says bravo watching the crop. The horn of the cloud is heard from the sky In every house it seems the song of god's amorous ply. All the snakes are sitting for a chance to kill, death is written in the fate of the frogs, as night fills. The money-lender sings. paddy is ready made gods meditate in the dark abode of the dead. Unable this minstrel talking about go God's praise is heard in the merchant's abode.

5. The food-suppler/Mangalacharan Chattopadhyay :—

Searching for the peasants with a foaming mouth I've hit my head on wall or enticed away for the dream autumn crop in utopian village: regaining my senses I see the food-craving palms extended in the footpath torn from the villages and missing from the townships the sons of the whirlwind - my food-suppler.

6. Synonym / Sunil Gangopadhyay :—

The school is closed now, the boy goes to the border to buy rice the rice market is full of teasing pleasure, too many hands playing in rice the eyes are also inhaling, full of stones and worms, still fragrant: the timid hands of the boy open the bag, looks at the scales - the world watches eagerly the sight of excellent learning of the boy paying a quarter to the police they teach, drumsticks are spread over the top returns through the country path. Good boy you are, do not eat that rice, sell it, at eight annahs of profit per kilo. that's good, listen, rice is a word, but if you pick it up in hands unless you know its worth the learning remains incomplete. It is not the word, the meaning is the charm of learning. The school is closed now, though excellent learning of the boy extends slowly.

মানুষের ভাষায় না-মানুষেরা

ডঃ দিলীপ নাহা
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

(১)

মূল বিষয়ে প্রবেশের আগে কয়েকটি বাংলা বাগ্‌ধারার নমুনা দেখে নিই।

টাকাটা আমার হাত থেকে **ছোঁ মেবে** নিয়ে গেলে? প্রয়োজনে **ফোঁশ করবে**, কিন্তু **ছোবল মারবে** না। শত্রুকে **ফণা তুলতে** দিও না। যা বলবে স্পষ্ট করে বলবে, শুধু **মিউ মিউ করলে** চলবে? আমি ওকে **লেজে খেলাচ্ছি**। তুমি **লেজ গুটিয়ে পালালে** কেন? কথায় কথায় **হুল ফুটিওনা**। বাচ্চারা **কিচির মিচির করছে** কেন? পেছনে **ঘেউ ঘেউ** করো না। ওর ভাগে **থাবা বসিও** না।

ক্রিয়াপদ-নির্ভর এই বাগধারাগুলির দিকে তাকালে একটি বিশেষত্ব সহজেই নজরে আসবে যা থেকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের স্বরূপ স্পষ্ট হবে। ওপরের প্রতিটি ক্রিয়াপদে ও বাগ্‌ধারায় রয়েছে কোন-না-কোন পশুপাখির অদৃশ্য উপস্থিতি। অদৃশ্য হয়েও ভীষণভাবে দৃশ্যময় এরা। **'ছোঁ মারা'** বললেই চিল বা বাজপাখির ছবিটি সামনে দেখতে পাই। অথচ বাক্যে কোথাও চিল বা বাজের উল্লেখ নেই। **'মিউ মিউ করা'** বললে বেড়ালের আচরণ মনে পড়ে। **'ঘেউ ঘেউ করা'** বললে বুঝতে পারি মনশ্চক্ষে সারমেয় হাজির। চিত্রময় ও সালংকারা এই বাগ্‌ধারাগুলিতে মানুষের সাদৃশ্য রচনার অপার কুশলতা ধরা পড়েছে। লক্ষণীয়, সদৃশ বা সমানধর্মা বিষয়কে নির্বাচন করা হয়েছে পশুপাখির জগৎ থেকে। মানুষের আচরণের বর্ণনায় পশুপাখির সুনির্দিষ্ট আচরণ আরোপিত বলেই ক্রিয়াপদ-বাগ্‌ধারা-গুলির অর্থসৌন্দর্য এত বেশি। অতিরিক্ত সাদৃশ্য তথা অতিশয়োক্তির প্রভাবে উপমান উপমেয়কে প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রাস করে ফেলেছে। তাই পশুপাখিদের দেখতে পাইনা, কিন্তু তাদেরকে 'স্বভাবে যায় চেনা'।

মানুষের ভাষার অস্তিত্বের গভীরে না-মানুষেরা হাজার হাজার বছর ধরে বিরাজ করছে। হাজারো উপাদানে ভাষাকে প্রতিনিয়ত উর্বর করছে।

সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক প্রাণিজগতের অচ্ছেদ্য আত্মীয়তার বন্ধন। লক্ষ বছর ধরে অস্তিত্বের লড়াই ও জীবিকার সংগ্রাম নিশ্চয় ছিল, তবু বিশ্বচরাচরের বিশাল-ব্যাপ্ত জীবজগতের সংখ্যাতীত সদস্যের সঙ্গে মানুষের শুধুই শত্রু বা খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক ছিল না। বলা যায় বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে পশুপাখি জীবজন্তুর জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার উপায় ছিল না মানুষের। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—সমগ্র বসুধাকে কুটুম্ব করে তোলার দার্শনিক প্রত্যয়ে ও মানবিক তাগিদে মানুষ পশু-পাখিকে আত্মীয় পরিজনে পরিণত করেছে। উদ্ভিদ বা প্রাণী কেউ পর নয়। ব্রহ্ম থেকে কীট পরমাণু—সবকিছুর মধ্যে কবি-ঋষি-দার্শনিকরা নিজেকেই প্রত্যক্ষ করেন যে! তাই মানুষের সমগ্র জীবনচর্যায়, ধর্মীয় বিশ্বাস-সংস্কার-কৃত্যে, দেবদেবীর রূপ কল্পনায় বা প্রতীক উপাসনায় আদিমকাল থেকেই জীবজন্তু পশুপাখির বিপুল সমাবেশ। শুধু ধর্মাচরণ নয়, বিশেষভাবে লক্ষণীয় প্রাচীনকাল থেকে সব দেশের শিল্পে সাহিত্যে জীবজন্তুর সগৌরব উপস্থিতি। এই প্রাণিকুল কত ভাবেই না উজ্জীবিত করেছে মানুষের সৃজনী কল্পনাকে! দেশবিদেশের প্রাচীন লোককথা পুরাণকাহিনি মহাকাব্য নাটক হিতোপদেশের গল্পে পশুপাখি জীবজন্তুরা দেখা দিয়েছে অপরিহার্য চরিত্ররূপে। একালের সাহিত্যেও প্রচুর সংখ্যায় মনুষ্যেতর প্রাণীদের ভীড়। এই না-মানুষেরা না থাকলে ভয় ভক্তি স্নেহ প্রীতি দিয়ে গড়া মানুষের আশ্চর্য জগৎটি পুষ্টি ও পূর্ণতা পেত না।

আমরা কি ভুলে যেতে পারি, আদিকবির প্রথম অশ্রুপাত এক ক্রৌঞ্চমিথুনের জন্য? শরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চের শোকগাথার পথ ধরে কবি সীতার করুণ জীবনালেক্ষ্য প্রকাশে ব্রতী! এমন প্রতীকী মুখবন্ধ রচনা কবিগুরু বাল্মীকির পক্ষেই সম্ভব। আমরা আরো লক্ষ করি, হিন্দুদের দশ অবতারের প্রথম সাড়ে তিনজন মনুষ্যেতর প্রাণী। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ — এই তিন। আর নৃসিংহে আধখানা। ক্রমবিবর্তনবাদীরা এখানে ভাবনার খোরাক পেতে যেতে পারেন অবশ্যই।

ধর্মীয় বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথে না গিয়েও আমরা এটুকু নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারি, মানুষের জীবনের চিন্তায় সৃষ্টিতে তথা অস্তিত্বের কত গভীরে প্রতিবেশী জীবজন্তু প্রাণিকুলের উপস্থিতি। আমরা বিস্মিত হই, মানুষের ভাষা ও বাগ্‌ব্যবহারে প্রাণিকুলের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা ভেবেও। প্রচলিত বিশ্বাস এই, মানুষের উচ্চারিত ধ্বনি ও সুরসমষ্টি এসেছে বিভিন্ন পশুপাখির কাছ থেকে। তা নিশ্চয়ই গবেষণার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু প্রাণিজগৎ নানা ভাষার শব্দভাণ্ডারের উপাদান বৃদ্ধি করে মানুষের ভাবপ্রকাশের শক্তি, বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই, এ নিয়ে নতুন করে গবেষণার প্রয়োজন নেই। সব দেশের সব ভাষায় এর সাক্ষ্য প্রমাণ যথেষ্ট পরিমাণে মজুত। আমরা এ বার সংক্ষেপে আলোচনা করবো — বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে, আলংকারিক উপাদান রচনায় ও প্রবাদ-প্রবচন সৃষ্টিতে পশুপাখির 'অবদান'।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, তুলনা ও সাদৃশ্য-কল্পনার মধ্য দিয়ে অলংকার রচনায় মানুষের এক সহজাত প্রবণতা ও শক্তি প্রকাশ পায়। বর্ণনীয় বিষয়কে সাদামাটা নিরলংকার ভাবে প্রকাশ করতে কেউ চান না — না কবি, না সাধারণ মানুষ। 'ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতা মুখম্।' বনিতামুখ যতি সুন্দর হোক, ভূষণহীন হলে

তাকে মানায় না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, দৈনন্দিন বাগব্যবহারের ক্ষেত্রে একথা সমান সত্য। অতএব চাই অলংকার। চাই নিত্যনতুন চিত্ত-চমৎকারী উপমান-বস্তু, নইলে ভাষার সৌন্দর্য ও শক্তি প্রকাশ পায় না। এই আলংকারিক কর্মে আমাদের ভাষা আকণ্ঠ ঋণে আবদ্ধ প্রাণিজগতের কাছে। পশুপাখিরা শতসহস্র আলংকারিক উপাদান সরবরাহ করে চলেছে আমাদের ভাষায়। সেই সঙ্গে আশ্চর্যভাবে ঘিরে রেখেছে আমাদের প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারার সুবিস্তৃত সংসারকে। অসংখ্য সংস্কৃত-বাংলা শব্দে প্রাণীরা এমনভাবে আত্মগোপন করে আছে যে শব্দের ব্যুৎপত্তি জানা না থাকলে এদের অস্তিত্ব উপলব্ধি কঠিন হয়।

(২)

সমাজে কত ধরনের মানুষের দেখা মেলে প্রতিনিয়ত। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে, চেহারায়, স্বভাবে কর্মে মানুষে মানুষে কতোই না প্রভেদ ও বৈচিত্র্য! এই বৈচিত্র্য ও বিশেষত্বকে চিহ্নিত করতে আমরা হাত বাড়াই জীবজগতে। সাদৃশ্যের টানে সহজেই এখানে পেয়ে যাই উপমার পর উপমা। চেয়ে দেখি মানুষের সমাজে কেউ **বাঘ**, কেউ **সিংহ**, কেউ **গণ্ডার**, কেউ **গাধা**, কেউ **বলদ, পাঁঠা, বাঁদর বা শাখামৃগ**। স্বভাবে কেউ **গভীর জলের মাছ**, কেউ **পাঁকাল মাছ, ভিজে বেড়াল, বিড়াল তপস্বী বা বক্ ধার্মিক। টিকটিকি, কালসাপ ও বাস্তুঘুঘুর** অভাব নেই আমাদের চারপাশে। গোপন খবর ফাঁস হলে বা বড়ক্ষতির মুখে পড়লে তা হাড়ে হাড়ে মালুম হয়। শারীরিক বৈশিষ্ট্যে অনেক মানুষ **হাতি, জলহস্তী, জাম্বুবান, গিরগিটি, শকুন, দাঁড়কাক** বা **কাঠঠোকরা**। অর্থাৎ এককথায় জীবজন্তু খুঁজতে আর বনেজঙ্গলে বা চিড়িয়াখানায় যাবার দরকার নেই। সাদৃশ্যের গভীর প্রভাবে, অলঙ্কার রচনার টানে মানুষের ভাষার জগতে না-মানুষেরা অতিশয় প্রত্যক্ষভাবে রয়েছেন — তা সে শিষ্ট সাহিত্যের ভাষা হোক বা দৈনন্দিন জীবনের বাগ্‌ব্যবহার হোক। শতসহস্র উপমা রূপক প্রবচন বাগ্‌ধারায় সামিল হয়ে এই জীবকুল বাংলা ভাষার প্রকাশক্ষমতা তথা প্রসাধনসৌন্দর্যকে নিঃসংশয়ে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকেই অলংকার শাস্ত্রে পশুপাখিদের অবাধ অধিকার। রূপ ও সৌন্দর্যের বর্ণনায় — তা সে পুরুষ অথবা নারী যেই হোক — পশুপাখিদের ছাড়া সব অচল। মনুষ্যেতর প্রাণিকুল ছাড়া সংস্কৃত ও বাংলা শব্দভান্ডার ও অলঙ্কারশাস্ত্র কী পরিমানে নিঃস্ব হয়ে পড়ত, তা ভাবলে ভয় হয়। আমরা দেখতে পেতাম না **মরালগমনা গজগামিনী মৃগনয়নী ভ্রমরকুন্তলা পিককণ্ঠী** ললনাদের, পেতাম না **সিংহগ্রীব বীরকেশরী গরুড়নাসা বৃষস্কন্ধ পুরুষপুঙ্গবদের**, দেখতে পেতাম না **গোধূলির আলো** বা **কাকজ্যোৎস্না** বা **গোষ্পদ-বারি**, মানুষের মধ্য থেকে হারিয়ে যেত **ব্যাঘ্রবিক্রম, সিংহাবলোকন, শশব্যস্ততা, শ্যানদৃষ্টি, গড্ডলিক প্রবাহ** এবং আরো কত কি! এই প্রাণিজগৎ না থাকলে আরও গুরুতর সমস্যা হত শত্রুকে গালগাল দেবার বেলায়। **পশু, জন্তু, জানোয়ার, পশ্বাধম, ছুঁচো, খচ্চর, তিলে খচ্চর, কুকুর** ইত্যাকার আর্য ও অনার্য শব্দরাজি হাতের কাছে না পেলে বাগ্‌যুদ্ধে মানুষের সমস্যা হতোই। দুষ্টু ছেলেদের অবশ্য আর **বাঁদর** বা **হনুমান** হতে হতো না।

সাদৃশ্য রচনার ক্ষেত্রে মানুষের কল্পনাশক্তি কীভাবে অসাধ্যসাধন করে তা রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ' প্রবন্ধে সমীরের মুখ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। সুন্দরী রমণীর গমনকে গজের সঙ্গে তুলনা করার মধ্যে নিশ্চয় দুঃসাহস রয়েছে। সমীরের ব্যাখ্যা — "আমাদের প্রাচীন কাব্যে প্রশংসাচ্ছলে গজেন্দ্রগমনের সহিত সুন্দরীর মন্দগতির তুলনা হইয়া থাকে। এ তুলনাটি অন্যদেশীয় সাহিত্যে নিশ্চয়ই হাস্যকর বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত তুলনা আমাদের দেশে উদ্ভূত এবং সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইল কেন? তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের লোকেরা দ্রব্য হইতে তাহার গুণটা অনায়াসে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে পারে। ইচ্ছামত হাতি হইতে হাতির সমস্তটাই লোপ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র তাহার মন্দ গমনটুকু বাহির করিতে পারে, এইজন্য ষোড়শী সুন্দরীর প্রতি যখন গজেন্দ্রগমন আরোপ করে তখন সেই বৃহদাকার জন্তুটাকে একেবারেই দেখিতে পায় না।" সমীরের কথার উত্তরে ব্যোম ভারতবর্ষীয় মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করে বলেন — "আসল কথাটা এই, আমরা অন্তর্জগৎবিহারী। বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট প্রবল নহে।" ক্ষিতির বক্তব্যও তাৎপর্যপূর্ণ—"কাব্যে কেন, জ্ঞানরাজ্যেও আমরা বহির্জগৎকে খাতিরমাত্র করিনা। একটা সহজ উদাহরণ মনে পড়িতেছে। আমাদের সাত সুর ভিন্ন ভিন্ন পশুপক্ষীর কণ্ঠস্বর হইতে প্রাপ্ত, ভারতবর্ষীয় সংগীতশাস্ত্রে এই প্রবাদ বহুকাল চলিয়া আসিতেছে — এ পর্যন্ত আমাদের ওস্তাদদের মনে এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহমাত্র উদয় হয় নাই, অথচ বহির্জগৎ হইতে প্রতিদিনই তাহার প্রতিবাদ আমাদের কানে আসিতেছে। স্বরমালার প্রথম সুরটা যে গাধার সুর হইতে চুরি এরূপ পরামাশ্চর্য কল্পনা কেমন করিয়া যে কোনো সুরজ্ঞ ব্যক্তির মনে উদয় হইল তাহা আমাদের পক্ষে স্থির করা দুরূহ।" কেন, কী যাদুমন্ত্রে এত স্বচ্ছন্দ আত্মীয়তায় পশুপাখির বিরাট সংসারে মানুষ বিচরণ করতে পারে এবং প্রয়োজন মত উপমার সারসৌন্দর্য আহরণ করতে পারে এই প্রবন্ধে তার ইঙ্গিত আছে।

(৩)

কথায় বলে গোধন তুল্য ধন নেই। অলংকার রচনায় ও প্রবচনে বোধ হয় গরুর অবদান সবেচেয়ে বেশি। এই নিরীহ গোবেচারা প্রাণীটি প্রচুর সংখ্যায় আলংকারিক উপাদান সরবরাহ করেছে বাংলা ভাষায়। নামে 'গবেষক' হলেও একালের গবেষকরা মোটেই আর **গো এষণা** বা **গরু খোঁজার** কাজ করেন না। যা করেন তা হল 'কোন বিষয়ের তত্ত্ব অনুসন্ধান'। সমাজ পরিবর্তনের পথে **গবেষণা** শব্দটির অর্থ এ যুগে নতুন উৎকর্ষ বা গৌরব লাভ করেছে। অবশ্য কাউকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেলে আমরা বলি — তোমাকে

গরু খোঁজা খুঁজেছি, পাইনি। দেবীর আসনে বসিয়ে এই গৃহপালিত **কৃষ্ণের জীবটির** প্রতি যতই শ্রদ্ধা দেখাই না কেন বাংলা প্রবচনের গরু আসলে অনেকটা নির্বোধ সরলতার প্রতীক। কেউ বুদ্ধিবিবেচনায় খাটো হলে আমরা বলি **আস্ত গরু!** বা **বলদ**। আমাদের চারপাশে **গোবরগণেশ**-এর অভাব নেই। **গল্পের গরুকে আমরা গাছে চড়াতে** ভালোই বাসি। রামপ্রসাদ **কলুর চোখ ঢাকা বলদের** কথা বলেছেন, সংসারী মানুষেরা সবাই কম বেশি তাই। কলুর বলদের মত সবাই খেটে মরছি। সংসারের **জোয়াল** আমাদের কাঁধে। অনেকে আবার **চিনির বলদ**। কাঁধে চিনির বস্তা, চিনির স্বাদ নেবার ক্ষমতা নেই। **বামুনের গরু** হলে তো রক্ষা নেই। খোরাকি কম, পরিশ্রম বেশি। সমস্যার চাপে অনেকের **লেজে-গোবরে** অবস্থা। মূর্খব্যক্তির লাগসই উপমা — **গোমুক্‌খু**। চেহারায় গুণ্ডা গুণ্ডা ভাব থাকলে **ষন্ডাগোছের ছেলে**। অনুরূপ অর্থে অন্য একটি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়। তা হল **ষণ্ডামার্কা**। মূল শব্দটির সঙ্গে কিন্তু ষন্ড বা ষাঁড়ের কোন যোগ নেই। প্রহ্লাদের দুই শিক্ষক 'ষন্ড ও অমর্ক' থেকে 'ষন্ডামর্ক'। তা থেকে লোকনিরুক্তির প্রভাবে বিকৃত হয়ে 'ষন্ডামার্কা'র জন্ম। বেকার নিষ্কর্মা ছেলে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার উপমা **ধর্ম্মের ষাঁড়** বা **গোকুলের ষাঁড়**। কেউ বিকট স্বরে চেঁচালে বলি — **ষাঁড়ের মত চেঁচাও** কেন? অনেক বয়স্ক লোক **শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে** মেশে। উপমালোভী আলঙ্কারিকেরা এত সহজে গরুকে ছেড়ে দেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র **বৃষজাতীয় রাজনীতির** কথা বলেছেন তাঁর কমলাকান্তের দপ্তরে। ভালো নাটকের আখ্যান কেমন হবে? এক আশ্চর্য উপমা নাট্য-শাস্ত্রাকার দিয়েছেন — **গোপুচ্ছাগ্রবিন্যস্ত**। অর্থাৎ নাট্যকাহিনি গরুর পুচ্ছাগ্রের মতো বিন্যস্ত হবে। শাঁসালো লোক পেলে আমরা বলি **দুধেল গাই**। চওড়া কাঁধের সুগঠিত শরীরকে বলি **বৃষস্কন্ধ**। অপরিচ্ছন্ন গৃহের উপমা — **গোয়াল ঘর**। নোংরা স্থান বোঝাতে উপমা দিই — **গোভাগাড়**। ক্ষুদ্রত্ব বা স্বল্পতা বোঝাতে **গোষ্পদের** জুড়ি নেই। এ যেন **সমুদ্রের পাশে গোষ্পদ**। ক্ষুদ্রবুদ্ধি সাধারণ মানুষের দলকে **গরুর পাল** বলতে আমাদের দ্বিধা হয় না। শিক্ষিকা যদি বলেন আমার **বাছুরগুলিকে** সামলাতে পারছি না। তবে বুঝতে হবে এখানে বাছুর মানে শিশু ছাত্রছাত্রীরা। উপমেয়ের উল্লেখ নেই, তাই এখানে অতিশয়োক্তি অলংকার। বোকাদের **মাথায় গোবর পোরা** থাকে। সবাই মানি **দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো**। অনেক ভালো মাঝে একটু ত্রুটি থাকলে বলি — **এক কলসী দুধে এক ফোঁটা চোনা**। অলস মানুষের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা বোঝাতে বলি — **কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ** বা **ভিন্ন পাঠ**। একটা প্রবাদ শোনা যায় — **হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না**। এর অর্থ নিয়ে গোল বাধতে পারে। মূলে প্রবাদটি ছিল **হিসেবের গরু বাঘে খায় না**। অর্থাৎ, গোচরণ থেকে হিসেব ঠিক রেখে গরু গোয়ালে ফেরৎ আনতে হবে; হিসেবী মানুষের ক্ষতির আশঙ্কা কম। খেলায় আমরা **গো-হারান** হারব।

আমাদের শব্দভান্ডারে গো-জাত শব্দের সংখ্যা অনেক। দুয়েকটি নমুনা — **গোমুখ, গবাক্ষ, গোষ্ঠী, গোক্ষুর, গোখরো, গোগ্রাস, গোসাপ, গোবেচারা** ইত্যাদি।

গো-জাতির কাছ থেকে বহু ক্রিয়াপদ নির্ভর বাগ্‌ধারা বাংলায় এসেছে। যেমন— **গুঁতনো, গুঁতোগুঁতি** করা, **শিং উঁচিয়ে** আসা, **জাবর কাটা, জোয়াল টানা, লাঙল ঠেলা** ইত্যাদি।

কুকুর বাংলা প্রবচনে ভালোই জায়গা পেয়েছে। তোষা-মোদকারীকে গালাগাল দিতে মনিবের **পা-চাটা কুকুরকে** স্মরণ করি। কাউকে উচিত শিক্ষা দিতে **যেমন কুকুর তেমন মুগুরের** ব্যবস্থা রাখি। কুকুরের লেজকেও আমরা নিত্য স্মরণ করি। ভীতু মানুষ **লেজ গুটিয়ে পালায়**। ভীতুকে গালাগাল দেয়া হয় **নেড়ি কুত্তা** বলে। মানুষের স্বভাব অপরিবর্তনীয়—এই সাধারণ সংবাদটি অসাধারণ হয়ে ওঠে যখন বলি — **কুকুরের লেজ কখনোই সোজা হয় না**। 'কাউকে অন্যায় প্রশ্রয় দিতে নেই' বোঝাতে বলি— **কুকুরকে বেশি নাই দিতে নেই, মাথায় ওঠে**।

প্রবচনের জগতে **মার্জার বাহিনীও** পিছিয়ে নেই। বুদ্ধিমানেরা **বিয়ের রাতেই বেড়াল কাটে**। আমাদের মধ্যে **ভিজে বেড়াল** বা **বিড়ালতপস্বী** অনেক আছে, এদের চট করে চেনা যায় না। কিন্তু **শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখে চেনা** যায়। স্বার্থপর মানুষ থেকে সাবধান হতে হয়। এরা **কালো বেড়াল**। আসল কাজের সময় কাউকে পাওয়া যায় না — **ম্যাও ধরবে কে?**

সিংহ শ্রেষ্ঠত্বের মডেল। একালে মানুষের মধ্যে যথার্থ **পুরুষসিংহ** ক'জন আছেন? নেতাজীর **সিংহগর্জনে** বৃটিশেরা কেঁপেছিল। **সিংহবিক্রম, সিংহভাগ, সিংহাবলোকন** ইত্যাদি সিংহের দান।

বাঘের অবদান আরো বেশি। মাঘের শীত **বাঘের গায়ে** লাগে। **বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা** — ভুক্তভোগী মাত্রই তা জানে। সমাজে অনেক **বাঘা-বাঘা** মানুষ আছেন, এদের দাপটে **বাঘে-গরুতে** এক ঘাটে জল খায়। টাকা থাকলে **বাঘের দুধও** মেলে। বিপদে **বাঘেও ঘাস খায়**। অনেক সময় **বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা**। কারো চেহারা হয় **কেঁদো বাঘের** মত। স্বভাবে কেউ **তুলসী বনের বাঘ**।

হাতি ঘোড়া নিজগুণে বাংলা প্রবচনে ভালোই জায়গা করে নিয়েছে। **হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল?** বাজার থেকে কী এমন **হাতি ঘোড়া** এনেছ? **গাধা পিটিয়ে ঘোড়া** হয় না। ব্যস্ত মানুষ যেন সর্বদা **ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে আসে**। এই **হস্তীমূর্খকে** কে বোঝায়? অফিসযাত্রীরা **ঘোড়দোড়** করে অফিস যায়। যন্ত্রটি কত **অশ্বশক্তির** জানিনা। **সাদা হাতি পোষা কম** কথা নয়। কাজের মেয়েটির **হাতির খোরাক** জোগানো মুশকিল। সংসারে **ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে** গেলে সমস্যা বাড়ে। **মরাহাতির লাখ টাকা দাম** — অবস্থা পড়ে গেলেও বড়লোকেরা তা জানেন।

কারোর জ্বর বাড়ছে কমছে, অতএব তা **ভালুকের জ্বর**। যার গায়ে **গন্ডারের চামড়া** তার বোধোদয় হওয়া কঠিন। সবদিক নজর

রেখে চলতে হয় — **একচোখা হরিণ** হলে বিপদ আসতে পারে।

সাপের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ইতিহাস সাহিত্যে কাব্যে গল্পকাহিনিতে ধর্মীয় সাধনে ও বিশ্বাসে সবচেয়ে বেশি গভীর ও জটিল। বাংলা শব্দভান্ডারে প্রবাদে প্রবচনে মা মনসার বাহনেরা শতসহস্ররূপে ছড়িয়ে আছে। সাবধানে পথ চলতে হবে বিশেষত **সর্পিল** পথে। সাবধানী মানুষ এমন ভাবে কার্যোদ্ধার করেন যাতে **সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না**। অনেক **সাপের পাঁচ পা** দেখে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। এদেরকে খোঁচাতে নেই। কথায় বলে, জেনেশুনে কে আর **সাপের গর্তে পা** দেয়? **সাপের লেজে পা** পড়লে রক্ষা নেই। অনেকের মধ্যে **অহি-নকুল** সম্পর্ক থাকে। কে কাকে **ছোবল মারবে** বলা কঠিন। অনেকের কথার **সাপ-ব্যাঙ** আমরা বুঝি না। নিরুপায় মানুষের **সাপের ব্যাঙ ধরা অবস্থা** বা **সাপের ছুঁচো-গেলা অবস্থা** হতে পারে। মানুষের মাঝে **কালো কেউটের বাচ্চা** থাকতে পারে — যারা সত্যিকার তেজীয়ান। ঘরের শত্রু সর্বনাশ করতে পারে — তাই **দুধ দিয়ে কালসাপ পুষতে নেই**।

সরস্বতীর বাহনটি অনেক প্রবচন রচনা করেছে। **'হংসৈর্যথা ক্ষীরম্ ইব অম্বু মধ্যাৎ'** — হংস যেমন জল থেকে ক্ষীর আহরণ করে তেমনি ভাবে ভাল-মন্দের মিশণ থেকে ভালোটিকে নিতে হবে — শাস্ত্রের উপদেশ। বেমানানি উপস্থিতি বোঝাতে বলি **হংসমধ্যে বক যথা**। অতিরিক্ত ভোজনের গ্রামীন উপমা — **হাঁসের খাওয়া**।

জলচর প্রাণীদের অবদান কোন অংশেই কম নয়। **মাচের তেলে মাছ ভাজতে** মানুষের জুড়ি নেই। কষ্টসহিষ্ণু মানুষের প্রাণ **কই মাছের প্রাণ**। নিরীহ সাধারণ মানুষ **পুঁটি মাছের প্রাণ** নিয়ে বাঁচে। অনেকের মধ্যে **পুঁটি মাছের ফরফরানি** থাকে খুব। চতুর ব্যক্তির উপমা **ঘরিয়াল বা ঘোরেল, গভীর জলের মাছ**। চাঁদের কাছে মনসা **চ্যাঙমুড়ি কানী**। দোষের মধ্যে মনসার মাথা চ্যাঙ মাছের মতো বড়। পুলিশের জালে কখনো **রুই কাতলারা** ধরা পড়ে না। প্রতিপত্তিবান মানুষেরা হলেন **রাঘল বোয়াল**। অর্থবান ব্যক্তিরা **টাকার কুমীর**। এই শব্দটি লোকমুখে টাকার কুবের-এর বিকৃতির ফল। কোন ব্যক্তির মাথা বড় হলে বলি **যশুরে কই**। মায়াকান্নার সার্থক উপমান **কুন্তীরাশ্রুপাত বা মাছের মায়ের পুত্রশোক**। উভয় সংকট বোঝাতে **জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ**। সাধারণ মানুষ **ঝাঁকের কই**। ঝিরিঝিরে বৃষ্টির ছবি প্রাণময় (ও রসময়) হয়ে ওঠে যখন তার নাম দিই **ইলশে গুঁড়ি**। সংসারের ঝামেলা অনেক সময় আমাদের **অক্টোপাসের** মত আমাদের চারদিক থেকে চেপে ধরে। কলরব মুখরিত স্থানের উপমা **মেছোহাট**। নাছোড়বান্দা মানুষের কামড় **কচ্ছপের কামড়**। বড় ধরনের বিবাদ দেখলে আমরা উপমা দিই — **গজ-কচ্ছপের লড়াই**। **কাঁকড়ার রাজনীতি** এদেশে কাউকে ওপরে উঠতে দেয় না। **ব্যাঙের সর্দি** হয়েছে শুনলেও হাসি পায়। সম্বল অল্প হলে **ব্যাঙের আধুলির** মত তা আমরা আঁকড়ে রাখি। বিপদে পড়লে **ব্যাঙের লাথিও** সহ্য করতে হয়। ব্যাঙাচির উপমাও আমরা নিয়েছি। কেশবের **লেজ খসেছে**, জানিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

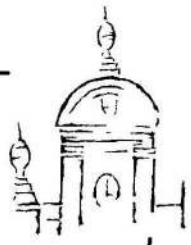

পাখির কলকাকলিতে রসসাহিত্যের জগৎ পরিপূর্ণ। গগন-বিহারী কবিকল্পনার অক্লান্ত পাখায় ভর দিয়ে বিহঙ্গকুল বহুবিচিত্র উপাদানে গান-গল্প-কবিতা-উপন্যাসের ভাব ও রসের জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা সাহিত্যে বিহঙ্গচারণার এক মুক্তক্ষেত্র হল প্রবাদ-প্রবচন। অল্প কয়েকটি নমুনা দেখা যাক্।

ময়ূরের পেখম অর্থে **কলাপ** অমর হয়ে থাকবে রূপকে আবদ্ধ **কীর্তিকলাপ** শব্দে। পার্কে মেয়েরা **পেখম মেলে** ঘুড়ে বেড়ায়। আমাদের সংগীতজগতে **কোকিল-কণ্ঠীদের** ভীড়। বঙ্কিমচন্দ্র বাবুদের গানের গলার ব্যাজস্তুতি করে বলেছেন— **দগ্ধকোকিলাহারী**। অর্থাৎ **পোড়া-কোকিল-খাওয়া** কণ্ঠ। ভীষ্মলোচন শর্মাদের আমরা উপদেশ দিই— "বাপু, **কোকিল পুড়িয়ে খাও**, তবে যদি গলায় সুর আসে।" আত্মসুখসন্ধানী **বসন্তের কোকিল** আমাদের জীবনে অনেক আসে।

কোকিলকে টেক্কা দিয়েছে কাক। যদিও **কাক-কোকিল ভেদ-জ্ঞান** সবার নেই। এই প্রাণীটি সংস্কৃতে ও বাংলায় অনেক অলংকৃত শব্দ দান করেছে। যেমন— **কাকজ্যোৎস্না, কাকচক্ষু, কাকনিদ্রা, কাকতন্দ্রা, কাকভীরু, কাকপক্ষ, কাকভূষণ্ডী, কাকভেজা, কাকতালীয়, কাকবলি, কাকবন্ধ্যা, কাকনাসা, কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং, কাগের বাসা, কাকতাড়ুয়া, তীর্থের কাক** ইত্যাদি ইত্যাদি। রুক্ষ চেহারার সার্থক উপমান — **কাকতাড়ুয়া বা দাঁড়কাক**। মাথার অবিন্যস্ত চুল দেখলে **কাগের বাসার** কথাই মনে পড়ে। সংবাদ সংগ্রহের আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে কাকের। তাই কোন কিছু গোপন করতে হলে আমরা চেষ্টা করি যাতে **কাকপক্ষী টের না পায়**। তোতা-ময়নারা **শেখানো বুলিতে** কথা বলে। **চিল-শকুন** অনেক ওপরে ওঠে, **দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ে। শকুনের অভিশাপে গরু মরে** না। **পঙ্গপালের** মত ছুটছে। স্বল্পাহার মানে **পাখির আহার**।

উপমার উদার জগতে কোন প্রাণী অচ্ছুৎ নয়। অল্প আয়ে **পিঁপড়ের পেট টিপে** সংসার চালাতে হয়। 'অতিদর্পে হত লংকা' -এর বিকল্পে বলি **পিঁপড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে। ছুঁচো মেরে কে হাত গন্ধ** করতে চায়? কারও একগুঁয়েমি দেখলে তাকে বলি **কেন্নোর আড়ি**। একগুঁয়েমির অন্য উপমা **শুয়োরের গোঁ। রতনে রতন চেনে, শুয়োরে চেনে কচু**। উচিত কথা বললে **জোঁকের মুখে চুণ** পড়ে। **প্যাঁচার মত মুখ** করে বসে থাকার কিছু নেই। মানতেই হবে সমাজে **ঘুণ** ধরেছে। কে কার **ভিটেতে ঘু ঘু চরাবে** বলা কঠিন। প্রতিযোগিতার **ইঁদুর দৌড়ে** আমি থাকবো না। **জেব্রা-ক্রসিং** দেখে রাস্তা পার হতে হয়।

মোট কথা, ভাষার জগতে না-মানুষ প্রাণিরা যথার্থ 'প্রবাদ-প্রতিম'। এদের আলংকারিক মহিমার অন্ত পাওয়া ভার। তালিকা দীর্ঘ হতেই থাকবে। তাই, ভাষার **কৃমি খুঁটে খুঁটে** তথ্য বিশ্লেষণের কাজে আপাতত ইতি।

হুমায়ুন কবির ঃ এক অনন্য ব্যক্তিত্ব

স্বপন কুমার দে
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

১

হুমায়ুন কবির। একটি নাম। কখনো ভুলবার নয় — বিংশ শতাব্দীর অফুরন্ত অজস্র বিখ্যাত নামের মধ্যেও। তবু একথা সত্য যে তাঁকে কি সেভাবে আমরা মনে রেখেছি! তাঁর জন্মের শতবর্ষের মধ্যে একটি জীবনীও কি বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে!

পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ)-এর অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার কোসারপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন কবির (পুরো নাম — হুমায়ুন জহিরউদ্দিন আমির-ই-কবির)-এর জন্ম। তাঁর পিতার নাম — খান বাহাদুর কবিরউদ্দিন আহম্মদ। .... ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন কবির কলকাতায় চলে আসেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হন। এই কলেজ থেকে তিনি আই. এ. এবং ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন এবং ঈশান স্কলার (Ishan Scholar) ও হন। এরপর সরকারি বৃত্তি লাভ করে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। কিন্তু ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র হলেও তিনি অক্সফোর্ডে ইংরেজি পড়েননি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে Philosophy, Economics এবং Politics নিয়ে একটি অনার্স কোর্স আছে। হুমায়ুন কবির এই কোর্সের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। এটা ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের কথা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি অক্সফোর্ড ইউনিয়ন সোসাইটির সম্পাদক ও জয়েন্ট সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন। কবির অক্সফোর্ড ব্রিটিশ জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির প্রথম ভারতীয় সভ্য ছিলেন। তিনি Exter College Foundation Prize ও পেয়েছিলেন।

হুমায়ুন কবির ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে দেশকর্মী শান্তি দাসকে বিয়ে করেন। এই বছরেই ড. সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণানের আমন্ত্রণে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করে কবির কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এশিয়াবাসীর মধ্যে কবিরই প্রথম অক্সফোর্ডে 'হারবার্ট স্পেনসার বক্তৃতা' (Herbert Spencer Lecture) দেন। স্বদেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টরেট' (Doctorate) উপাধিতে ভূষিত করে। রোম, প্যারিস, লণ্ডন, অক্সফোর্ড, আমেরিকা, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, ম্যানিলা, টোকিও, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, কলম্বো এবং ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা করেছেন। তিনি প্রথম এশিয়া সাহিত্য সম্মেলনে ও প্রথম এশিয়া ইতিহাস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। স্বদেশে ফিরে অধ্যাপনাকালে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। কৃষক প্রজা পার্টি গঠনে তিনি এ.কে. ফজলুল হকের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং ওই দলের প্রতিনিধি হিসেবে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের কথা এটা। পরে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন।

দেশভাগের কিছু পূর্বে কবির মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ব্যক্তিগত সচিব রূপে কাজ করতে আরম্ভ করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর আজাদ যখন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী সে সময় কবির ছিলেন ভারত সরকারের যুগ্ম-শিক্ষা উপদেষ্টা। এই সময় মৌলানা আজাদ তাঁর বিখ্যাত বই 'India Wins Freedom' প্রকাশ করেন। মৌলানা আজাদ উর্দুতে বইটির কাহিনী বলে যেতে এবং কবির তার ইংরেজি অনুবাদ করে লিখে নিতেন। ... এইভাবেই বইটি লেখা হয়েছিল।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কবির ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এন্‌কোয়ারি কমিটির সদস্য হন। আমেরিকার ইউনেসকোর তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে তিনি প্রতিনিধিদের সহকারী নেতা হন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। এই বছরেই তিনি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ কালচারাল রিলেসন্‌সের সহ-সভাপতি হন। শুধু তাই নয় নিউ ইয়র্কে অ্যাড্‌ভান্সমেন্ট এডিউকেশন্ ফণ্ড-এর পরামর্শদাতাও হয়েছিলেন। হুমায়ুন কবির ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা (১৯৫২-১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ) ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে কবির রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। এখানে উল্লেখ্য, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁকে মন্ত্রিসভার অসামরিক বিমান বিভাগের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। আজাদের মৃত্যুর পর তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন।

ক্যানবেরায় বিশ্বের প্রথম পূর্ব পশ্চিম দর্শন সম্মেলনে কবির সভাপতিত্ব করেন ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। পরে তিনি ভারত সরকারের শিক্ষা, অসামরিক বিমান চলাচল, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি বিষয়ক এবং পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রী হন। তিনি দিল্লিতে অল্ ইন্ডিয়া রাইটার্স কন্‌ফারেন্সের সভাপতি হয়েছিলেন ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে। .....

রাজনীতিকরূপে হুমায়ুন কবিরের প্রভূত খ্যাতি ছিল। ভারতের তিনটি বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন (কলকাতা বন্দর, বেঙ্গল-অসম রেলওয়ে এবং নিখিল ভারত ডাক ও তার কর্মী)-এর সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৬

খ্রিস্টাব্দে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে লোকসভা নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থি রূপে জয়লাভ করলেও কিছুদিন পর বাংলা কংগ্রেস ত্যাগ করে ভারতীয় ক্রান্তিদলে যোগদান করেন এবং শেষে লোকদল গঠন করেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম বাঙলায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। .... একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁর ভূমিকা বিভিন্ন মহলে ক্রমশ উত্তাপ ও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও ভাবমূর্তি বহুলাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এসেছিল। .....

২

হুমায়ুন কবিরের কর্মজীবনের এই রেখাচিত্রটুকু থেকে বুঝতে পারা যায়, রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও ভূমিকার কথাই সর্বজনাবিদিত। সাধারণভাবে তাঁর নিন্দা ও খ্যাতি যে এই ভূমিকারই ওপর নির্ভর করছে তা সত্যই দুঃখজনক।

কেন না, সকলে স্বীকার না করতে পারেন, কিন্তু আমাদের ধারণা — সাহিত্য এবং সাধারণভাবে রচনাকর্মই যদি তাঁর অখণ্ড মনোযোগ লাভ করত, তাহলে তিনি স্মরণীয় কীর্তিরই অধিকারী হতে পারতেন। সাহিত্য সাধনার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপনা তথা শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁর ধারাবাহিক ভূমিকা বজায় থাকলে হয়তো দেশ ও জাতি অধিকতর লাভবান হতে পারত।

যাই হোক, কী হলে কী হতে পারত, এ জাতীয় আলোচনায় বেশিদূর এগিয়ে লাভ নেই। তাঁর যেটুকু সাহিত্যকর্মের পরিচয় পাঠক হিসেবে আমরা পেয়েছি — তাও উপেক্ষার যোগ্য নয়। বিতর্ক কুটিল রাজনৈতিক জীবনের ফাঁকে ফাঁকে শেষদিন পর্যন্ত তিনি সাহিত্য সাধনা করে গিয়েছেন।

হুমায়ুন কবির ছাত্র বয়সেই লিখতে শুরু করেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক (১৯২৬-২৭) ছিলেন এবং অক্সফোর্ডে দুটি ইংরেজি জার্নালের সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে কবির 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। .... 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা 'পায়ের ধুলা' (১৯১৯-১৯২০) প্রকাশিত হয়। 'কৃষক', 'নবযুগ', 'নয়া বাংলা' ও 'Now' পত্রিকার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

হুমায়ুন কবিরের রাজনীতির দিকে একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল। কিন্তু রাজনীতি করেও তিনি কম লেখেননি। তাঁর সমস্ত রচনার আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে তাঁর লেখা বইগুলির নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সংগীত ঃ 'গান' (১৯২৬)।

কাব্য ঃ 'স্বপ্নসাধ' (১৯২৭), 'Poems' (১৯৩২), 'সাথী' (১৯৩৮), 'অষ্টাদশী' (১৯৩৮), 'Mahatma and other poems' (১৯৪৪)।

ছোটোগল্প ঃ 'Three Stories' (১৯৪৭)।

উপন্যাস ঃ 'Men and Rivers' (১৯৪৫), 'নদী ও নারী' (১৯৫২)।

প্রবন্ধ/নিবন্ধ ঃ 'Kants on Philosophy in General' (১৯৩৫), 'ইমানুয়েল কান্ট (দর্শন)' (১৯৩৬), 'Poetry monads and Society' (১৯৪১), 'বাঙলার কাব্য' (১৯৪২), 'ধারাবাহিক' (১৯৪২), 'Sarat Chandra Chatterjee' (১৯৪২) 'Muslim Politics (1906–1942)' (১৯৪৩), 'মোসলেম রাজনীতি' (১৯৪৩), 'The Indian Heritage' (১৯৪৬), 'Our Heritage' (১৯৪৭), 'মার্কসবাদ' (১৯৪৮), 'Of Cabbages and Kings' (১৯৪৮), 'A National Plan of Education in India' (১৯৫৩), 'Student Indiscipline' (১৯৫৪), 'Two studies on Education' (১৯৫৫), 'Science Democracy and Islam and other Essays' (১৯৫৫), 'Education in New India' (১৯৫৬), 'An Indian Looks at American Education' (১৯৫৬), "Letters on Discipline' (১৯৫৬), 'শিক্ষক ও শিক্ষার্থী' (১৯৫৭), 'Student Unrest' (১৯৫৮), 'Britain and India' (১৯৬০), 'Indian Philosophy of Education' (১৯৬১), 'Lessons of Indian History' (১৯৬১), 'নয়া ভারতের শিক্ষা' (১৯৬২), 'Studies in Bengali Poetry' (১৯৬২), 'কংগ্রেস মতবাদ' (১৯৬৪), 'দিল্লী ওয়াশিংটন মস্কো' (১৯৬৪), 'Gandhian Philosophy' (১৯৬৪), 'The Bengali Novel' (১৯৬৮), 'Minorities in Democracy' (১৯৬৮), 'Education for Tomorrow' (১৯৬৯), 'Muslim Politics (১৯০৬-১৯৪৭)' (১৯৬৯)।

অনুবাদ ঃ 'মসদ্দসে হালী' (১৯৪৩)।

সম্পাদনা ঃ 'Green and Gold' (Collection of Bengali short Stories & Poems) (১৯৫৮), 'Towards Universal Man' (১৯৬১), '101 Poems of Rabindranath Tagore (১৯৬৬)।

বক্তৃতা ঃ 'Mirza Abu Talib Khan' (The Russell Lecture) (১৯৬১), 'Rabindranath Tagore (Tagore Lectures — 1961) (১৯৬২)।

এই তালিকা দৃষ্টে কবির প্রতিভার বহুমুখি বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাবে। .... এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ করি চল্লিশের দশক থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাজনীতির এতটাই বিস্তৃত চর্চায় নিজেকে তিনি ব্যস্ত রেখেছিলেন যে বাইরের লোকের চোখে সেটাই হয়ে উঠল তাঁর বড়ো ভূমিকা, তাঁর সাহিত্যিক পরিচয় প্রায় থমকে গেল বলা যায়। লেখাতেও তাঁর ভাবনার কেন্দ্রে চলে এলো গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের কথা, সম্ভাব্য নতুন ভারতবর্ষে শিক্ষার, সমাজের বা সংখ্যালঘুর সমস্যার কথা। সে যাই হোক, হুমায়ুন কবিরের আরো বই থাকতে পারে বলেই আমাদের অনুমান। .... 'The Meaning of Islam' বইটি কবিরের লেখা। বইটির সন্ধান পরে পেয়েছি।

কিন্তু প্রকাশকাল পাইনি। তিনি তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমৃদ্ধ মুসলমান ঐতিহ্যকে স্বীকার করতেন বলেই এই বই লিখেছিলেন।

৩

এত ব্যস্ততার ভেতরে এত লেখা — কী অসাধারণ মনীষার অধিকারী ছিলেন তিনি — ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। কবিরের বইগুলি এই প্রজন্মের কাছে উপস্থিত করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখ হয় এই ভেবে তাঁর অধিকাংশ বই এখন দুষ্প্রাপ্য। ছাত্র জীবনে তাঁর লেখা কত বই সে সময়ে আমরা পড়তাম। মনে পড়ছে যেমন 'নদী ও নারী' উপন্যাস এবং 'অষ্টাদশী' কাব্যটির কথা। তেমনই ভুলতে পারি না 'বাঙলার কাব্য', 'Sarat Chandra Chatterjee' (বিশু মুখোপাধ্যায় যার বাংলা অনুবাদ করেছিলেন— 'শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব', ১৯৫৭), 'Studies in Bengali Poetry', 'The Bengali Novel' এবং 'The Indian Heritage' বইগুলির কথাও। ....

'The Indian Heritage' একটি অসাধারণ বই। কবিরের মননশীল প্রতিভার এক বিচিত্র সৃষ্টি এই বই। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। পরের বছর এর দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। তৃতীয় সংস্করণ হয় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। উৎসর্গ পত্রে লেখা আছে— 'To Jawahar Nehru, who like Shoka and Akbar has helped to discover and enrich the Indian heritage, in affectionate admiration'. মহারাজ সয়াজি রাও ১৯৪৩ (Maharaj Syaji Rao) খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন কবিরকে অখন্ড ভারততত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করতে অনুরোধ করেন। সেই বক্তৃতাগুলি থেকে এ-বইয়ের জন্ম। এ-বইতে দার্শনিক হুমায়ুন কবির এবং সাহিত্যিক হুমায়ুন কবির একাকার হয়ে গিয়েছেন। এই বইতে কবিরের কথা হলো এই যে সম্রাট অশোক একজন যথার্থ বৌদ্ধ ছিলেন এবং তিনি ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরে বৌদ্ধধর্ম সার্থকভাবে প্রচার করেছিলেন। অশোকই বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষের বাইরে ব্রহ্মদেশ, চিন দেশ এবং জাপানে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বইয়ের ভূমিকায় প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল চিত্র রয়েছে। গুপ্তযুগের হিন্দুসমাজ ও বৌদ্ধসমাজ একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষীয় সমাজ। এরপর ভারতবর্ষে নানা জাতির আগমন। কিন্তু তারা ভারতবর্ষীয় ঐক্যকে ক্ষুণ্ণ করেনি।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে, এটা নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের এক নতুন ভারতবর্ষের স্রষ্টা। এর স্রষ্টারা হলেন কবির, নানক, চৈতন্য, তুলসীদাস এবং তুকারাম। তিনি দেখিয়েছেন যে মধ্যযুগে ভারতবর্ষের অখন্ডতা কেবল রক্ষিত হয়নি ওটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা যাকে বলি অখণ্ড-ভারতবর্ষ সেই ভারতবর্ষের সৃষ্টি এই মধ্যযুগে। পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষ অধিকার করল, এবং যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করল তা হলো রাজনৈতিক ঐক্য। কিন্তু ভারত-আত্মার সৃষ্টি মধ্যযুগে। .... এইখানে আমরা দার্শনিক হুমায়ুন কবিরের পূর্ণ পরিচয় পাই।

আবার এই হুমায়ুন কবিরই এক অখণ্ড ভারতবর্ষের কল্পনা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি কখনও হিন্দু-ভারতবর্ষ ও মুসলমান ভারতবর্ষ বলে মনে করতেন না। তিনি যখন বাংলা সাহিত্য চর্চা করতেন তখন এই সাহিত্যকে হিন্দু সাহিত্য বলে ভাবতেন না। তিনি ছিলেন এক অখণ্ড বঙ্গদেশের মানুষ। ..... আমাদের মনে হয় এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কবিরের মনীষা সম্যক্‌ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। .....

দার্শনিক, শিক্ষাবিদ্, রাজনীতিবিদ্, প্রশাসক, সম্পাদক, কবি ও কথাকাব্যকার হুমায়ুন কবির দিল্লিতে ১৮ অগস্ট ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত হন।

মনীষী-কবি হুমায়ুন কবিরকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সহজ কবিত্ব-উচ্ছ্বাস থেকে মনন— দীপ্তি সচেতন কবিত্বে উত্তরণ : বুদ্ধদেব বসুর কবিতা

ডঃ মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

'কবিতার শত্রু ও মিত্র' গ্রন্থে সংকলিত 'কবিতা ও আমার জীবন আত্মজীবনীর ভগ্নাংশ' শীর্ষক প্রবন্ধে (শ্রাবণ, ১৩৮১, আগস্ট ১৯৭৪) বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছিলেন ঃ এক কালে কবিতার সঙ্গে আমার সরল একটি ভালোবাসা ছিল। .... ভাবতে হয় না কাটাকুটি অদল-বদলের বালাই নেই। এমনি করে লেখা হয়েছিল 'বন্দীর বন্দনা', 'কঙ্কাবতী' ও 'নতুন পাতা'র কবিতাগুলো, আমার সতেরো থেকে পঁচিশ বা ছাব্বিশ বয়সের মধ্যে। .... যা লিখছি তা ভালো হবে কি হবে না তা পুরোপুরি দৈবের উপর নির্ভর করছে। আমি ভাগ্যের গাঙে গা ভাসিয়ে চলেছি।' প্রেরণার মুখাপেক্ষী কাব্যিক উচ্চারণে এই সরল সহজ স্বতোৎসারের পাশাপাশি স্মরণ করা যেতে পারে বুদ্ধদেবকে লেখা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের — দুটি চিঠির দুটি অংশ। প্রথম অংশটি হল বুদ্ধদেব বসুর সদ্য-প্রকাশিত 'শ্রেষ্ঠকবিতা' পাঠের প্রতিক্রিয়ায় সুধীন্দ্রনাথের অভিব্যক্তি ঃ 'মনে পড়ে আপনার একেবারে প্রথম যুগের কোন এক পুস্তক সম্বন্ধে জনৈক বন্ধু আমার মতামত জানতে চাওয়ার আমি তাকে বলেছিলুম যে সমসাময়িক বাংলায় আপনি বোধহয় একমাত্র সহজ কবি। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার অধিকাংশ মত টিঁকে নেই। কিন্তু বর্তমান শ্রেষ্ঠ কবিতায় ঐ একটা মন্তব্য নতুন করে সমর্থন পেল। (কবিতা সুধীন্দ্রনাথ স্মৃতি সংখ্যা, ১মে ১৯৫৩ যুগ্মসংখ্যা, আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭)। দ্বিতীয় চিঠিটির তাৎপর্যপূর্ণ অংশটি এই 'আপনার গদ্যের ''কবিত্বে'' আমি চিরদিনই মুগ্ধ, আপনার পদ্যের বিরুদ্ধে নালিশ এই যে, তাতে গদ্যের প্রভাব অল্প।' (কবিতা, সুধীন্দ্রনাথ স্মৃতি সংখ্যা, ১৫ এপ্রিল, ১৯৪৬, যুগ্ম সংখ্যা আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭)। লক্ষনীয় কবিতার সঙ্গে সরল একটি ভালবাসা ও সহজ কবিত্বের যুগে বুদ্ধদেবের অবলম্বন ছিল দৈব অর্থাৎ মালার্মে-কথিত ল-আজার' বা 'Chance' ; যাকে সচেতন প্রয়াসে পরিহার করতে চেয়েছিলেন মালার্মের অনুগামী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বুদ্ধদেবের প্রথম দিকের কবিতায় রয়েছে এলায়িত শিথিল গীতিময় উচ্ছ্বাস। এই সহজ কবিত্বের সময়ভুক্ত 'নতুন পাতা'র 'চিন্তায় সকাল' নামক কবিতাকে বুদ্ধদেব পূর্বোক্ত 'কবিতা ও আমার জীবন আত্মজীবনীর ভগ্নাংশ' — শীর্ষক লেখায় 'চলতি মুহূর্তের কবিতা' — বলে আখ্যাত করেছেন। এ কবিতায় স্মৃতির কোন ভূমিকা নেই, এর উপাদান সবই সেই তাৎক্ষণিক মুহূর্তে দৃষ্ট ও অনুভূত হয়েছিল। তাঁর জীবনের পরম আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তটাকে সব সবুজগন্ধ ও সজলতা-সুদ্ধ তিনি বন্দী করতে চেয়েছিলেন। 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থে প্রথম জেগে উঠল কবির আত্মচেতনা, দেখা দিল প্রথম সুচিন্তিত শব্দচয়ন। এই কাব্যগ্রন্থেরই 'ব্যাং' ও 'ইলিশ' — কবিতা দুটি 'চিন্তায় সকালে'র বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় রচিত। কবিতাদুটিতে স্মৃতির প্রণিধানযোগ্য ভূমিকা ও কল্পনার প্রাধান্য লক্ষনীয়। ধীরে ধীরে বুদ্ধদেবের কবিতায় দূরপ্রসারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। উপরিউক্ত দুটি কবিতার পর 'দ্রৌপদীর শাড়ি' কাব্যগ্রন্থের 'অন্যপ্রভু', 'মায়াবী টেবিল', 'প্রত্যহের ভার' প্রভৃতি কবিতায় বুদ্ধদেবের শিথিলবন্ধ, উতরোল উচ্ছ্বাস সংযত ও সংহত হয়ে একটা দৃঢ় আঁটোসাটো বাঁধুনির মধ্যে আধারিত হতে চেয়েছে। এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ হয়েছে 'যে-আঁধার আলোক অধিক' কাব্যগ্রন্থে, যা বুদ্ধদেবের কবিজীবনের উজ্জ্বল এক সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে। বোদলেয়র ও রিলকের কবিতা, টমাস মানের কথাশিল্প এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের উজ্জ্বল সংক্রাম এই পরিবর্তনের পশ্চাতে সক্রিয় থেকেছে। বোদলেয়রকে 'কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা' বলে অভিহিত করেও র‍্যাঁবো তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'দ্রষ্টার চিঠি'তে বোদলেয়রের কাব্যপ্রকরণের প্রথা জীর্ণতা সম্বন্ধে অভিযোগ এনেছিলেন; অজ্ঞাতের আবিষ্কার নতুন আঙ্গিকের দাবি করে — এই ছিল র‍্যাঁবোর উপলব্ধ সত্য। বুদ্ধদেব কিন্তু বোদলেয়রের আঙ্গিকে মুগ্ধ হয়েছেন, বোদলেয়রের কবিতায় অনুভব করেছেন, রোম্যান্টিক ভাবকল্পনার সঙ্গে ক্ল্যাসিকাল আঙ্গিকের কাঙ্ক্ষিত মেলবন্ধন।

প্রেম, যৌবন ও কবিতা — বুদ্ধদেবের কবিতার প্রথম পর্বের এইসব বিষয়বস্তুকে ঘিরে 'বন্দীর বন্দনা ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৩০) 'কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা (১৯৩৭), দময়ন্তী (১৯৪৩), 'দ্রৌপদীর শাড়ি' (১৯৪৮), 'শীতের প্রার্থনা', বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫)। এ সমস্ত কাব্যগ্রন্থের নানা কবিতা রূপ পেয়েছে। 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থে ব্যক্তিহৃদয় থেকে উৎসারিত বিদ্রোহ ও কামনার পশ্চাতে উদ্ভিন্নযৌবন-যন্ত্রণাই প্রকট। ঈশ্বরসৃষ্ট প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী মানব-সত্তা নানা প্রতিকূলতা ও অসম্পূর্ণতাকে জয় করেছে সুন্দরের আরাধনায় — এখানেই মানুষ দেবতার প্রতিস্পর্ধী হয়ে কাব্যের অনিন্দ্য ভুবন তথা সৌন্দর্য জগৎ তৈরি করার প্রয়াস করেছে; 'আমি যে রচিবো কাব্য, এ উদ্দেশ্য ছিল না স্রষ্টার। তবু কাব্য রচিলাম, এই গর্ব বিদ্রোহ আমার।' (মানুষ) 'দ্রৌপদীর শাড়ি' কাব্যগ্রন্থেও কবিতা বুদ্ধদেবের কাব্যকল্পনায় অধিষ্ঠান করে; তাই নিবেদন করেন, 'বাণীর আত্মারে' আপন সত্তা বলে উপলব্ধি করেই তিনি প্রত্যহের ভার থেকে মুক্ত হন (প্রত্যহের ভার)। আরো পরে লেখা 'মৃত্যুর পরে জন্মের আগে' কবিতায় শব্দ আর নারী নিবিড়ভাবে সংলগ্ন হয়ে

যায় আত্মস্বরূপের অলজ্জ উচ্চারণে : 'যৌবন যখন ছিলো, যৌবনেরে / করেছি বন্দনা, যৌবন যখন যায়, যায় যায় তখনও আবার / যৌবনেরে করেছি বন্দনা, ... / যা কিছু লিখেছি সব, সবই ভালোবাসার কবিতা, / ..... / আজ যদি ভাবি, মনে হয় / নারীরে, বাণীরে / এক মনে হয়।'

বুদ্ধদেবের প্রথম দিককার কবিতায় দেখি উতরোল গীতিঝঙ্কার, পল্লবিত বিস্তার এবং গঠন-শৈথিল্য। আত্মজীবনীমূলক রচনা 'আমার যৌবন'-এর পাতায় বিধৃত হয়ে আছে সুইনবর্ণ সম্বন্ধে কবির উন্মাদনা, যে উন্মাদনায় 'কঙ্কাবতী' কবিতায় ভাবরিক্ত ধ্বনিস্পন্দন সৃষ্টির মোহময়তা, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দীর্ঘবিস্তারী পঙ্‌ক্তি বিন্যাসে, প্রায়শই শব্দ বিন্যাসের শিথিলতায় — 'এলোমেলো জলে আলো ওঠে জ্বলে ছল ছল ঢেউ তোমার নামে / তীরে চুমো খায়, দূরে নিয়ে যায় ঢেউয়ের জলের স্রোতের টানে / তোমার নামের শব্দ, কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কাবতী! / আকাশে ও চাঁদে, জলে আর মেঘে, দিগন্ত পারে গাছের ছায়ায়, / ফাঁকা আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মেঘের শরীরে, জলের স্রোতে — (কঙ্কাবতী)। কঙ্কাবতী-বিষয়ক 'আরশি', 'সেরেনাদ', 'কঙ্কাবতী ও রূপকথা' — কবিতা তিনটিতেও তাঁর স্বভাবসুলভ রোম্যান্টিক কল্পনাবিলাসী মন শব্দযোজনায় মননধর্মের স্বীকৃতিকে অগ্রাহ্য করে নিছক অগভীর ধ্বনিময়তাকেই আশ্রয় করেছে। এই পর্বেই রচিত কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা 'শেষের রাত্রি'র প্রথম স্তবক সম্বন্ধে একথা সত্য হলেও পরের স্তবকগুলি দীর্ঘ পাঁচ বছর বাদে লিখিত হওয়ায় প্রথম পর্বের অনর্গল স্বতোৎসারের ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়াস প্রায়শই দেখা দিয়েছে। 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থের 'শাপভ্রষ্ট' কবিতায় '... অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনা সযত্নে সাজাই নিত্য / উৎসবের প্রদীপের মতো আনন্দের মদির গোপনে'-র মধ্যে যৌবনের প্রতপ্ত ইন্দ্রিয়-বাসনার বেদনা দেহের বন্ধন ছিঁড়ে অমৃতের সন্ধানী হতে চায় — এমনতরো অনুভূতিকেই উপমার মতো সাজিয়ে তোলেন কবি। ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠা বাসনা-রক্তিম অনুভূতি রূপ পরিগ্রহ করে বাক্ প্রতিমার মধ্যে। 'নতুন পাতা' কাব্যগ্রন্থের 'চিক্কায় সকাল' কবিতায় নিসর্গের স্বপ্নময় স্নিগ্ধ নীলের প্রশান্তিময় বিস্তার বাসনায় আতপ্ত হয়ে ওঠে 'সূর্যের চুম্বনে' — 'রূপোলি জল শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ/নীলের স্রোতে ঝরে পড়ছে তার বুকের উপর সূর্যের চুম্বনে'। একটু পরেই 'ইন্দ্রধনু'র অপরূপ, অপার্থিব রূপমাধুরীর তীব্রতাস্পর্শী বিস্তারে এসে মিশে যায় 'রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে' উদ্বেলিত যৌবনের পার্থিব উন্মাদনা। অতিথি অধ্যাপকরূপে কবি উত্তর আমেরিকায় পিটসবার্গে থাকাকালীন বিদেশের তীব্র হিমশীতল রাত্রি মৃত্যুর আবহ ও অনুষঙ্গ নিয়ে 'শীতরাত্রির প্রার্থনা'য় মূর্ত হয়ে ওঠে — 'নিবিড় হলো রাত্রি, পাতলা চাঁদ ছিঁড়ে গেলো নেকড়ের মতো অন্ধকার/দলে দলে ডাইনি বেরোলো হাওয়ায়, আততায়ীর ছুরির মতো শীত।' হিমেল হাওয়ায় কুটিলতাপূর্ণ অমঙ্গল ও যাদুময় রূপ এবং অন্ধকারের আক্রমণোদ্যত হিংস্র ভয়ঙ্কর তৎপরতায় পুনরাবৃত্তিময় বর্ণনায় রূপ পেয়ে যায়। এই মৃত্যুর পটভূমিতে নতুন জন্ম যখন বসন্তের আতপ্ত প্রথম চুম্বনের প্রতীক্ষা করে তখনও শিথিল-বিস্তারী উচ্চারণ চলতে থাকে। 'শীতরাত্রির প্রার্থনা'ই বুদ্ধদেবের কবিজীবনের শেষ কবিতা যা স্বতোৎসারিত আবেগের তোড়ে বেরিয়ে এসেছিল। 'শীতরাত্রির প্রার্থনা' পড়ে সুধীন্দ্রনাথ কবিকে সাক্ষাতে জানিয়েছিলেন, যে তাঁর 'শীতরাত্রির প্রার্থনা' পড়ে ভালো লাগল, কিন্তু "there are too many মতো S"। এই অনুধাবন উস্‌কে দিয়েছিল বুদ্ধদেবকে, বিবৃতিধর্মী উপমা-খচিত বর্ণনার শিথিল বিস্তারের বদলে চিত্রকল্পের সংহত মিতায়নতন অভিব্যক্তি দিকে এগিয়ে দিয়েছিল।

'যে-আঁধার আলোর অধিক' থেকে বোদলেয়রের প্রভাবে বুদ্ধদেবের কবিতায় নতুন বিষয় — যা আধুনিক কাবতার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছিল — প্রভৃতি বা স্বভাবের সঙ্গে চৈতন্যের বিরোধ এবং তার পরিণামে চৈতন্যের মহিমোজ্জ্বল উদ্ভাস প্রকাশ পেল। বোদলেয়রের কাছে দীক্ষিত বুদ্ধদেবের মননে প্রাকৃতিক বস্তুর তুলনায় শ্রোয়োতর বলে প্রতিভাত হয়েছিল কৃত্রিম, রচিত, শিল্পিত বস্তু। তাই 'দ্রৌপদীর শাড়ি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'কার্তিকের কবিতা'য় বিধৃত মানবজীবনের ক্ষণায়ু চঞ্চলতার বিপরীতে নিসর্গের মহিমান্বিত রূপমূর্তির প্রতি আগ্রহ আত্যন্তিক বিমুখতায় পর্যবসিত হয় 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এ 'আটচল্লিশের শীতের জন্য ঃ ২' কবিতায়— 'প্রান্তরে কিছুই নেই, জানালার পর্দাটা টেনে দে / ওরা তোকে কেবল ভোলাতে চায় — / ঘাস মাটি পুকুর আকাশ।' অনিবার্যভাবে স্বতোৎসারিত গীতোচ্ছ্বাসের প্রতিভূ কঙ্কাবতীকে তিনি চেতনা থেকে বিদায় দিতে চেয়েছেন, বলেছেন — 'ভুলে যা ঝংকার ঝরণা, বরদ্রাত্রী কঙ্কাবতীরে, / যার ঠোঁট ছুঁয়ে ছুঁয়ে স্বরলিপি শিখেছিলি তুই;—' রূপান্তরের এ পর্বে তিনি সচেতন মননশীল কবি; যার অবলম্বন প্রায়শ সংক্ষিপ্ত সংহত সনেটকল্প কবিতা। প্রথমে পর্বের সহজ উপমার স্থান গ্রহণ করল গূঢ়প্রসারী চিত্রকল্প। 'যে-আঁধার আলোর অধিক-এর কবিতাগুলিতে গদ্যের স্বাচ্ছন্দ্য, নমনীয়তা এবং কথ্যভঙ্গির সংশ্লেষের ফলে তাঁর পদ্যে গদ্যগুণের অল্পতা সম্বন্ধে সুধীন্দ্রনাথের অভিযোগ দূর হল।

'দ্রৌপদীর শাড়ি' কাব্যগ্রন্থেই একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছিল যে, কবি আর বাইরের বস্তুজগতে ভরসা রাখেন না, ক্রমেই বহির্জগৎ ছেড়ে অন্তর্জগতে আশ্রয় নিচ্ছিলেন (মায়াবী টেবিল)। দ্রৌপদীর শাড়ির মতো অন্তঃহীন সৌন্দর্যের রহস্য উন্মোচনে মৃত হচ্ছিলেন (দ্রৌপদীর শাড়ি)। 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এ এই অন্তর্জগতে উত্থিত কবিতা তথা শিল্প সম্বন্ধে ধারণা, শিল্পের সমস্যা ও লক্ষ্য, শিল্পীর নিগূঢ় প্রতিক্রিয়া, স্মৃতির অতল অন্ধকারের মধ্যে নিহিত ঐশ্বর্যের মধ্যে শিল্পের প্রক্রিয়া ও উৎস সন্ধান — এমন সব বিষয় প্রধান হয়ে উঠেছে, যেগুলি মনন-নির্ভর; অর্থাৎ পূর্বের উচ্ছ্বাস-প্রবণ আবেগ-তাড়িত কবিতাগুলি বিষয় থেকে আলাদা। মাতৃজঠরে

নিহিত অন্ধকারের মতো স্মৃতির অতল অন্ধকারে লালিত সৃষ্টির প্রাণনা উজ্জ্বল উদ্ধারের মধ্যে দিয়েই 'আলোর অধিক' হয়ে ওঠে। জীবনের সব আয়োজনে, পরিশ্রম --- এমনকি প্রতি-কূলতার সারাৎসার নিশ্চিত রয়ে যায় আমায় স্মৃতির মণিকোঠায় — 'আঁধার তোমার স্বত্ব, কিন্তু তাই আলোর অধিক; / তুমি যা অলস হাতে ফেলে দাও, কানাকড়ি মূল্য নেই তার'। (স্মৃতির প্রতি ঃ ১) গদ্যাত্মক উচ্চারণে এসে মেশে 'কানাকড়ি'র মতো অকাব্যিক তুচ্ছ শব্দ; যা স্মৃতির ডালি থেকে মূল্যহীন মুহূর্তগুলিকে ঝরিয়ে দিয়ে যায়। ব্যক্তিসত্তার উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে স্মৃতি যে সৃষ্টিতে পরিণত হয় তা ছোট ছোট স্তবক এবং পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের সংহতি লাভ করেছে এইভাবে — 'অবিরাম চলে অধঃপাত / বাঁচে শুধু, যা তোমার হাত/চিরকাল মূর্ছার কন্দরে/রেখে দিয়ে, করে উন্মোচন — / রূপান্তর থেকে রূপান্তরে — / পৃথিবীর প্রথম যৌবন।' (স্মৃতির প্রতি ঃ ৩) 'মায়াবনবিহারিনী নিমিত্তচেতন হরিণী'কে লক্ষ্যভেদ করাই শিল্পীর লক্ষ্য। আত্মসৃষ্টিতে নির্ভর বলীয়ান শিল্পী কখনই সারথি-নির্ভর অর্জুন হয়ে নিঃশেষ হতে চায় না; আর সে কথাই ঘনসংবদ্ধ পঙ্‌ক্তিবিন্যাসে সংহতি লাভ করেছে; 'গাণ্ডীবের অবিচ্ছেদ ব্যবসায়ে পূর্ণ থাকে তূণ? / সারথি নিষ্পৃহ যবে, সেইক্ষণে নিঃশেষ অর্জুন।' (শিল্পীর উত্তর) আবেগ আতপ্ত বীজের মতোই নিটোল, পরিপূর্ণ ফলে পরিণত হওয়াই যে শিল্পীর সামর্থ্যের পরিচায়ক তা ফুটে ওঠে চিত্রকল্পের দূরপ্রসারী দ্যোতনায় —

'.... যদি কোনো দূরতর মেঘে/কাটিয়ে কঠিন রাত্রি, একদিন বীজের আবেগ/ফলে, উঠে নিটোল, উজ্জ্বল, পূর্ণ একটি আপেল।' (কবি ঃ তার ক্ষমতার প্রতি) কবি ব্যক্তিসত্তা তথা সৃষ্টি যে আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধীন হয়ে উঠেছে তা নানাভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গতানুগতিকতার মাঝে স্মৃতি অন্তরশায়ী কবিসত্তাকে সৃষ্টিসম্ভব করে তোলে — কবির সৃষ্টিশীল সত্তা জাগ্রত, সক্রিয় হতে থাকে স্মৃতির বৃন্ত থেকে ঝরে পড়া সঞ্জীবনী স্তন্যসুধা পান করেই — 'দূতের মতো হাওয়া / সিক্ত করে স্মৃতির স্তনের বৃন্ত — দুধের ফোঁটায়। কিছু না, কেবল হাওয়া; কম্পন, ভঙ্গুর ঢেউ, অথবা প্রমাণহীন/ মনের শিশুর কান্না ঠেলে ওঠে ঘুমের ধোঁয়ায়।' (স্বর) স্মৃতিস্বরূপা স্তনের চিত্রকল্পটি এভাবে কবিসত্তার প্রকাশে হয়ে ওঠে অমোঘ। 'নেশা' কবিতায় পুণ্য, প্রেম, মদিরা — বোদলেয়র-প্রদত্ত নিধানে নিরত থাকতে সচেষ্ট হতে কবির এই উপলব্ধি জাগে — 'তাঁর আজ্ঞা অমোঘ; অথচ দান, জপ, তপ, ব্রত / এ-সবের ক-অক্ষর আশৈশব গোমাংস আমার, / দিগন্তে মিলায় ক্রমে রশ্মিরাগ প্রেমান্ত-সন্ধ্যার; / এবং তন্মাত্র ট্যাঁকে পানপাত্র দূরপরাহত।' 'ক-অক্ষর গোমাংস' এই বাগ্‌ধারার উল্লেখ এবং অচিরেই 'তন্মাত্র'র অব্যবহিত পরে 'ট্যাঁকে'-র উল্লেখ বিদ্রূপের চকিত ঝলক — এসবের অসারতাকেই প্রতিপন্ন করে; শেষ পর্যন্ত কবিতার রস আস্বাদন করতে করতে রসসৃষ্টির নেশায় কবি মাতাল হতে থাকেন। এই পর্বে লেখা 'সমর্পণে'র মতো মগ্ন লিরিকটিতেও কঙ্কাবতী-পর্বের শিথিল এলায়িত বাগবিস্তারের পরিবর্তে এক ধরনের আপেক্ষিক ঘনসংহতি লক্ষনীয়। এখন মননের স্বতন্ত্র আয়তন কবির কল্পনা ও অনুভূতির সঙ্গে যোজিত হয়েছে; 'কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নয় আর।' (দায়িত্বের ভার) গতানুগতিক কর্মভারের জাল থেকে মুক্ত হয়ে দেহগত প্রেমের আলিঙ্গনে ধরা দিতে উন্মুখ হন; কিন্তু অচিরেই মনের পরিবর্তে মননের সর্বাতিশায়ী প্রভাবে সত্তার গভীরে 'নূতনতর দুরূহ দায়িত্বে'র ভার অনুভব করেন। এই দায়িত্ব পালনের মধ্যে সত্তার সারাৎসার সমর্পণ করেন লক্ষ্যভেদী পুনরাবৃত্তময় উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে ঃ 'কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর।' প্রথম উল্লেখে 'নয়' শব্দটির পরিবর্তে দ্বিতীয় উল্লেখে 'নেই'-এর ব্যবহারে ভাব-কল্পনার সঙ্গে মননের প্রার্থিত সমন্বয় অমোঘ হয়ে ওঠে। 'রাত তিনটের সনেট ঃ ১'-এ 'শুধু তাই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত' — এই ঘোষণার পর '....যীশু কি পরোপকারী/ছিলেন, তোমরা ভাবো? না কি যুদ্ধ কোনো সমিতির/মাননীয়, বাচাল, পরিশ্রমী, অশীতির/মোহগ্রস্ত সভাপতি?' এই সংশয়ী গদ্যাত্মক প্রকাশে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার ছায়াপাত অনতিপ্রচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত, অমিতদা

(জন্ম ঃ ২৫ নভেম্বর, ১৯৩৫, মৃত্যু ঃ ৩০ নভেম্বর, ২০০৭)

দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

১

অমিতাভ দাশগুপ্ত চলে গেলেন। কনুই পর্যন্ত গোটানো পাঞ্জাবি, ধবধবে ধুতি আর কাঁধের চিরসঙ্গী ঝোলাটি নামিয়ে রেখে তিনি চলে গেলেন, নির্দ্বিধায়। তেমন স্বাস্থ্যবান ছিলেন না কোনওদিনই। শেষ দু-তিন বছর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। নানা অত্যাচারে বিপর্যস্ত শরীর যে ক্রমশ থাবা বসাতে চাইছে মনের ওপর, বলতেন প্রায়ই। তবু প্রতিস্পর্ধী একটা সাহসী জগৎ বানিয়ে নিয়ে প্রায় দৌড়ে বেরিয়েছেন রোজ। শুয়ে পড়েননি, থামেনি কলমও। মৃত্যুর দুদিন আগে ২৮ নভেম্বরও প্রকাশিত হয়েছে একটি সংবাদপত্রে তাঁর ব্যক্তিগত কলম। দিয়ে গিয়েছিলেন এই সাপ্তাহিক কলম-এর আরও দুটি কিস্তি। যা প্রকাশিত হয়েছে মৃত্যুর পরের দু'সপ্তাহে।

১৯৫৭ সালে কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের প্রথম কবিতার বই 'সমুদ্র থেকে আকাশ' প্রকাশিত হয়। এ বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বছর বাইশের কবি ভিড়ে গেলেন হাজার বছরের প্রবীণ বাংলা কবিতার বহতা-জোয়ারে। ২০০৭-এর ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সেই কবিতা-যাত্রা। জীবন, দর্শন একাকার করে এক স্বকীয় কবিতা-পথে হেঁটে চলেছেন 'আগুনের নদী'-র কবি।

বাঁধা-ধরা ছক মেলানো জীবনে তাঁর আসক্তি ছিল না কোনও দিনই। কথায় কথায় প্রায়ই বলতেন, 'এমন বিচিত্র কিছু পুরুষ ও রমনীর সঙ্গে এ জীবনে পরিচয় ঘটেছিল আমার, যারা বাঁধা সড়ক ছেড়ে নাম-না-জানা পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার অস্তিত্বকে এক সময় তছনছ করে দিয়েছে। ঘুলিয়ে দিয়েছে বাঁচার অনুভূতি।' শক্তি চট্টোপাধ্যায় কি এই কারণেই তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হয়ে ওঠেন? ঘর ছেড়ে, নিষেধ আছড়ে বারবার পথে বিপথে ছুটেছেন দুই বন্ধু। সাগর-পাহাড়-জঙ্গল তাঁদের অবাধ্য পদচালনায় ত্রস্ত হয়েছে বারবার। অথচ, অমিতাভ চিরকাল আশ্বস্ত থেকেছেন বামপন্থায়। নিজের হৃদয় যতখানি বাঁদিকে, ঠিক ততখানিই বামপন্থায় বিশ্বাসী থেকেছেন।

প্রথম কবিতা বই থেকেই একটা নিজস্ব শৈলী গড়ে নিয়েছিলেন তিনি। আভরণ আর জটিলতার জাল ছিঁড়ে কবিতাকে জ্যান্ত কথায় নিয়ে আসাই বোধহয় অন্যতম লক্ষ্য ছিল তাঁর। সাধারণের মুখের ভাষায় মিশিয়ে দিতে চাইছিলেন কবিতাকে। সেই সাধারণ, যারা প্রতি মুহূর্তে টের পায় খিদের চাবুক, যারা মরিয়া হয়ে ওঠে ছিনিয়ে খাওয়ার জন্য। অথচ, তাঁর কবিতা কখনও জোর করে প্রচারের লাল পতাকা কাঁধে তোলেনি। জীবনাদর্শে তিনি যেমন ছিলেন খাঁটি, তাঁর কবিতাও তেমন খাঁটি কাব্যই হয়ে উঠেছে। যেমন ধরুন 'আগুনের নদী' কবিতাটির কথা। কোথাও প্রগল্‌ভ প্রচার নেই মেহনতি মানুষের, কিন্তু তাদেরই উষ্ণতায় যেন বল পায় কবিতাটি— 'মনে রেখো/তোমাদের এই তকতকে ঘরদোর/নিকানো উঠোন/কুসুমের মতো ছেলেমেয়ে/থালায় থালায় আমনের সুঘ্রাণ/গান স্বপ্ন কবিতা/এই সব কিছুর জন্য/আমরা রেখে এসেছি তাদের/যারা পিঁপড়ের কাছ থেকে শিখেছিল সহিষ্ণুতা/জিরাফের কাছে উচ্চাকাঙ্খা/খরগোশের কাছ থেকে/ঠাণ্ডা রাতকে শায়েস্তা করার নিয়মকানুন/আর/শত্রুর কাছ থেকে ঠিকঠাক ধাতুর ব্যবহার।' আবার, ভিয়েতনামে আগ্রাসী মার্কিন বাহিনীর ছাউনিতে বুকে বারুদ বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়া কিশোরীদের কথা লিখছেন যখন 'বারুদবালিকা'-য় তখন সেই দুঃসাহসী কিশোরীদের মুখচ্ছবিতে ক্রমশ ছায়া ফেলছে আমাদের মাতঙ্গিনী, প্রতিভা-লতিকাদের মুখ। দেশ-কালের গণ্ডি তখন একাকার গহন প্রতিবাদের প্রবল অভিজ্ঞানে। প্রেমের কবিতাতেও একেবারে নিজের ঢঙে কথা বলেন তিনি – 'সেরকম ভালোবাসলে/পাথরও ঝর্ণা হয়ে যায়/আর তুমি তো নারী!' এমন অহংকার বুকে লুকিয়ে যেন সটান চলে গেলেন অমিতদা, আগাম নোটিস ছাড়াই।

২

কেমন মানুষ ছিলেন অমিত দা? উত্তরে বলা যায়, তিনি আদ্যন্ত মানুষ-ই ছিলেন। মনুষ্যত্ব বলতে স্নেহ, মায়া, মমতা, বৎসলতা, শ্রদ্ধা, ঔদার্য, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি যেসব গুণের কথা আমরা জানি, অমিতদার মধ্যে সেগুলির এক আশ্চর্য সমন্বয় তো ছিলই, এর সঙ্গে অতিরিক্ত ছিল অকারণ পরোপকারের ব্যস্ততা। কোথায় কে কেমন আছে, কোন প্রত্যন্ত গ্রামে কেউ লিটল ম্যাগ বের করে— কী করে তাকে পরিচিত করা যায়। কোন গরিব ছাত্রের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কোনও গবেষকের প্রয়োজন পুরনো কোনও লেখা, কোনও নতুন কবি বই বের করতে পারছেন না — সবার পাশে নিজেই হাজির অমিতদা। এ সময়ের তরুণ প্রায় সব কবিকেই তিনি চিনতেন। বলে যেতে পারতেন তাঁদের কবিতা।

আমার মতো, না-কবি, না-তাত্ত্বিক, না-বুদ্ধিজীবী নিতান্ত সাধারণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সূত্রেও আছে ওই পরোপকারী-উত্তেজনা। প্রায় পনের বছর আগের কথা। সদ্য এম. এ. পাশ করে গবেষণা

শুরু করেছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক জ্যোর্তিময় ঘোষের ঘরে রোগা, ক্ষয়াটে চেহারার যে মানুষটি প্রায় বিপরীতধর্মী গম্ভীর গলায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ বা ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা বলে যাচ্ছিলেন কথায়-কথায়, তার সম্পর্কে কৌতূহল জেগেছিল ঠিকই, কিন্তু মার্জনা চেয়ে বলছি, তাঁকে তখনও তেমন চিনতাম না কবি হিসেবে ভাবতেও পারিনি। কোন এক বিখ্যাত নাটকে অজিতেশের চরিত্রটি প্রায় অভিনয় করে দেখাতে দেখাতে যিনি পরক্ষণেই বেরিয়ে গেলেন জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটে চেপে, তিনিই পরিচয় সম্পাদক, কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত—জানার পর লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে গিয়েছিল আমার। মানুষকে কত আপাত-দর্শনে দেখি আমরা!

ক'দিন পর জীর্ণ, অন্ধ সূর্য সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম 'পরিচয়'-এর দপ্তরে। সেদিনের কথা বলতেই ফের মজে গেলেন কবিতায়, কী আশ্চর্য স্মৃতি, কী গভীর কণ্ঠস্বর! কথা সাহিত্যিক সরোজকুমার রায়চৌধুরীর উপন্যাস নিয়ে কাজ করছি শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরলেন— 'কেউ মনে রাখল না, জানিস। তুই কাজ কর। পরিচয়-এর দরজা খোলা রইল তোর জন্য।' এমন একটা উষ্ণতা ছিল ওঁর কথায়, ভরসা জাগল। দু'দিন পর বিকেল ৪ টেয় আসতে বললেন, আর যাওয়া মাত্র হাতে তুলে দিলেন একটি বইয়ের তালিকা, যেগুলিতে সরোজকুমার বিষয়ে সামান্য হলেও আলোচনা আছে। সরোজকুমারের গ্রন্থ পঞ্জিটিও জোগাড় করে দেবেন জানালেন। অযাচিতভাবেই এতটা প্রাপ্তি মানুষটি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ বাড়িয়ে দিল।

তখনও ভাবতে পারিনি, অবিলম্বে তিনি অমিতদা হয়ে যাবেন, গৌতমদার (চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম হালদার) বাগবাজারের বাড়িতে এক-এক সন্ধ্যার নিছক আড্ডায় তাঁর স্মৃতি-সত্তা নিয়ে হয়ে উঠবেন অনিবার্য। উত্তর কলকাতার সঙ্গে তাঁর ছিল নাড়ীর সম্পর্ক। সে কলকাতার বিচিত্র বৈভব অমিতদার মতো আর কাউকে এমন কুড়িয়ে রাখতে আমি দেখিনি। তারাশঙ্কর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি মেসোমশায় ডাকতেন। ছুটির দিনে গলি আটকে ক্রিকেট বা ফুটবলে মানিকবাবুকেও কীভাবে সঙ্গী করে নিয়েছেন, শেষ বয়সে কী ভয়ংকর অসহায়তা ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের — এসবই অমিতদা সিনেমার মতো বলে চলতেন। সঙ্গীত, নাটক, সংস্কৃতি জগতের বাঘা-বাঘা মানুষদের সঙ্গে নাদান আমিও সে সব অবাক হয়ে শুনতাম গৌতমদার ঘরে পাতা মোটা শতরঞ্জির ওপর বসে।

পরোপকারকে জীবনের ব্রত বলে জানতেন তিনি। বইমেলায় কোনও লিটিল ম্যাগ ঠিকমতো জায়গা পাচ্ছে না, কোনও পত্রিকা অপমানিত হয়েছে কর্তৃপক্ষের আচরণে, — সর্বত্র অবাক অমিতদা। অধ্যাপক পবিত্র সরকার সেদিন বলছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সদস্য হিসেবে প্রায় প্রতিটি সভায় অমিতাভ জোরালো দাবি তুলতেন, নতুন কবিদের বই ছাপতে হবে বাংলা আকাদেমিকে। তরুণ কবিদের এই স্বীকৃতি দানকেও নিজের দায় বলে মানতেন।

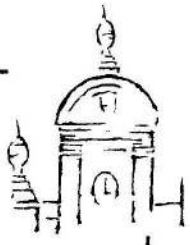

৩

শুধু কি কবি? অমিতদা ছিলেন এ সময়ে একজন সফল সম্পাদক, ঔপন্যাসিক, গদ্যকারও। ভাবতে অবাক লাগে, কী ইস্পাত কঠিন, দৃঢ়তায় তিনি 'পরিচয়'-এর অসাধারণ সব সংখ্যা নির্মাণ করেছেন। অন্য গদ্যের কথা বাদ দিয়েও গত পনেরো বছর ধরে 'সংবাদ প্রতিদিন' -এর পাতায় প্রতি বুধবার প্রকাশিত তাঁর কলম্ যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, বাংলা গদ্যের কী ভীষণ দরদী শিল্পী ছিলেন তিনি। দেশি, বিদেশি নানা শব্দের আশ্চর্য প্রয়োগ তাঁর গদ্যকে ক্রমশ অনর্গল করে তুলছিল। ব্যক্তিগত স্মৃতির পথ ধরে এগিয়ে চলা সে গদ্যের ছিল দুটি মুখ। একদিকে সে ফিরিয়ে দিত পুরনো ঐশ্বর্য, অন্যদিকে জারিত করত, উস্‌কে দিত গদ্যের নতুন বৈভব।

কেমন সে বৈভব? বেশি দূরে যাচ্ছি না। মৃত্যুর চারদিন পর ৫ ডিসেম্বর '০৭ 'সংবাদ প্রতিদিন'-এ প্রকাশিত লেখাটি এখনও টাটকা হয়ে আছে। ১৯৬১-৬২ নাগাদ জলপাইগুড়িতে কলেজে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন অমিতদা। থাকতেন স্টেশন লাগোয়া ওয়েসিস নামক হোটেলের এক অপরিচ্ছন্ন ঘরে। পিছনের ঘরেই থাকতেন ওই কলেজেরই তরুণ অঙ্ক শিক্ষক শুভব্রত। অঙ্কের শিক্ষক শুভব্রত, কিন্তু হোটেলের ঘরে তাঁর নড়বড়ে টেবিলে সাজানো থাকত সমুদ্রবিদ্যা, সম্মোহন, বজ্রযোগিনী কথা, মায়াবী রুমাল ইত্যাদি বই। গীতার সাংখ্যযোগের পঙ্‌ক্তি তিনি উচ্চারণ করে যেতেন ধূপ জ্বেলে। কলকাতার সমস্ত শ্মশানের ডোমেদের সঙ্গে দহরম ছিল শুভব্রতর। নিষ্কাম কর্ম সাধনা ও যোগিনীতন্ত্রের তত্ত্বকে মেলাতে চাইতেন তিনি। একেবারে ভিন্ন মেজাজের শুভব্রত অমিতদাকে বড় আকর্ষণ করতেন। অমিতদা লিখছেন, 'ওর অনুচ্চারিত গলায় আমি যেন শুনতে পেতাম কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে নবকুমারের প্রতি জটা-জুটধারী কাপালিকের অমোঘ ডাক — মামনুসর। ওই নৈঃশব্দের তর্জনি অনুসরণ করে আমি কতবার চলে গিয়েছি চিনেপাড়ার আণ্ডারগ্রাউণ্ডে তীব্র নীল ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চণ্ডুর আখড়ায়, ঘুটিয়ারি শরিফের অনামা গোরস্থানে, তারাপীঠের মুথা ঘাসভরা প্রান্তরে .... কেওড়াতলা সমেত সবকটি শ্মশানে। ..... যে পাড়ায় রাতে লোক বেড়ে ওঠে, সেখানে মাসে দু-একবার হৃত যৌবনা মধ্যবয়সিনীর সঙ্গ করত শুভব্রত। ব্রাহ্মণ্যবোধ ছিল তার টনটনে। ..... শুভব্রত মহিলাটির ঘরে ঢোকার আগে আমার কাছে নির্ভুলভাবে গচ্ছিত রেখে যেতে তার ধবধবে কাচা পৈতেটি। ..... মধ্যরাতের পর ফিরে আসত শুভব্রত। তারপর, কোনও কথা না বলে তার পেছনে ধীর কদমে হাঁটতে থাকতাম।' এমন বিচিত্র স্বভাবের শুভব্রত একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন। 'বিশ বছর বাদে ডুয়ার্সে বেড়াতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ সেখানে জয়ন্তী পাহাড়ের কোলে তার সঙ্গে দেখা। মাথায় বাঁকানো নেপালি টুপি, সঙ্গিনী এক

নেপালি রমনী এক খুপরিতে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণার্তদের কমলালেবুর চোলাই মদ বিক্রি করছিল। দূর থেকে তাকে অনেকক্ষণ দেখে এক অহস্য কষ্ট বুকে ফের রাস্তায় গর্জাতে থাকা জিপের দিকে পেছন ফিরেছিলাম আমি।' এমন অননুকরণীয় গদ্য অমিতদা লিখে গেছেন রোজ। বলা কথা তো বটেই, তাঁর না বলা কথাও ওই শেষ বাক্যে কী প্রবল ব্যঞ্জনা নির্মাণ করে পাঠক মাত্রই অনুভব করতে পারবেন।

'সংবাদ প্রতিদিন'-এর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় একেবারে শুরু থেকে টানা ১৫ বছর ধরে বহমান তাঁর কলম বোধহয় সাধারণ পাঠকের সঙ্গে অমিতদাকে সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাঠকের চিঠি ছাপা হত 'ভালো আছ কলকাতা?' নামে ওই কলম পাঠের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত।

কলকাতাকে তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্বের নিবিষ্ট সাক্ষী করে তুলেছিলেন অমিতদা। শুধু নাম মাত্র নয়, তাঁর কলকাতা হয়ে উঠেছিল একটা ডাক, যা উত্তর থেকে দক্ষিণ, পুব-পশ্চিম এফোড় ওফোড় করে ছড়িয়ে পড়ত আরও দূরান্তে। সে কলকাতার অনুষঙ্গে কখনও আছড়ে পড়ত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মূর্ছনা, পিটসিগার থেকে ব্যাণ্ড মাস্টার তুষার রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় থেকে ভাস্কর চক্রবর্তী, নিষিদ্ধ নেশা থেকে কবিতার মুক্ত হাওয়া, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে কেয়া চক্রবর্তী, নট-নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত (সম্পর্কে তাঁর মামা) কিংবা প্রভা দেবী। উত্তর কলকাতার বাবু কালচার, রূপচাঁদ পক্ষীর আড্ডা, শীল-দত্ত-মল্লিক মিত্তিক বাড়ির বনেদিয়ানার জৌলুস, 'লাখ টাকা দিয়ে পোষা বাঁদরের বিয়ে দেওয়া, প্রতিদিন বিকেলে বাবুদের বাড়ির ছাদ থেকে পায়রা ওড়ানো — যে সবের অস্তরাগ একেবারে শৈশবে আমারই দেখাশোনা' — লিখেছেন অমিতদা। আর এসবের ফাঁক গলে হঠাৎ-হঠাৎ এসে পড়তেন শুভব্রত, স্কটিস চার্চ কলেজে তাঁর সহপাঠী নওলকিশোর ওরফে কচি, তরু বৌদি। অথবা সেই গা-ভরা যুবতী তাঁর বন্ধুর দিদি, যাকে দেখে কিশোর অমিতাভ প্রথম প্রেমে পড়েছিলেন! যে বাদাম খেতে খেতে কিশোর অমিতাভের গালে ঠোনা মেরে বলেছিল, 'তুই না আমায় দিদি বলে ডাকিস?' আর হাতে গুঁজে দিয়েছিল কয়েকটা বাদাম।

সেদিন আপনি ভালো ছিলেন না অমিতদা, আজ আমরা, আপনার কলকাতা ভালো নেই।

'উলগুলান'-এর পরে

জয়িতা দত্ত
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

ঘন ধূসর মেঘের গায়ে আগাম বর্ষণের পূর্বাভাষ লেখা থাকে। তখন থেকেই শুরু প্রহরগণনা। স্পন্দিত ঘনিষ্ঠ কতকগুলো নিরবলম্ব মুহূর্তের অতিক্রান্ত হবার অপেক্ষা। জমাট বাঁধা বৃষ্টিবিন্দু অক্লান্ত প্রস্রবণ হয়ে এরপর ভিজিয়ে দেবে মেদুর ধরণীকে। আর মেঘ থেকে বর্ষণ কিংবা বর্ষণ থেকে মেঘের এমন নিয়ত, এমন অবিরত আসা যাওয়ার সাক্ষী হয়ে থাকবে চরাচর। আসলে সাক্ষী হয়ে থাকাটাই চরাচরের ভবিতব্য। সেই ভবিতব্য নিয়েই একদিন তমসাময়ী আরণ্যক চাক্ষুষ করেছিল মহর্ষি থেকে মহাকবিতে রূপান্তরীভবনের এক দুর্লভ মুহূর্ত। দেখেছিল ব্রহ্মজ্ঞ তপস্বীর ললাটে শাশ্বতীর আগমন, ...'সহসা ললাটভাগে জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে জাগিল বিজুরি যেন নীল নবঘনে।' আর শুনেছিল এক অশ্রুতপূর্ব সৃষ্টিসুখের উল্লাস। অরণ্য পত্র-মর্মরে ধ্বনিত হচ্ছিল আদিতম শ্লোকের রাগিণী। বনজ্যোৎস্নার ফুটফুটে আলোয় সেজে সঙ্গীতের আলাপনে, মূর্চ্ছনায় মাতাল চরাচর তবু ভোলেনি 'শোক'কে। মৃত এক পক্ষীনারীর দেহকে ঘিরে তুচ্ছ এক পুরুষপাখীর আর্তনাদ। আর ভোলেনি বলেই উন্মুখ দৃষ্টি মেলে খুঁজে বেড়িয়েছে সেই বিভীষণ হৃদয় নিষাদটিকে — যুগবাহিত অন্ধকার বুকে নিয়ে যার দু'চোখ শুধু মৃত্যু-মহোৎসবে বেঁচে থাকবার খোরাক খোঁজে। হতশ্রী, ঘৃণ্য নেপথ্যচারী ঐ জল্লাদ! তবু কোথায় যেন নিষাদ অনুসন্ধানের অন্য কোনো তাগিদ থাকে। কোনো আন্তর প্রেরণা। জল্লাদই না হয় হল, তবু তার শরনিক্ষেপের অনিবার্য অংশিদারিত্ব ছাড়া সৃষ্টির প্রথম অঙ্কুর আকাশ কুসুম চয়ন করত কেমন করে? নিঃশব্দ চরাচরের চোখ দু'টি খোলা। নিষাদের খোঁজ ও পাবেই।

খুঁজতে গিয়ে ঘুরতে হল তামাম ভারতবর্ষ। পৌঁছে যেতে হল কোন সুদূর প্রাগার্য-অতীতে। প্রাক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী যাদের ডাকা হত প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড বলে সে-ই তাদের মধ্যে কিংবা তার কিছু পরে দ্রাবিড় অথবা আলপীয় অবৈদিক ভাষাভাষীদের ভেতর। অনার্য নৃতাত্ত্বিক বুনিয়াদের অণু-পরমাণু জুড়ে ছড়িয়ে আছে এসব রক্তবীজ নিষাদের দল। খুঁজে পেয়েছে চরাচর। আর স্তম্ভিত হয়ে গেছে ওদের বেপথু ইতিহাসের নিয়তি দেখে। সিন্ধু-উপত্যকার আনাচে-কানাচে, চাঁদ-সূর্যের জোয়ার ভাটায় দুলতে থাকা, খেলতে থাকা, ভাসতে থাকা অবাধ নিষ্কলঙ্ক, অকপট জীবনগুলো পঞ্চনদকেন্দ্রিক আর্য সভ্যতার অতর্কিত ধাক্কায় কেমন 'নিষাদ' বনে গেছে। অপরাহ্নের ছায়া ঘনায়িত মেঘে মেঘে, ডাল ও ঝুড়ির অরণ্যানীতে, শৈলশ্রেণীর লালচে চূড়ায়, হেলে পড়া হলদে রোদ মেখে প্রাচীন বটের মৌনতায়, গুপ্ত গিরিগুহায়, চূর্ণায়মান অস্থিকঙ্কাল রেখায় লেখা আছে সে ইতিহাস। অনার্য আদিম জাতির আর্য-আবহাওয়ায় 'ভিলেন' হয়ে ওঠবার অজ্ঞাতপূর্ব সব নথি। দোবরু পান্নার রাজ সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে সত্যচরণ এমনটাই দেখেছিল। দেখেছিল সর্বব্যাপী শাশ্বত কালের পেছন দিককার অন্য এক অভিজ্ঞতার জগৎ।

তবু দেখলেই যে সেই নতুন অভিজ্ঞতার প্রচারক কিংবা প্রভাষক হতে হবে এমন কথা কে বলেছে! অভিজ্ঞতার ভাঙাচোরা, নির্মাণ-বিনির্মাণ তো অহংবান আধুনিক মানুষের জীবনদৃক্ষারই অনিবার্য ধর্ম! কিন্তু সংস্কৃতির তথা উপলব্ধির হাইব্রিডিটির স্রোতে গা ভাসিয়ে সময় বুঝে নিরঙ্কুশ 'আম-জনতা' হয়ে ওঠবার প্রবণতাও কি তার অধুনা জীবনের আবশ্যিক পরিণাম নয়? ফলে পোড় খাওয়া মানুষ এসে পৌঁছোয় একটা নেগোসিয়েশনে। দরকষাকষি করতে করতে, অভিজ্ঞতার সোঁতে-সেঁউতিতে ঠেকতে ঠেকতে শেষ পর্যন্ত পক্ষপাতহীন সমঝোতার 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের সীমা তাকে টানতেই হয়। কারণ, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে .... কোনটা সাদা আর কোনটা কালো — এ নিয়ে এতদিনকার ছকবন্দি সিদ্ধান্তগুলোকে সহসা বদলে ফেলা অসম্ভব। তাই এই সমঝোতা। তাই দুনিয়া জুড়ে আর সাদা বা কালো নয় .... আদ্যন্ত ধূসরের রাজত্ব। একই সত্তার গভীরে থিসিস আর অ্যান্টিথিসিসের বহাল তবিয়তে টিকে থাকা। লবটুলিয়া আর নাড়া বইহারের সীমানা পার হয়ে মহালিখারূপ পাহাড়ের প্রেমকে পেছনে ফেলে সত্যচরণ তাই একসময় খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হয় তাঁর পুনঃপ্রত্যাবৃত শহরে। '..... কতকাল তাহাদের আর খবর রাখি না' বলে আপাতত মুখবন্ধ করে স্মৃতির ঝাঁপি। আর 'একবার ক্ষণিকের জন্য আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতল তলায় নিমগ্ন হয়ে যায়। যামিনীর প্রতি কথকের বিশ্বাসঘাতকতায় মুখর হয়ে উঠতে পারে অনুভবীর মন। তবু একই জায়গায়, মহানগরের সেই জনাকীর্ণ আলো ঝরা রাজপথের মোহময় চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে সে অনুভবীও কি ঐ কথকের মত একই বর্গে সামিল হবেন না? সময়ের সাগরে ক্ষণিকের শিশির বিন্দুর বুদ্‌বুদ্ হয়ে মেলাতে কতক্ষণই বা লাগে! আর না লেগেই বা উপায় কী। শেষ পর্যন্ত তো সত্যি হবেই—

> নীড় ভেঙে অন্ধকারে এই মৌন যৌথ মন্ত্রণার
> মালিন্য এড়ায়ে উৎচক্রা হতে ভয়
> পাই। সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে
> ভয়াবহ ডাইনীর মতো নাচে — ভয় পাই — গুহায় লুকাই।
> (ইতিহাস যান/জীবনানন্দ দাস)

হয়ত এমন ভাবনা নিয়েই লেখা হয়েছিল বাল্মীকি রামায়ণ। আর্ষ মহাকাব্য। ধীরোদাত্ত নরকুলচন্দ্রমা নায়ক আর মদগর্বী পৈশাচিক প্রতিনায়কের কাঠামো তাঁরই হাতে গড়া। তবু বাল্মীকি মহাকবি তো। নায়ক আর প্রতিনায়ককে ভিন্ন ভিন্ন কোটায় রেখে, সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী

ব্যবহার এবং কর্মের সঙ্গে জুড়ে দিয়েও কোথায় যেন প্রশ্নচিহ্ন ছুঁইয়ে রাখলেন কবি। ধন্দে পড়ে যাবার মত প্রশ্নচিহ্ন একেবারে মূলের সংজ্ঞাকেই কটাক্ষ করল। সত্যিই কি 'নায়ক' হতে পারবার যোগ্যতা আছে রামচন্দ্রের! তা যদি থাকে তবে দশাননের দোষটি কোথায়? না কি নায়ক আর প্রতিনায়ক বলে আলাদা কিছু হয় না—সব নিয়েই সেই সর্ষে-ভূতের কারবার — সেই ধূসর অস্তিত্বের টিকে থাকা।

বাল্মীকি বিবৃতি দেননি — কারো পক্ষ ধরেন নি — শুধু উস্‌কে দিয়েছেন কিছু প্রশ্ন। শুধু চাক্ষুস করিয়েছেন সীতাতুল্য পত্নীকে পরিত্যাগ করে কেমন করে রামচন্দ্র দাম্পত্য বিচ্ছেদকে প্রথম আইনাযুগ করলেন। যার জন্য এই ত্রিভুবন-উৎসারী যুদ্ধ, যার অদর্শনে দাশরথীর মৃত্যুতুল্য মানসিক যন্ত্রণা ভোগ সেই রামচন্দ্র দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর যখন সীতাকে দেখলেন তখন ভেতরে ভেতরে জ্বলে গেলেন। বাইরে স্থিতকণ্ঠ, স্থিতপ্রজ্ঞ, নিরাসক্ত — আর ভেতরে ঝড়। বললেন 'যুদ্ধ করে সে জয়লাভ করেছি সে তোমার জন্য নয়' — ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ। আশ্চর্য! তবে কার জন্য? নিজের বিখ্যাত বংশের কলঙ্কমোচনের জন্য, আপন শৌর্য প্রমাণের জন্য। তবে ঢের হয়েছে, আর নয়। জাহ্নবীর চরিত্রে রামচন্দ্রের সন্দেহ জন্মে গেছে। পরগৃহে বাস করেছে যে নারী, যে নারী রাবণের অঙ্ককলঙ্কিতা, তার দুষ্ট দৃষ্টিতে দূষিতা, কোনো সদ্বংশজাত তেজস্বী পুরুষ পুনর্বার তাকে গ্রহণ করতে পারে কি? তার ওপর রয়েছে সীতা সম্পর্কে রামচন্দ্রের সন্তানতুল্য প্রজাদের ভাবভঙ্গিতেও সন্দেহের খচখচানি। অতএব, ... যাও বৈদেহি, তুমি মুক্ত। .... 'গচ্ছ বৈদেহি মুক্তা ত্বং যৎ কার্যং তন্ময়া কৃতম।' আমার যা করার ছিল সব করেছি। এখন তোমাতে আমার কোন আসক্তি নেই। যেখানে ইচ্ছে চলে যাও। .....

যদর্থং নির্জিতা মে ত্বং সোদুমাসাদি ময়া।
নাস্তি মে ত্বব্যভিষ্বঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতি।।

ফলে সীতা চললেন অগ্নিগর্ভে। শাস্ত্র বলে এই অগ্নিযাত্রা আসলে নিজের সাধীত্ব প্রমাণের পরীক্ষা। বলে, এ হল সত্যক্রিয়া। কিন্তু সীতা হয়ত আত্মহনন করতেই চেয়েছিলেন। কী লাভ বেঁচে থেকে! কী আছে জীবনে! মধ্যিখানের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কতকগুলো বছরের প্রলম্বিত স্মৃতিপুঞ্জ ছাড়া! ধরিত্রীকন্যা সীতা সরে যাচ্ছেন রামের জীবন থেকে .... যেতে বাধ্য হচ্ছেন। যেমন করে যেতে বাধ্য হয়েছিল ওরা। ঐ যে ভারতবর্ষের আদিম অনার্য ক্ষেত্র সম্ভূতরা। আর্যের পরাক্রমে, দম্ভে, কৌশলী চাপে। সীতার দীর্ঘশ্বাস মিশে আছে দণ্ডাকারণ্যের নিকষ শর্বরীতে। আর আদিম মানুষের কান্না ঝরে পড়েছিল সাঁওতালি গানে ঃ

চাম্পা গড় দ লিলিবিচি
বাদোলী কঁয়ডা লিখন-গড়হন
দায়াগে চাম্পা বাদোলী কঁয়ডা
দায়া গে গাড় বো দাঁগিয়ক্ কান।

অর্থাৎ— চাম্পা গড় নানারঙের নমুনায় চিত্রিত
বাদোলী কঁয়ডা জীবজন্তুর নকশায় পূর্ণ।
বড় দুঃখে চাম্পা বাঁদোলী কঁয় ডাকে
বড় দুঃখে গড় ছেড়ে যেতে হচ্ছে।

স্মৃতির কোটরে হাহাকার করে ফিরতে লাগল — দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না। "সোনার খাঁচা" কেন, কোনো খাঁচাই নেই। আশ্রয় নেই, ছাদ নেই। ফলে ওরা কখনও অরণ্যের আড়ালে আবডালে ঘুরতে থাকা নিষাদ তো কখনও বাজিকর। বাল্মীকির আদি শ্লোক জাগরুক ব্যক্তিত্ব হয়ত আজকের অভিজিৎ সেনদের উপন্যাসে 'রঘু চণ্ডালের হাড়' নিয়ে খেলা দেখায়। ঘর নেই বলে দুনিয়া জুড়ে ওদের নিবাস। গোরখপুর থেকে রাজমহল। সেখানে থেকে মণিহারিহাট, হরিশ্চন্দ্রপুর, সামামি হয়ে মালদা। পূর্বে আর ও পূর্বে ..... পূর্ব পুরুষদের শুভ সংস্কারকে মাথায় রেখে ক্রমশ সূর্য উদয়াচলমুখী পূর্বের দিকে ওদের অভিযাত্রা। তবু তাতেও বাধা। মার খেয়ে তাই সরতে হল দ্রুত পশ্চিমে। সমাজের 'মেইন স্ট্রিম'-এর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের মত এদেরও বাসনায় প্রবল হয়ে উঠতে থাকে একটি স্থায়ী ঠিকানার স্বাদ। থিতু হয়ে বসা। সমাজের মূলধারায় মিশে যাওয়া। কিন্তু সে কি করে সম্ভব! কে বসে আছে ওদের দলে নেবার জন্য! ঘর হয়ত একটা পেলেও পেতে পারে— কিন্তু মর্যাদাহীন সেই ঘরে থেকে স্বাধীনতার সুখ কি মিলবে? না, তা মিলবে না। ক্ষমতাবান সামাজিকদের কবজায় নিষ্পেষিত হওয়াই ওদের পরিণতি হবে। মজার ব্যাপার হল অতিক্রান্ত সময়ের নকশায় দিনবদলের ছাঁদটুকুই শুধু বদলায় — কিংবা বদলানোর অভিনয় করে — আসলে যে-কে-সেই। দিন যেমন ছিল তেমনই আছে। সেই কোন্ দূরবিলীন আর্যভাষ্যে— ঋগ্‌বেদে, সংহিতায়, ব্রাহ্মণে পোঁতা হয়ে আছে আজকের বিদ্বেষের বিষ।

ইন্দ্র জহি পুমাংসং যাতুধানমুত স্প্রিয়ং মায়য়া শাশদাণাম্
বিগ্রীবাসো মূরদেবা ক্রদন্ত মাতে দৃশনং সূর্য্যমুচ্চবন্ধ্যা।।

(ঋগ্বেদ ৭/১০৪/২৪)

(হে ইন্দ্র! পুরুষ যাদুকর ও কপট মায়াবিনী ঐন্দ্রজালিক নারীগণকে বধ কর, ঐ মূল দেবগণ ছিন্নমস্তক হয়ে বিনষ্ট হোক, সূর্যোদয় দর্শন যেন ওদের ভাগ্যে না ঘটে)

পরাশৃণীহি তপসা যাতুধনান্
পরাগ্নে রক্ষো হরসা শৃণীহি।
পরিচর্যা মূরদেবাঞ্জুণীহি
পরাশুতৃপো অভি শোশুচানঃ।।

(ঋগ্বেদ ১০/৮৭/১৪)

(হে অগ্নিদেবতা! তুমি তোমার অতি তাপের দ্বারা যাদুকরণকে ছিন্ন করো, অতি তেজের দ্বারা রাক্ষসগণকে ছিন্ন করো। অতি কিরণ জাল দ্বারা মূর-দেবগণকে ছিন্ন করো। তোমার আত্মতৃপ্তিদায়ক শক্তির দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করো।)

হ্যাঁ, অগ্নি, ইন্দ্র প্রমুখ শ্রেষ্ঠ দেবগণ শ্রেষ্ঠ মানবের প্রার্থনা শুনেছেন। আর্য সভ্যতার ব্রাহ্মক্ষণে অপরের ধ্বংসের জমিতে

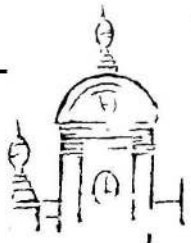

নিজেদের সার্থকতার বীজবপন শাস্ত্রানুমোদিত হয়েছে। ফলে মার্কস এঙ্গেলসরা একালে যতই আস্ফালন করুন না কেন — শোষক শোষিতে, তথা কলোনিয়াল-কলোনাইজডের আবহমান বনেদি বিচ্ছিন্নতাকামী ভাবনার মূলোৎপাটন অত সস্তা নয়। আর্য-অনার্যে, ধনী-দরিদ্রে, ব্রাহ্মণ-শূদ্রে এবং পুরুষ ও নারীতে থাকে-থাকে, স্তরে-স্তরে, শোণিতে শোণিতে মুদ্রিত হয়ে গেছে বিজয়ী-বিজিতের জয়-পরাজয়ের কনসেপ্ট। কিন্তু অন্য একটা বার্তা আসছে, একটা ভয় জাগানো বার্তা ঐ নিষাদ, সাঁওতাল, বাজিকরদের কাছে থেকে। ওরা দল বাঁধছে। চাপা গুঞ্জন শুরু হয়েছিল আগেই — যখন ওরা বলছিল রাম-লক্ষ্মণের দলে নয়, তারা আছে রাবণের সঙ্গে। কারণ—

রামগে দয় আতরাদা দিসমদ
লক্ষ্মণগে দয় জুঁড়িয়া দা দিসমদ
দেশ দরে ল লাটিচ এন হো
দিসম দরে হাসা ডিগিরেণ।

অর্থাৎ— রামই দেশ পুড়িয়ে দিল
লক্ষ্মণই দেশে আগুন লাগাল
দেশ পুড়ে ছারখার হল
দেশ ধ্বংস হল।

ধ্বংস হল স্বর্ণলঙ্কা। রাবণের দেশ। 'পাবকশিখারূপিণী জানকী যত নষ্টের গোড়া। নয়ত বোন সূর্পণখার সম্মানরক্ষা কি অন্যায়! লোকটার তেজ ছিল, উদ্যম ছিল। নারীর রূপে পদস্খলন কোন্ নায়কের না হয়েছে — রঘুবংশের ঐ চার দশরথ নন্দন ছাড়া! আসলে রাবণ সীতাকে জড়িয়ে ভিলেন হয়ে গেলেন উজ্জ্বল, প্রশস্ত, গণ সমর্থনের অভাবে। আর রামচন্দ্র সীতা বিসর্জনের মত মহাপাপকর্ম করেও নায়ক হয়ে রইলেন চোখ বুলোনো 'লোকরঞ্জক' ছদ্মবেশ ধারণের কারণে। ফলে সেই রামচন্দ্রের দেশে, সেই আর্য-আধিপত্যে, সেই লোক-ঠকানো জাঁকালো বৈদিক গাম্ভীর্যের মধ্যে কোনক্রমে হীনমন্য সংস্কৃতি নিয়ে টিকে থাকা। এ কতদিন সয়? ফলে দেশ-দুনিয়া-প্রশাসন বদলের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বদলে যেতে লাগল এরাও। এইসব কথা না বলা, অজাত-কুজাত, ধর্মহীন, গৃহহীন মানুষগুলো। কেমন নির্বিকার প্রত্যাখ্যান করতে শিখেছে ওরা সভ্যজনজীবনকে। নিজের মত করে ব্যাখ্যা করে ভেঙে চুরে দিচ্ছে আধুনিক রাজনীতির প্যাঁচ-পয়জার। দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের মানুষগুলো যেমন। যেমন তাঁর 'মাদারির মা'। যার কাছে সব প্রলোভন অবান্তর — "এই জাতীয় সড়ক, এই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করা ভারতবর্ষ, ঐ নদী, ঐ ব্যারেজ, ঐ বন্যা।"

'মাদারির মা ভারতবর্ষের প্রায় আশি কোটি মানুষের মধ্যে সেই ছ-সাত কোটির একজন যারা বনের পশুর নিয়মে বাঁচে।' দারিদ্র্যসীমা, পশ্চাদ্‌পদ অংশ নিম্নবর্গ-কল্যাণ সমিতি হ্যানা-ত্যানা শব্দ কিংবা প্রকল্প ওকে বা ওদের আদৌ ছোঁয় না। যেমন ঐ বাঘাড়ু। নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে ও প্রত্যাখ্যান করে সব নদীবন্ধন, ব্যারেজ, নতুন অর্থনীতির মিথ্যে স্বপ্ন, অভিনব উৎপাদনের বাগাড়ম্বর। কারণ বাঘাড়ুদের কোনো অর্থনীতি নেই। উৎপাদন নেই। সভ্য সমাজের হঠাৎ উথ্‌লে ওঠা আবেগ তাড়নায় আশার ছলনে ভোলা নেই। ও সব ভুল বোঝাবুঝির দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু উল্‌গুলান আর উল্‌গুলান। শালগাছে অবিশ্রাম অবিরাম ফুল ফোটার মত এখন শুধু যুদ্ধ — অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া— নিজেদের অরণ্যের অধিকার। তবু অপেক্ষা করে দিগন্তলীন চরাচর। ভেজা জমির সোঁদা গন্ধ বুকে নিয়ে তবু অপেক্ষা করে এ যুদ্ধ অবসনের। আর যুদ্ধশেষে শান্ত অমলিন জ্যোৎস্না মাখা সন্ধ্যায় নায়ক-প্রতিনায়কের তথাকথিত সংজ্ঞালোপের মিলন মহোৎসবে সামিল হবার।

রক্তকরবীর নামকরণ প্রসঙ্গে কিছু কথা

মলয় রক্ষিত
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

'রক্তকরবী' নাটকের নামকরণ কীভাবে হলো, বিষয়টি কৌতূহল-জনক। পাঠক-সমালোচক মহলে এখনও পর্যন্ত নাটকটি সম্পর্কে এরকম ধারণা আছে যে, গোড়াতে এর নাম ছিল 'যক্ষপুরী' বা 'নন্দিনী', পরে এই নাটকটির নাম হয় 'রক্তকরবী'। ড. প্রণয়কুমার কুণ্ডু এ বিষয়ে খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন— 'যাঁরা একটু বেশি আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু, তাঁরা প্রসঙ্গক্রমে জেনেছেন যে গোড়াতে নাটকটির নাম ছিল 'যক্ষপুরী', পরে 'নন্দিনী'। এর বেশি তথ্য আমাদের সামনে কখনো কেউ তুলে ধরতে চেষ্টা করেননি।' (রক্তকরবী ঃ পাণ্ডুলিপি সংবলিত সংস্করণ) বহুদিন পর্যন্ত এই প্রসঙ্গটি অনালোকিত ছিল একথা ঠিক। যতদূর জানতে পারি, এ বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন অধ্যাপক শিবব্রত চট্টোপাধ্যায় তার লেখা 'ইংরেজিতে রক্তকরবী ঃ কিছু তথ্য কিছু অনুমান' প্রবন্ধে। ('প্রমা', চতুর্থ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৬)। রবীন্দ্রনাথ নাটকটি প্রথম রচনা-সময় থেকে শুরু করে প্রকাশের আগে পর্যন্ত অন্ততপক্ষে দশটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এই পাণ্ডুলিপিগুলি অনুসন্ধান করলে দেখা যায় নাটকটির নাম কোনো সময়ের জন্যই 'যক্ষপুরী' ছিল না। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলির প্রথম তিনটি, ষষ্ঠ ও সপ্তম খসড়ার কোনো নামকরণ তিনি করেননি। চতুর্থ ও পঞ্চম খসড়ার নাম ছিল 'নন্দিনী'। অষ্টম খসড়া থেকে নাটকটির চূড়ান্ত এবং স্থায়ী নামকরণ হয় — 'রক্তকরবী'।

তথ্য যদি একথাই বলে, তাহলে নাটকটির নাম যে 'যক্ষপুরী' ছিল, এ ধারণা পাঠক-সমালোচক মহলে বদ্ধমূল হলো কীভাবে? সম্ভবত এমন ধারণার জন্য বেশি দায়ী ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কারণ বিভিন্ন চিঠিপত্রে এবং আলাপ-আলোচনায় তিনি নাটকটিকে প্রথমত 'যক্ষপুরী' বলেই উল্লেখ করেছিলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নাটকটিকে 'যক্ষপুরী'-ই বলেছেন। তাই পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যিক মহলে নাটকটি প্রথম থেকেই 'যক্ষপুরী' নামে পরিচিতি পেয়ে যায়। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার আষাঢ়, ১৩৩৩ সংখ্যায় এবং ১৩৩১, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় পূজনীয় গুরুদেব কর্তৃক 'যক্ষপুরী' নাটক পাঠের কথাই বলা হয়েছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, 'রক্তকরবী' নাটকটির প্রচলিত সংস্করণে গ্রন্থের শেষে নাটকটি নেপথ্যলোক সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলা হয়েছে — "১৩৩০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে শিলং বাসকালে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি 'যক্ষপুরী' নামে প্রথম রচনা করেন। পাণ্ডুলিপি আকারেই পরে ইহার নাম দিয়েছিলেন 'নন্দিনী'।" বলা বাহুল্য, বহুল প্রচলিত এবং বহুল বিক্রিত রক্তকরবীর প্রচলিত সংস্করণ গ্রন্থের এই তথ্যই পাঠক মহলে ভ্রান্তির প্রধান কারণ।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ নাটকটিকে 'যক্ষপুরী' বলে উল্লেখ করলেও এই নামটি তিনি নিজের মনেই রেখেছিলেন। প্রথম খসড়ায় যক্ষপুরীর কথা একটু বেশিই গুরুত্ব পেয়েছিল। যক্ষপুরী নামে পরিচয়ের এটি একটি প্রধান কারণ বলা চলে। অবশ্য আরো পরে রবীন্দ্রনাথ নাটকটিকে কখনও 'যক্ষপুরী' কখনও 'নন্দিনী' বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ কবির মনে নাটকটির নামকরণ নিয়ে কিছুটা দোলাচলতা দেখা যায়। ততদিনে 'নন্দিনী' নামটির প্রতি তিনি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েন। তাই পাণ্ডুলিপি আকারে চতুর্থ ও পঞ্চম খসড়াটির নামকরণ করেন 'নন্দিনী'।

কিন্তু এই দোলাচলতা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পরবর্তী দুটি খসড়ায় (ষষ্ঠ ও সপ্তম খসড়া) তিনি 'নন্দিনী' নামটি শিরোনাম হিসেবে ব্যবহার করেননি। ততক্ষণে 'রক্তকরবী' ফুলটি রবীন্দ্রনাথের মনে আন্দোলিত হতে শুরু করেছে প্রবল ভাবেই। তাই দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ খসড়ায় যেখানে দুবার মাত্র ফুলটির উল্লেখ আছে, সেখানে সপ্তম খসড়ায় তা প্রত্যক্ষভাবে আটবার উল্লিখিত হয়েছে। অবশেষে অষ্টম খসড়ায় ফুলটি কেন্দ্রীয় প্রতীকের মর্যাদা লাভ করেছে। সেখানে প্রত্যক্ষভাবে উনিশবার প্রতীকটির উল্লেখ এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই নাটকটির নাম নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আর চিন্তা করতে হয়নি। 'রক্তকরবী'-ই হয়ে উঠেছে এর স্থায়ী নাম। অষ্টম খসড়া থেকে পরবর্তী সব খসড়াতে, পরে মুদ্রিত আকারে 'প্রবাসী'-র পাঠে এবং গ্রন্থাকারে ওই 'রক্তকরবী' নামটিই দেখা যায়।

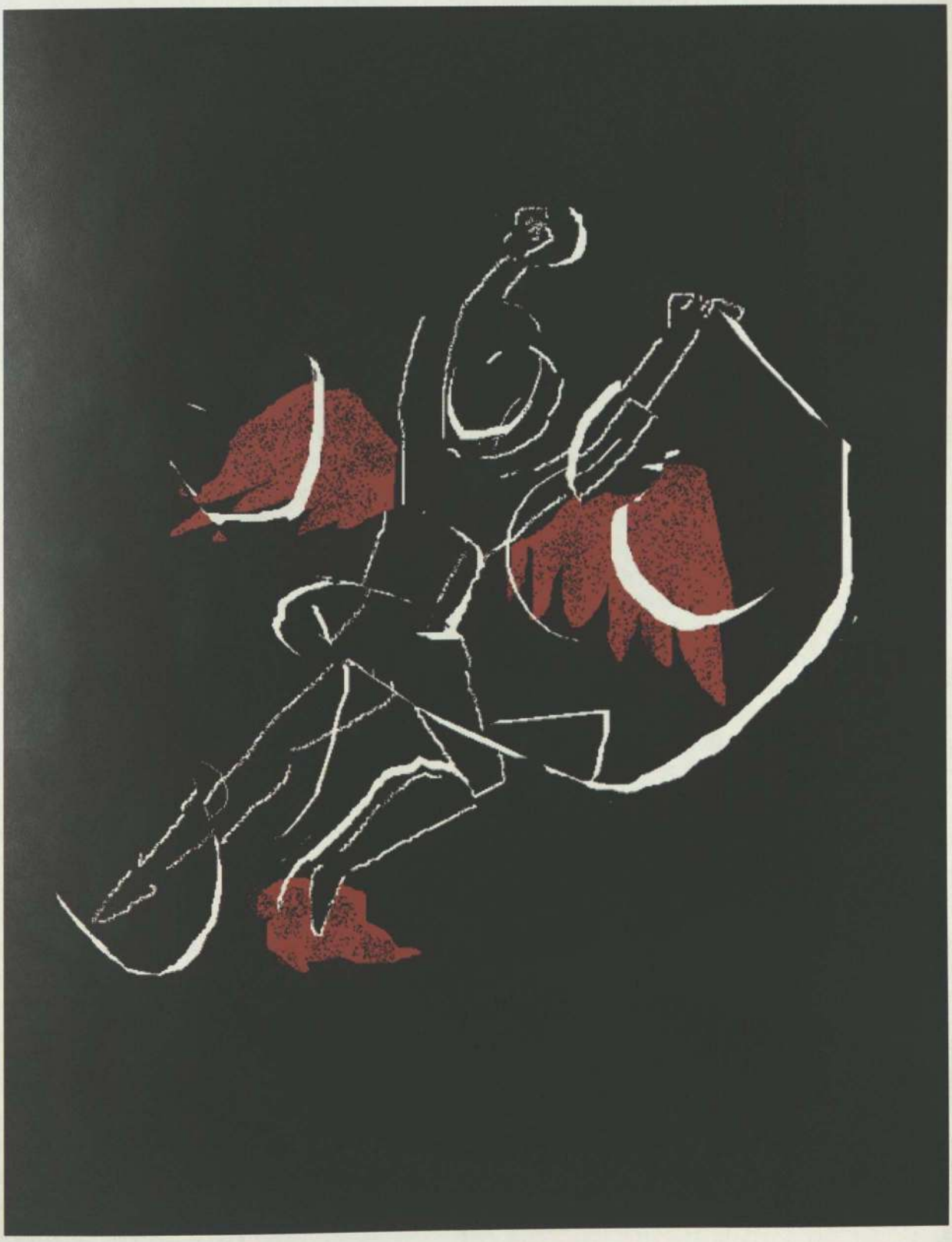

সংহিতা সান্যাল
প্রথম বর্ষ, বাংলা বিভাগ

स्त्री अस्मिता की चुनौतियाँ

डॉ. रंजना शर्मा
प्रवक्ता, हिंदी विभाग

'अस्मिता' का प्रश्न 'अस्तित्व' बोध के प्रश्न से सीधे जुड़ा हुआ होता है। वह चाहे राष्ट्र की अस्मिता हो या समाज विशेष की अस्मिता, भाषाई अस्तिमता हो या स्त्री की अस्मिता। वास्तव में यह पदबंध एक विराट परिदृश्य को अपने अंदर समेटे हुए है, जिसके अन्तर्गत समाज, संस्कृति, भावबोध, संवेदना, स्थापित एवं विघटित मूल्यवोध सब अन्तर्निहित रहता है अर्थात् अस्मिता का सवाल 'येन-केन-प्रकारेन' अस्तित्व को बचाये या बनाए रखना नहीं है, वरन जीवन, जगत के समस्त सरोकारों के संबंध में अपनी निजी अनुभूति एवं अवधारणा के साथ अस्तित्व को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है और जब यह पदबंध 'स्त्री' शब्द के साथ जुड़ जाता है तो अनायास ही इसकी परिसीमा में पूरी जनसंख्या में आधी हिस्सेदारी करनेवालों की अनादिकाल से लेकर अब तक के स्थापित एवं विखंडित जीवनधारा सम्पूर्ण वैषम्य और विसंगति के साथ उपस्थित हो उठता है। पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन की मूल धूरी होने के बावजुद स्त्री को अस्मिता के प्रश्न पर निरन्तर चुप्पी या दोयम दर्जे का मानकर उसे पूरे परिदृश्य में अस्वीकार करने की प्रवृति के कारण स्त्रियाँ न केवल पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में अवहेलित की जाती हैं वरन रचनात्मक क्षेत्र में भी उन्हे ''स्त्री-लेखन'' या 'स्त्री-साहित्य' जैसे बद्ध दायरे में डालने की हेय प्रवृत्ति दिखाई देती है।

लेखन-जगत मे स्त्रियों की साझेदारी को न्यूनतम करके आँका जाना भी पुरुषवादी मानसिकता का ही परिणाम है। 'स्त्री-साहित्य' को कम करके आँकें जाने के कारण 'स्त्री-साहित्य' का साहित्येतिहास में क्या योगदान रहा है, इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इतिहासकारों एवं आलोचकों की उपेक्षित दृष्टि के परिणामस्वरूप साहित्येतिहास में स्त्री रचना संबंधी खंडित या अपूर्ण भूमिका ही प्रकाश में आ पायी है। पुरुषसतात्मक नजरिये के कारण 'स्त्री-साहित्य' की न तो किसी परिपाटी की जानकारी मिलती है, और न ही निश्चित धारावाहिक रूप में 'स्त्री-लेखन' परंपरा ही उपलब्ध पाता है। ''इसी तरह सामाजिक इतिहास हो या साहित्य का इतिहास हो पुंसवादी नजरिये का वहाँ पर भी वर्चस्व है। इतिहास का अर्थ है पुरुषो का इतिहास। इतिहास में पुरुषों की भूमिका का महिमा मंडन ही इतिहासकारों का प्रधान लक्ष्य रहा है। इतिहास के निर्माण मे स्त्री की भूमिका को महत्व नहीं दिया गया। साहित्य के इतिहासकारों ने भी जो इतिहास-ग्रंथ लिखे हैं वे पुरूष रचित साहित्य के मूल्यांकन से भरे पड़े हैं, इक्का-दुक्का स्त्री लेखिकाओं का ही उनमें जिक्र मिलता है। पुरुषों का साहित्य ही साहित्य कहलाया। साहित्य की मुख्य धारा में स्त्री साहित्य की अनुपस्थिति या इक्का-दुक्का लेखिकाओं की उपस्थिति वस्तुत: पितृसत्राक नजरिये के विचार धारात्मक बर्चस्व की द्योतक है।''

'पुरुष-साहित्य' और 'स्त्री-साहित्य' के रूप में साहित्य का द्वि-केन्द्रिक विभाजन वास्तव में लिंगाधारित है। लिंगजनित श्रेष्ठता के आधार पर ही राजनीति, धर्म, कानून, संस्था, संगठन, पारिवारिक क्षेत्र के भी विश्लेषित किए जाने के परिपाटी का प्राधान्य है। स्पष्टत: इसकी जड़े प्राचीन साहित्य एवं समाज व्यवस्था से आरंभ होकर आधुनिक साहित्य एवं समाज में फैली हुई है। समाज में प्रचलित वैषम्यमूलक दृष्टि सवं लिंगभेदीय असमानताओं को साहित्य में उद्घाटित होने के सारे अवसर उपलब्ध होते हैं, परन्तु साहित्य पर पुरुषों के एकछत्र आधिपत्य सवं लिंगभेदीय दृष्टिकोण के कारण साहित्य के मुख्य धारा में स्त्री की अस्मिता, आकांक्षाओं, इच्छाओं, जरुरतों-अनुभवों एवं मन:स्थिति की उपेक्षा की जाती है एवं मुख्यधारा से स्त्री-साहित्य निष्काशित ही रही है।

यहां तक की स्त्रीवादी लेखन की ओर प्रवृत हुए पुरुष लेखकों की तुलना में भी स्त्री लेखन को कमतर माना जाना है, जबकि स्त्री के रचाव में द्वन्द्व के कई स्तर होते हैं। पुरुष लेखक की तरह उनमें दर्शकीय बोध के बजाय द्वन्द्व के अनेक स्तरों के गुंफन का अनुभव एवं अनुभूतियाँ होती हैं। लेखन मे जुड़ी स्त्रियों को न तो परिवार से भरपूर सहयोग मिल पाता है और न ही वे सारी सुविधायें ही मुहैया हो पाती है जिसके हकदार पुरुष माने जाने हैं। इक्का-दुक्का स्त्री-लेखिकाओं की छोड़ दिया जाय तो यह साफ हो जायगा कि कितनी स्त्री लेखिकायें हैं जिन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति की छूट मिलती है या वे हासिल कर पाती हैं। मध्ययुगीन सामंती सोच की जड़ें और अधिक घिनौनी तथा भयावह होने के कारण न तो स्त्रियों के जनतांत्रिक सोच की मर्यादा है और न ही वकहता और लेखन में वह आधिपत्य ही हासिल है। जहाँ कहीं भी स्त्री अपने लेखन एवं वक्तृता में पुरुष निर्धारित हदें तोड़ती हैं उन्हें नाना भांति प्रताड़ित होना पड़ता है। संभवत: इन्हीं कारणों से हिंदी साहित्येनिहास ग्रंथों में एक सिरे से स्त्री लेखिकाओं की अनुपस्थिति पुरुषों के एकछत्र आधिपत्य को 'जयकाव्य' जैसा सम्मोहक वातावरण प्रदान करती आई हैं। 'स्त्री साहित्य' के प्रति अस्वीकार के भाव को रेखांकित करते हुए डॉ जगदीश्वर चतुर्वेदी कहते है - ''स्त्री-साहित्य के इतिहास का कार्य' साहितयेतिहास लेखन से भी ज्यादा जटिल एवं मुश्किलों से भरा है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है स्त्री-साहित्य की परंपरा का अभाव और साहित्य की चारों ओर छितराये रूप में मौजूदगी। अत: पहली जरुरत है स्त्री लेखिकाओं की श्चनाओं को खोजा जाना चाहिए। इसके बाद सही कालक्रम एवं संदर्भ में उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। दूसरी समस्या है स्त्री साहित्य की निरंतरता को स्थापित करने की। पुरुष वर्चसव एवं पितृसन्ताक विधान के कारण अधिकांश लेखिकाओं की रचनाएँ इधर-उधर फैली हुई हैं या नष्ट हो गई या नष्ट कर दी गई। इसके कारण स्त्री-साहित्य की पंरपरा में निरंतरता का क्रम ठीक करने में कठिनाइयाँ आती है।''

स्वाधीनता के पूर्ण तथा बाद के दशकों में उपलब्ध होने वाली हिंदी रचनाओं पर गौर करें तो स्त्री लेखिकाओं की अनुपस्थिति का एहसास सहज ही हो जाता है। चौथे-पाँचवे दशक में भी स्त्री-साहित्य की अनिवार्य अनुपस्थिति सहज ही खटकता है। यद्यपि जिन लेखिकाओं की रचनाएँ प्रकाश में आयी उस पर 'विचारों की आवृत्तिमूलकता' अथवा 'एकरसता' का आरोपण करके उन्हें हाशिये पर डाल दिया गया। सैकड़ों वर्षो से पितृसात्तात्मक विचारधारा के कारण ही हिंदी साहित्येतिहास में स्त्री लेखन गायब दिखाई देता है। साहित्य से स्त्री के निर्वासन पर विचार करते हुए डाँ जगदीश्वर चतुर्वेदी कहते है- ''इक्का-दुक्का नामों का जिक्र करके इतिहासकारों एवं आलोचकों ने अपने कर्म की इतिश्री समझ ली। इसकी तुलना में पुरुष लेखकों की रचनाएँ, उनका मुल्यांकन बड़े पैमाने पर किया है। मूल्यांकन एवं इतिहास-लेखन में इस तरह का भेदभाव इतिहासकारों के नजरिये में पुसंबादी विचारधारा के वर्चस्व को ही अभिव्यक्त करता है।

लम्बे संघर्ष के बाद स्त्रियों ने अनके प्रतिबंधो को तोड़ा है तथापि पितृसत्तात्मक मूल्यों का सामाजिक वर्चस्व पूरी तरह टूटा नहीं हैं। लिंगाधारित समाज व्यवस्था एवं पुरुषों की श्रेष्ठताबोध के कारण स्त्रियों में हीनत्व बोध का जन्म होता है। तथापि लिंग वैषम्यमूलक विभाजन प्राकृतिक कम सामाजिक अधिक है। स्त्री को 'व्यक्ति' न मानकर केवल 'स्त्री-लिंग' या 'स्त्री-देह' मानना भी इसी दृष्टिकोण का एक अन्यतम निकृष्ट पहलू है।

मानव सभ्यता के इतिहास की निर्मिति में अर्थ का विभाजन और स्त्री-पुरुष के संबंध की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मानव- सभ्यता के इतिहास में व्यक्तिगत संपत्ति की भावना के साथ ही पुरुष की अधिकार भावना का विस्तार हुआ। व्यक्तिगत संपत्ति के विस्तार के कारण समाज में अर्थ के विभाजन की विषमता जन्मी और दूसरी तरफ पुरुष के अधिकार भावना के प्रसार से स्त्री की पराधीनता बढ़ी। चाहे वह सामंती समाज व्यवस्था हो या पूंजीवादी सभ्यता का इतिहास दोनों परिस्थितियों में पुरुषों का अधिकार भावना तथा स्त्रियों की पराधीनता को ही बढ़ावा मिला है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर मानव सभ्यता के विकास का इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है तो पुरुष की अधिकार भावना से स्त्री की स्वतंत्रता की आकांक्षा से किया गया संघर्ष का भी इतिहास है। अर्थात् निजी संपत्ति की अवधारणा ने एतिहासिक विकासक्रम में सामाजिक स्तर पर स्त्री को निरंतर हीनतर स्थिति में पहुँचाया है। सच्चाई यह है कि पितृसत्तात्मक ताकत के बल पर पुरुष ने स्त्री के प्रत्येक अधिकार को छीन लेने की सारी सुव्यवस्थायें की है।

संविधान में स्त्रियों के पर में कानून एवं अधिकार को लेकर कितने ही पन्ने खर्च किए गए हैं पर वास्तविकता यह है कि स्त्री के स्थिति में सुधार के लिए ये अमूर्त अधिकार और कानूनी हक काफी नहीं है क्योंकि बड़ी मात्रा में अधिकार निर्भर करते हैं स्त्री की आर्थिक भूमिका पर, अमूर्त स्वाधीनता एवं वास्तविक सत्ता के विभेद के कारण स्त्रियां घर के भीतर तथा बाहर शोषण का शिकार होती हैं। निम्नवर्ग की स्त्रियों को उसकी उत्पादकता एवं पुनरुत्पादकता की भूमिका के कारण स्वतंत्रता मिली है, तब भी वह आर्थिक शोषण का शिकार होती है। संवैधानिक अधिकार और सामाजिक रीतियों के विशेष के परिणाम स्वरुप स्त्री की स्थिति में अजब प्रकार का विशेध दिखाई देता है। इस विषम प्रकार के विरोधाभाष के कारण स्त्री का परिवारिक व्यक्तित्व ही नही बल्कि साहित्यिक व्यक्तित्व भी खंडित दिखाई देता है। पुरुषवादी मानसिकता के कारण स्त्री साहित्य के मूल्यांकन में रूढ़ एवं पारम्परिक अवधारणाओं का ही बोलवाला है जबकि स्त्री-साहित्य के मूल्यांकन के लिए नयी अवधारणायें, नये सौन्दर्यशास्त्र, नये सिद्धांत गढ़े जाने चाहिए। स्त्री साहित्य को पारंपरिक साँचे में ढालकर निष्कर्ष निकालने के बजाय स्त्री के रुझान, स्त्री के संसार, स्त्री के मूल्यवोध एवं तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्त्री साहित्य के अन्तर्गत लिखा जाने वाला साहित्य स्त्री द्वारा रचित साहित्य है, जो स्त्री के मन सभ्यता, संस्कृति, संवेदनात्मक जरुरतों के अनुरुप लिखा गया है। उनके रचना संसार की मूल धूरी उनकी अपनी अनुभूति जगत के सौन्दर्यशास्त्र में निहित है। उदाहरण स्वरूप मध्ययुगीन कवयित्रियाँ निजी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए कृष्ण प्रेम तथा आराधना को माध्यम बनाती हैं। यहां उनकी अनुमुतियों के संसार को अभिव्यक्तिकरण का दूसरा मार्ग उपलब्ध नहीं था क्योंकि यहां भी अने-क प्रकार के विचारधारात्मक निषेघ मौजूद थे। इतना ही नहीं जब कोई स्त्री अपने निजी अनुभव को व्यापक सार्वभौम जगत से जोड़ने का प्रयास करती है तो उसे विरोध एवं गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थिति यह कि सामंती विचारधारा से प्रभावित इस रवैये को सैद्धांतिक कलेवर प्रदान करके पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मजबूत किया जाता है। वास्तव में पुरुषों को जिस प्रकार से स्वच्छन्दता मिली थी, उनके अपने विचारों को प्रकट करने की जो सुविधाएं प्राप्त थी, यदि स्त्रीयों को भी उसी प्रकार के सुयोग प्राप्त होते तो पुरुष के साथ स्त्री-कवियों का भी विकास हो जाता।

साहित्य का व्यापक संदर्भ जीवन के पुनःसृजन में अन्तर्भुक्त है और जीवन के पुनः सृजन का कार्य लिंगजनित विषभता एवं विभेद को भेटकर ही संभव है। लिंगाधारित साहित्य के मुल्यांकन में पूर्व की अवधारणाओं से युक्त शास्त्रीय सिद्धांत की कसौटी का परिमार्जन किया जाना आवश्यक है अन्यथा स्त्रियों के द्वारा रचित साहित्य दोयम दर्जे से निकल नहीं पायेगी। उत्तर आधुनिक समय में स्त्री साहित्य को स्त्री की निजता से जोड़कर देखने के दृष्टिभंगी का विकास हुआ है परन्तु यह प्रकाश आटे में नमक के बराबर है। स्त्री द्वारा अपने हकों की मांग करना, अपने लिए सार्नजनिक जीवन में स्थान बनाना एक नवीन परिदृश्य की सृष्टि है। स्पष्ट अभिव्यक्ति, स्वतंत्र पहचान, सामाजिक-राजनीतिक सरोकारों से जुड़कर लिखने की बेहतर कोशिश, लज्जा के त्यागकर सहज शैली में व्यवहार ने स्त्री साहित्य को बेहतर मोड़ दिया है, परन्तु स्त्री स्वाधीनता, स्त्री सचेतनता सिर्फ राजनीतिक उल्लु सीधा करने का एजेडा बने इससे पहले स्त्रियों का लामबंद होना जरुरी है। महात्मा गांधी भी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की पूर्णता तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि उसमें स्त्रियों की भागीदारी नहीं होती है। 'पूर्ण-स्वाधीनता' की अवधारण तभी फलीभुत होगी जब स्वाधीनता का स्वाद केवल आधी आवादी नहीं बल्कि पूरी आवादी चखेगी और यह तभी हो पायेगा जब 'लिंग' तथा 'लिंगभेद' का सामाजिक समीकरण का बिम्ब टूटेगा तभी 'स्त्री-साहित्य' एवं 'समाज निर्मित स्त्री' के प्रति दर्शकीय सहानुभूति का छद्म भी टूटेगा।

শান্তি জল

সব্যসাচী দেব
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যখন নদীতে নামে গাঢ় অন্ধকার
হো হো করে বলে ওঠো 'এই সূর্যোদয়'
এইখানে পড়ে থাকে ছেঁড়া স্বরলিপি
বোবা মুখ, শ্রবণও বধির হয়ে আছে
এখন মদের স্রোতে পুরনো নিশান
ভেসে যায়, গেয়ে ওঠে শ্মশানকীর্তন
জড়ানো গলায় কেউ 'সুখে থাকো সব',
নিঃশব্দ থাবার নীচে ছেঁড়া পালকেরা
শেষরাতে কুয়াশায় উৎসব ফুরোলে
শেয়ালের ডাক ফেরে খোলা মাঠে মাঠে
তখন মাতাল কেউ শবদেহ ছুঁয়ে
হেসে ওঠে, তখন তুমিও স্মিত মুখে
শান্তি জল ছুঁড়ে দিলে আমার কপালে

জানতে তুমি কমন্ডলু বিষে ভরা ছিল ....

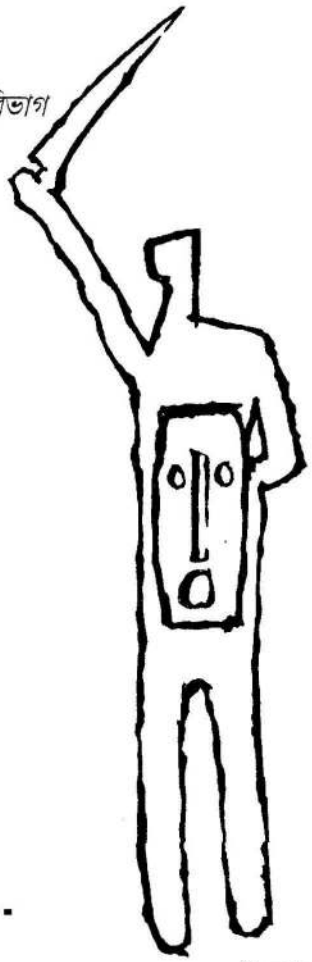

তোমাকেই.....

সংহিতা সেন
অধ্যাপিকা, ইংরাজী বিভাগ

(১)

এখন লড়াই, এখন আমরা তৈরী
মুখোশ সাজিয়ে
বন্ধু শানায় ছুরি।
পিঠের পিছনে রক্তজমানো ক্ষত
বন্ধুও আজ যুক্তি সাজাতে রত—
আমরাই নাকি কথা রাখি নি
চুক্তিপত্র মত।

(২)

কথা রাখবে ভেবেই পথে নামা।
পথের বাঁকেই মুখ ফিরিয়ে বোকা—
চৌমাথাতে পেলাম আমায় একা।
হাতের গোলাপ রঙ হারিয়েও ঋদ্ধ।
পিঠের গভীরে আমূল ছুরিটা বিদ্ধ—
কাঁটাই লিখুক আমার খণ্ডকাব্য।

দুটি কবিতা

ঋত্বিক মল্লিক
প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ

দুই ছবি

কেউ কখনো এসে বলল না — পেয়েছি
বরং দেওয়া আর হারানো নিয়ে চারদিকে এত কোলাহল
যেন পাহাড়ি নদীর শব্দ

এক জীবনে কী পেলাম আর অন্য জীবনে কী পাব—
এই দুই ছবির মধ্যে থেকে যায় একখানি ট্রেসিং পেপার...

কাব্যগ্রন্থ

শব্দ পংক্তি চরণ বিরামচিহ্ন বা উদ্ধৃতি
আমার দুপুরের অংশ, ছেঁটে দেওয়া রাত্রির মতো সংক্ষিপ্ত;

একটি স্তবক আমার দিনও নয় ....

যে শূন্যস্থান থাকে দুটি শব্দের মাঝে আর
নতুন স্তবকের আগে — রক্তহীন, সাদা—
ঐখানে জীবনের সারাৎসার, ঐখানে সমাধিস্থল, পরাজয় সমূহ

পৃথিবীর সমস্ত পাণ্ডুলিপির ভিতর আমি এইভাবে আছি।

প্রান্তিক

তোর্সা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

১

মুগ্ধতার ঋতু পেরিয়ে গিয়েছে আজ
এখন শুধু ঝিঁঝির ডাকের ভেতর
একটানা চুপ করে থাকা,
দু-একটা শূন্য তাকানো

২

সন্ধ্যার পাখিরা আঘাত চিহ্ন মেলে
উড়ে যায় — লাল পথ,
আগুনের পথ — তোমার নিকষ বিস্মৃতি
গাছের কোটর থেকে
রক্ত হয়ে উঠে আসে
আমার কুঠার ভিজে যায় ....

৩

উঁচু নিচু খোয়াইয়ের মতো
জলের বিছানা
দুখানা মানুষ শুয়ে থাকে—
সীমান্তের পথ দিয়ে ট্রেন চলে যায়....

একটি কবিতা

সুদীপ্ত চৌধুরী
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

বিবর্ণ লেফাফার গায়ে
স্পষ্ট গভীর অক্ষর, জামায় ডাকনামই।
হাড়ের কঙ্কাল তবু, নখের আঁচড়ের মত
নীরব তরঙ্গে কাঁপা বিদ্যুতের মোহনায়
ঢেকে রাখা ছিল নদীর দুকূল।

গতরাতে, এমনই তীব্র বেগে হাওয়া
বারবার উড়তে চেয়েছিল,
কালো যবনিকার দু'পাশের অজানাকে,
এক ফুঁয়ে নেভাতে চেয়েছিল খুব।
আমার সমস্ত অসুখ,
এই দেহ ছেড়ে, চেতনা ছেড়ে
অন্তত কিছুক্ষণ আমায়, নিঃসঙ্গতার
অধিকার দিয়েছিল।

বড় ভালো হত — এক টুকরো রঙ পেন্সিল পেলে,
ছবির মত — যে সময় পেলাম
তাদের চুবিয়ে নিতে পারলে
বুকের ভাষায়।।

ক্ষনজন্মা

নবমিতা সান্যাল
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

এদিকে তাকাৎ 'হৃদি' তোমার সুখের পাশে রোজ
জন্মহরা কিছু কথা কিছুটা ভাষায় নির্বোধ
চোখজোড়া অভিনয়, দুপুরে বিষণ্ণ ঘুম আর
ঢেকে দেয় ধূলোবালি, নিজেকে উড়ন্ত প্রতিশোধ।

আগমনী এসে গেলে পিছনে তাকানো দায়কের?
আগমনী সুরজোড়া শিকড় ছড়ানো কিছুক্ষণ
তবুতো অবশ চোখ নিরুপায় মুখেদের ভিড়ে
'হারিয়ে যাবো না' বলে জড়িয়ে ধরেছে আজীবন।

সেসব গোপন দ্বন্দ্ব পথপাশে চুপ হয়ে থাকে
দুচোখে লুকানো জল কুয়াশায় হিম হয়ে যায়
চোরাবালি অনুভব চোরটান হয়ে আছে বেশ
তোমাকে 'জীবন' বলে ভূষিত করেছি অভিধায়

গল্পগাথা জমে উঠে জেগেছে দ্বীপের আড্ডারা
পাড়েতে ভিড়িয়ে তরী মাঝিদের ফিরে যাওয়া বাকি
মায়েদের কোল থেকে উঠে গেলে নীড়হারা ঘুমে
'হৃদি'কে শুইয়ে পাশে সারারাত পুড়ে যেতে থাকি।

হায়

রাতুল ঘোষ
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

১

সমস্ত সংহত শোক প্রণামের গূঢ় অন্ধকারে
মিশে গেলে জন্ম হবে। জন্ম হবে এক।
সংখ্যার অসীম থেকে যেরকম নশ্বরতা
মুঠো মুঠো আসে
মানুষের সামান্য ঝুলিতে, ভালোবাসা
সেসব হিসাব বুঝতে পারঙ্গম হলো না এখনও।

পারঙ্গম হলো না আমার শব
এখনও কবোর থেকে সটান মিছিলে এসে সামনে দাঁড়াতে।

২

এরই নাম ক্ষমা?
এরই নাম নিহত ও ঘাতকের মধ্যবর্তী চুপ্?

কিরকম কুটিল তোমার
চোখ, তার ধোঁয়া ওঠা জল
রক্তকে তরল করে।

এরই নাম বিলাস রেখেছো?

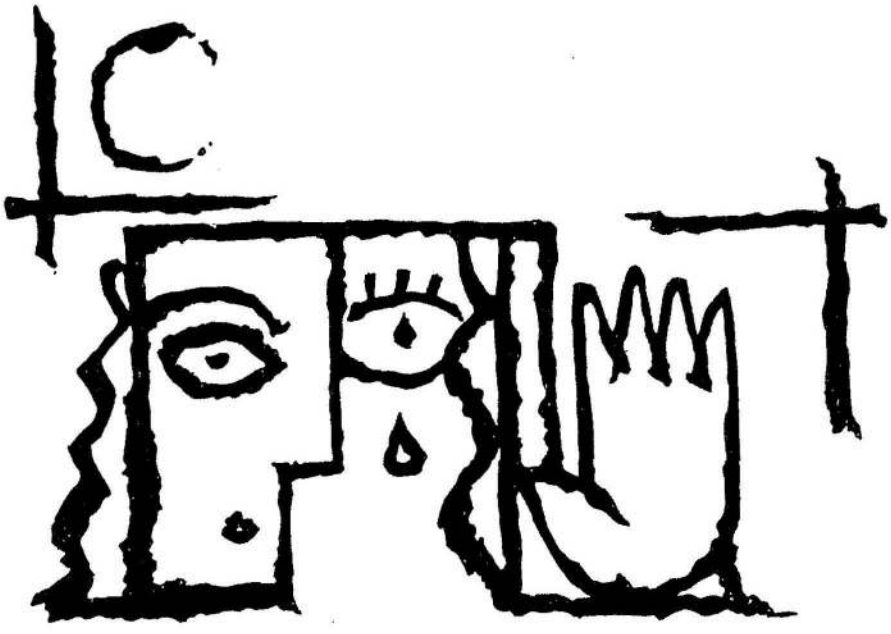

অস্তিত্ব

অনিতেশ চক্রবর্তী
দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

১

চোখের চারপাশে পায়চারি করে
নিস্পলক গোলাপী চেনা নাম
চৈত্রের মধুমাস, চারিদিক স্তব্ধ
স্তব্ধ রাত তীক্ষ্ণ স্মৃতির মতো।
বেওয়ারিশ হাওয়া
সহস্র অশ্বারোহীর মতো ছুটে চলে
কর্কট যন্ত্রণায় সমুদ্র গভীরে।

কোন এক শরতে
কাশফুলের গায়ে নেমেছিল সন্ধ্যা
তার কালো চুল বেয়ে,
তারপর, বিবর্ণ আকাশের বনে
হঠাৎ, জ্বলে উঠল চাঁদ।

আকাশ ক্ষেত্রফলে কিংবা নক্ষত্র ভিড়ে,
ভেজা ঘাস, চেনা ফুল,
ভালবাসা
অন্ধকারের মতো ভারি মুমূর্ষু হৃদয়ে।

কার জন্য এ সূর্য করে রক্তপাত!

২

তোমার শরীর ছেনে দিগন্ত আগুন পেড়ে আনি
শ্মশানে সাজাই ঘুম,— ভেজাচুলে রঙ ওড়ে, খই
হাওয়ায়, নতুন চাঁদে, অজান্তে পসার জমে ওঠে,
কিশোরী স্তনের বুকে ভারিঠোঁট, — ঋতুবাস, ঢেউ....

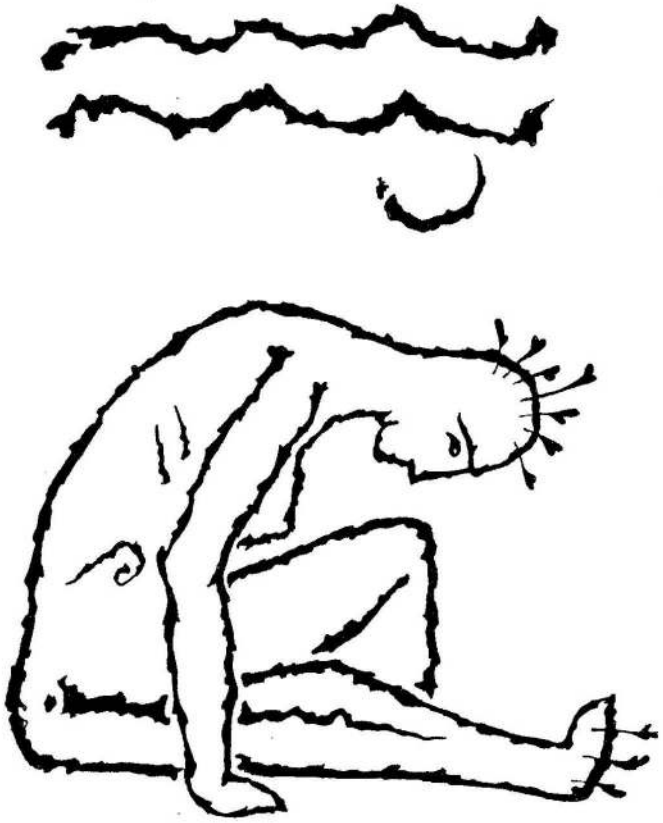

স্মৃতি, বিপন্নতা ইত্যাদি

সৌমিক ঘোষ
দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

ও আমার সান্ধ্যিক শ্মশান
তোর জন্য শেষ কান্না রাখলাম।

তোমরা তো দোষ দেবে জানি।
তোমরা যে সুরক্ষাবাহিনী

পৃথিবীর যাত্রিকের দল
দিনশেষে ফিরে এসে দেখে
পলে পলে ফুরায় সঞ্চয়
পলে পলে জীবিকা হারায়
হে আমার জমাট নীল রক্ত
ঝরে পড়ো, এবার মুখ লুকোই

বাদীর কথা

স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী
বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

চূড়ান্তে মিশেছে গিয়ে সভ্যতার সানু
নিপাট ত্রাসের দেশ, প্রেম নতজানু
যেখানে মিশেছে গিয়ে সভ্যতার সানু

জবুথবু থেমে আছে দিন আর ঋণ
সময় আচ্ছন্ন করে কুয়াশা কফিন
যেইখানে থেমে আছে দিন আর ঋণ

"কক্ষ আর লক্ষ্যচ্যুত" ঃ রাজার বয়ানে
বনান্তে শরীর শুয়ে নিবিড় শয়ানে
ছত্রে ছত্রে দার্শনিক রাজার বয়ানে

তবুও কোথাও দুধ বাটির কিনারে
ঘরময় বে-খেয়াল কটুগন্ধ ছাড়ে
হয়তো ফুটন্ত দুধ বাটির কিনারে—

পরিব্যক্তি

শ্রুতি গোস্বামী
বাংলা বিভাগ, প্রথম বর্ষ

প্রোটিন খাদ্যে ভরপুর হ'য়ে সোনালি বিয়ার,
ফ্ল্যাশব্যাকে শিশিবোতলওয়ালা, ঘাসফড়িং,
আর ক্লাসনোট।

মনে রাখো,
পাবলিসিটির জন্য — নস্টালজিয়া এক্সক্লুসিভ।

ভাবো, সামনের লনে টেনিস কোর্ট,
অর্থাৎ এক্সট্রা অ্যাকটিভিটিস্,
সদরে নিরাপত্তা।
আর আরেকটু এগোলেই—
ফুটপাথ।
লক্ষণীয় — চারদিকে হাওয়া টাঙানো।
তার সাথে ফ্যানগালা লজ্জাবতী ও উদোম শিশু।
ভারি স্বচ্ছ নীড়!

কিন্তু, হায় রে পূর্বজন্ম!!

তোমার মেনিনজেসে বাজবেই,
শ্রাবণের ধারায় ভেজা চার আনার প্রতিধ্বনি!

তোমারও মিউটেশন হবে!!

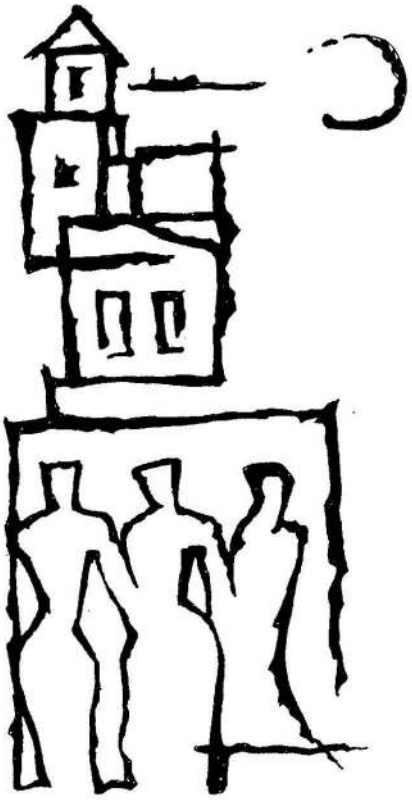

মুঠো ভর্তি আমি

ছন্দক চ্যাটার্জী
দর্শন বিভাগ, প্রথম বর্ষ

জানিস! বহু দশক আমি ছাদে যাই না
দুহাতে খোলা আকাশ,
অন্ধকার মেঘ, কিছুই না।
এমনকি পাশের বাড়ীর নীলচে সবুজ
নারকেল পাতাও না,
বারান্দা দিয়ে ময়ূরপঙ্খী
এক হাত বেড়ে
বো-কাট্টা বলি
রাতের তারারাও ধরা পড়ে
এক ফালি রক্তাক্ত আলপথে
ধুলোমাখা কালো পতাকায়
তুই-ই বল!
বারান্দা কি কোন দিন ছাদ হয়?
লাফাই, কাঁদি, অবশেষে
শ্লোগানে শ্লোগানে
সিঁড়িতে সিঁড়িতে
লাল পতাকা সারি পেরিয়ে
অপু-দুগ্গা কু-ঝিক
তবু আমার ছাদে ওঠা হয় না।

Translation of Two Famous Poems of **Benoy Majumdar,**

Samir Kumar Mukhopadhyay
Professor, English Department

A Bright Fish

A bright fish, after having a flight
In apparently deep blue, but in reality transparent, waters
Did again plunge. Beholding such a graceful sight,
The fruit matured and reddened in dense-juiced agony.

The helpless duck flies, flies on and ever,
Since everyone knows just beneath its white feather
There's tucked in fiercely warm flesh and fat.
Short lived, it takes rest on weary hill tops,
All watery songs get into vapors, and yet
At such time you, O Sea-born Fish! You ... You ...
Or, see here and there the ailing trees,
The leafy expanse of the forest floors of the earth,
Get agitated by long, long-drawn weary breath;
Yet all trees and bowers stand in their respective field.
And think of eternally their breath-taking story of love.

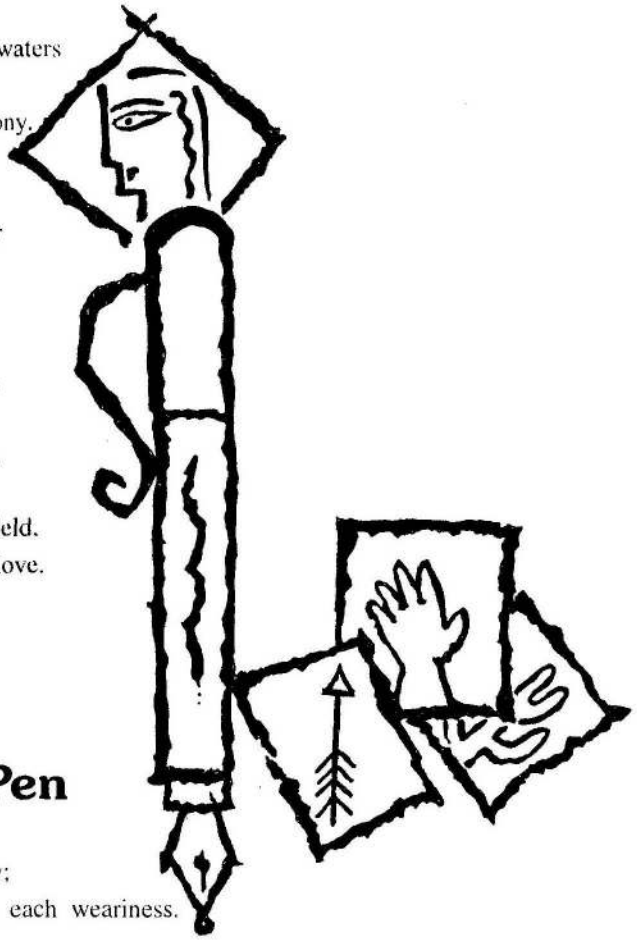

With Paper and Pen

It's necessary to sit quiet with paper and pen today;
What opaque self-thought comes with every failure, each weariness.
Always I believe, almost all arrangements made,
And yet unfailing relationship never comes about.
Even after going to all flowers with so much of illusion in mind
Man loves most the smell of flesh when cooked.
The colourful letters look meaningless, look utterly crude,
And yet the portraits bloom attractive owing to certain distance.
O Picture of Life! Dissipation has always been there in the world.
These infinite drops of rain, born and bodied in clouds,
How much of them come to the flesh of harvest?
Even in season of harvest the earth absorbs most of waters.
And yet what a wonder! See when the seated mosquito flies
Its fight becomes pretty musical.

Lights Off

KAUSIK BAISYA

Screechy night rips off emblamed darkness.
The stallion sighs loudly, it is no more a mare
The colours mingle as do the shadows compress
Prison bars are stripped bare.

Everybody is sleeping —— no more. Its letters
have drowned is the vicious numb.

The Wheels have rolled by passing ages
Trapped in the netted cyber world—
Here hyperreality connects changing faces
Perplexed is the fettered Oxford word.

Fused, confused, sticky, with foul smell
emerging from the diabetic wound.
And now nothing to be done or said.

Just Silence
Checkmate.

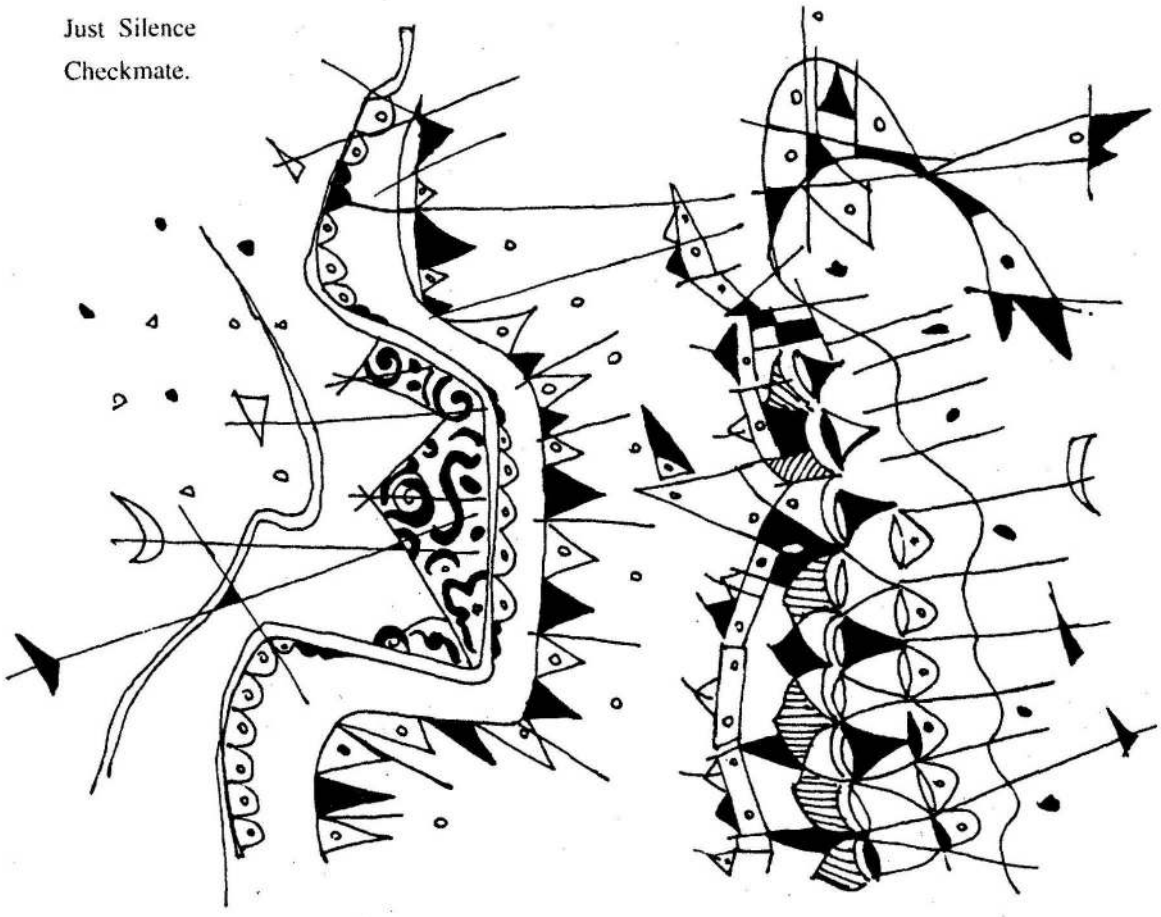

बुढ़ी आँखें

संध्या सिंह
प्रवक्ता, हिंदी विभाग

मैं माँ हूँ
पर अब बूढ़ी हो चुकी हूँ।
ढ़हता हुआ यह मिट्‌टी का घर
मेरा एकमात्र साथी है
जो मेरी ही तरह अकेला है।

रद्दी हो चुके सामान की तरह
अब मैं भी बेकार हूँ।
पर इन बुढ़ी आँखों में
अब भी बूझती हुई आशा की लौ है
रास्ता देखती हैं ये झुर्रीदार आँखें
उनका जो बरसों पहले
अपनी जमीन से उखड़कर
शहरों की चेहराहीन भीड़ में खो गए थे।
जड़ से कटकर
पाना था उन्हें बहुत कुछ
पर
कंक्रीट के जंगल के भयावह शोर में
जिनकी आवाज गुम गई थी।
आने का वादा करके
जो अब तक नहीं लौटे थे
उनकी राह देखती
माँ की आँखें अब भी
शून्य में टंगी रहती हैं।

वाह रे बेरोजगारी !

बबीता प्रजापति
स्नातक, द्वितीय वर्ष, हिंदी विभाग

नदी में डूबते हुए आदमी ने
पुल पर चलते हुए आदमी को
आवाज लगाई - 'बचाओ - बचाओ'।
पुल पर चलते आदमी ने नीचे,
रस्सी फेंकी और कहा - आओ।
नदी में डूबता हुआ आदमी
रस्सी नहीं पकड़ पा रहा था।
रह-रह कर चिल्ला रहा था-
मैं मरना नहीं चाहता,
जिंदगी बड़ी महंगी है।
कल ही तो सरकारी कम्पनी में
मेरी नौकरी लगी है।
इतना सुनते ही पुल पर चलते
आदमी ने अपनी रस्सी खींच ली।
उसे मरता देख, अपनी आँखें मींच ली।
फिर दौड़ता-दौड़ता उसी कम्पनी में आया
हाँफते-हाँफते उसने अधिकारी को बताया-
देखिए, अभी-अभी आपका
एक आदमी डूबकर मर गया है।
और इस तरह आपकी कम्पनी में
एक जगह खाली कर गया है।
यह लो मेरी डिग्रियाँ सम्भालो
मैं बेरोजगार हूँ, मुझे लगा लो।
अधिकारी बोला- दोस्त तुमने देर कर दी,
अब से कुछ देर पहले हमने यह जगह भर दी।
और इस जगह पर हमने उस आदमी को लगाया
जो उसे धक्का देकर तुमसे पहले यहाँ आया।

पहचान

निधि सिंह
स्नातक, प्रथम वर्ष, हिंदी विभाग

अपने सपनों को आँखों में सजाए
हसरतो की एक उड़ान भरी है,
अब ये न सोचते हैं कि
जमी से दूरी कितनी बढ़ी है।
इक हवा के तेज झोंके में खुद को बहाकर
अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है
खुद को भूलाकर फिर मुझे
मेरी 'पहचान' बनानी है।
इसी हसरत को लेकर उड़ी मैं।
सौंपा है खुद को उस शीतल पवन के हवाले
कि मुझे भी उसकी तरह ही पहचान मिले
जो न दिखकर भी हर वक्त दिखे।
लेकिन-
एक सवाल दिल में अब भी उठता है-
क्या ख्वाहिशों को मेरे पर मिलेंगे?
क्या सपनों को जमी मिलेगी?
हाँ मिलेगी।
वो जमी तेरी है, तू हौसला तो रख
इक कदम तो बढ़ा, अपने सपनों की तरफ
वो बाँहें फैलाए तुझे ले उड़ेगी
उस तेज झोके के साथ।
और मिलेगा तुझे तेरा ही वो रूप
जिसे तूने अपने अंदर छिपा रखा है
जिसे तू ढूढ़ने आसमाँ में चली है
वो तुझमें ही कहीं छिपी बैठी है।

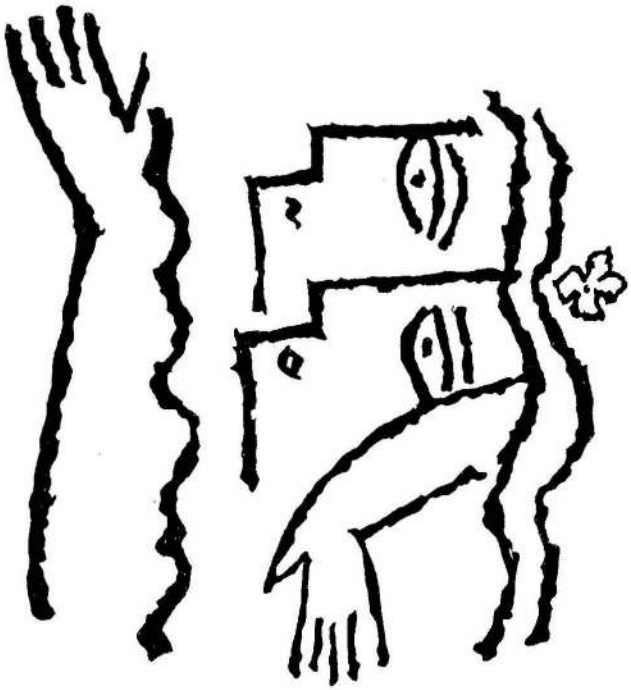

समर अभी बाकी है

आनंद प्रसाद नोनियाँ
स्नातकोत्तर, प्रथम वर्ष, हिंदी विभाग

अगर पाना चाहते हो कुछ,
तो खोना होगा बहुत कुछ।
छोड़ दो मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ को
तभी छू पाओगे बुलंदियों के शिखर को।
एकाग्र करो अपने मन को, मस्तिष्क को
देखो अर्जुन की तरह मछली की आँख को।
होगे न कभी अपने मार्ग से विचलित
ध्यान में रखो अर्जुन को और बढ़े चलो।
सोचने की क्षमता का करो विस्तार
तभी होगा तुम्हारा इस संसार में विकास।
बनना चाहते हो तो बनो, मर्यादापुरुष न कि मर्यादाहीन।
तुममे क्षमता है, संकल्प है, आत्मविश्वास है,
शक्ति है, शांति है, धैर्य है, सभी तो हैं।
फिर डर क्या, बढ़े चलो - बढ़े चलो
लड़ना है, बढ़ना है, बढ़ते ही जाना है,
रुको न तुम वीर, सूर, साहसी
क्योंकि, समर अभी बाकी है।

पूर्णता

कुसुम उपाध्याय
एम.ए. प्रथम वर्ष

जिंदगी खेल खेलती है
अपने आप के साथ भी
कभी बादलों पर पेच डालकर झूलती है
और गिद्दा डालकर सावन गाती है नाचती है-
कभी चुपचाप फूलों के पास बैठकर
फूलों को महसूस करती है अपने वजूद में
कभी धूप को बदन पर मलते-मलते
राझण-राझण गाने लग जाती है-
और कभी-कभी पगडंडी पर चलते-चलते
सोचो के साथ मिलकर सपनों तक
परवाज भी भर लेती है-
एक दिन जिंदगी जिंदगी की सभी सीढ़ियाँ चढ़कर
अपनी पूर्णता से
हाथ मिलाने का
खेल भी खेल लेती है।----

घर बसाने को

दीपक कुमार
स्नातक, प्रथम वर्ष, हिंदी विभाग

एकान्तवास छोड़ घर बसाने को
सज-धज के निकला है चाँद
अपनी ही चाँदनी में
इठलाते हुए शरमाते हुए
एक टक, नजरें गड़ाए
निशा के कालेपन में
धरा को उज्ज्वल करते हुए
धरा भी बेकरार थी
दिनभर की तपन के बाद
चाँदनी में नहाने को
सौर्यमंडल में पनप रहा था प्यार
कभी न मिलने वाली परछाई में
फिर भी जवाँ की बेकरारी
धरा के विरह में
दिन प्रतिदिन सिकुड़ते हुए
फिर चमक उठता है,
पूर्ण स्वरूप में
धरा को चाँदनी में नहलाने को
वह पूनम को बनता है दूल्हा
धरा को अपना बनाने को
एकांतवास छोड़ घर बसाने को।

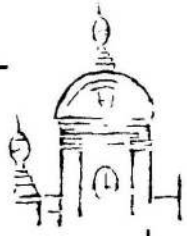

हर्जा कर सकता है

दीपक कुमार
स्नातक, प्रथम वर्ष, हिंदी विभाग

कब्र में सोए
उस बूढ़े इंसान के
चेहरे की झुर्रियों को
एक-एक कर
बड़े इत्मीनान से
मैं गिनता रहा।
और उन झुर्रियों पर चढ़े
कमान से ताब को
इस कदर मापने की
मैंने कोशिश की
कि गुस्से की हद मापने में
कोई कमी न रहे।
क्योंकि मरने के बाद
इतने गुस्से का आना
सेहत के लिए
हर्ज कर सकता है।

बहुत दिनों के बाद

प्रियंका कुमारी सिंह
स्नातकोत्तर, प्रथम वर्ष, हिंदी विभाग

बहुत दिनों के बाद
हाँ, सचमुच ही तो
बहुत दिनों के बाद
देखा मैंने कुछ खास, कुछ पास
पर यह क्या?
आकस्मिक मिलन से पहले ही विछोह।
क्या यह नियति ही मेरी किस्मत है?
बहुत दिनों के बाद फिर से ठोकर खाकर
बहुत दिनों के बाद फिर से आँसू पाकर-
ऐसा लगा जैसे कुछ खोकर
फिर गहरे अंतराल के बाद,
उसे दोगुने वेग के साथ वापस पा लिया।
वही मोहल्ला था, वही तंग गलियाँ थी,
और तो और
वही बदबूदार नालियाँ थीं।
और भी एक चीज थी
जो सासों को अंदर ही अंदर,
मसोसे डालती थी।
पर वह क्या थी?
ऐसा प्रतीत होता था मानों यहाँ सदियों से दफ्न-
चींखें, आवाजें, सिसकियाँ, सिहरनें
जीवित हो उठे हो।
और
क्रुर रूदन छोड़कर अट्टहास कर रही हो
किन्तु, यह क्या?
सीढ़ियों के जीनों पर पाँव रखते हुए ऐसा लगा
जैसे किसी ने
पैरों तले की जमीन छीन ली हो।
और यह क्या?
धरती विलीन होती जा रही है,
अंदर ही अंदर धँसती चली जा रही है।
या, यों कहें कि धरती शर्म से काँप रही है,
वह लज्जा से स्नात हो रही हैं।

उसका ईश्वर

शर्मिष्ठा घोष
स्नातकोत्तर, प्रथम वर्ष, हिंदी विभाग

लहलहाते खेतों के बीच
चली है एक पगडंडी,
ठंड से काँपती-ठिठुरती
उबड़-खाबड़ एक पगडंडी,
प्रथम प्रहर की इस वेला में
निस्तब्ध चली एक पगडंडी
निहारती है पथिक को।
वह जानती है,
पथिक आवेंगे कुछ ही
जो खेतों के मजदूर
या हैं वे, जो रहते
नदी के पार गाँव सुदूर।
तब ही वे आवेंगे
जब सूर्य का ताप फैलेगा,
अभी तो किरणें निद्रा से है जागी,
वे हैं अलसाई
लेती हैं अंगड़ाई।

पर यह क्या?
अभी आ रहा पथिक कोई!
शुभ्र वस्त्र हैं उसके
मुखमंडल पर ओजस्विता।
पूछा पथिक से उसने-
'यहाँ क्या है पथिक तुम्हारा?'
- 'ईश्वर मेरा'।
पगडंडी हँस पड़ी।
बोली- 'मुझसे होकर पाओगे
केवल यह नदी,
ईश्वर नहीं।
मैं ईश्वर तक नहीं जाती,
फिर काम क्या यहाँ तुम्हारा?'
पथिक बोला- 'अरी पगली!
तूने आगे केवल देखी नदी,
उसमें जीवन देखा नहीं।
इस सृष्टि को देख,
यह सूर्य, सूर्य की किरणें,
बालियों का झूमना,
ओस का टप-टप गिरना,
यह नीरवता,
नीरवता में यह कोमलता,
कोमलता में सुन्दरता
और इस सुन्दरता में
तुझे ईश्वर नहीं दिखता?
नहीं दिखता, तो तू है पगली।'
इतना कहकर बैठ गया पथिक
नदी के तट पर।
पगडंडी अपलक निहारती रही उसे
क्षण-भर हँसी कि-
तू पगल है पथिक, मैं नहीं।
यह तो नित्य है,
कुछ नूतन नहीं।

पर यह क्या?
उसने देखा-
पथिक के चारों तरफ
फैली है एक आभा।
उसने कहा-
'सौभाग्य कि मिला-
उसे उसका ईश्वर।'

A Return to Holofernes

KRISHNA GHOSE
Second Year M.A., English

If Holofernes, the Pedant, were suddenly to come to life today, he surely would be amazed and delighted by what he heard and saw. For an easy familiarity with Art and Literature, preferably Continental or Oriental, is at present often thought to be a status-symbol as valid as the new car or the television set. Boook-reviewers and critics and last but not the least, the coffee-house literati, seem to cultivate learning with a gusto that puts Thackeray's rather colourless Literary Snob very firmly in the shade.

What is important, to some people at least, is not so much what is said, as the manner of saying it. One has but casually to refer to a celebrated author here or to a well-known book there; to add a dash of world-weary cynicism, or else fill out with

Taffeta phrases, silken terms precise,
Three-pil'd hyperboles, spruce affectation....

And *viol'a*! one is credited in one's writing and conversation with the indefinable *je ne sais quoi* of Culture.

The temptation to appear an *haut-ton* intellectual is strong indeed. Who is not familiar with the unkempt undergraduate vaguely wandering around, with Kahlil Gibran prominently rubbing shoulders with the "Life of Lenin" under one arm, and "Doctor No" discreetly tucked away beneath the other? Somehow, it is rather diffcult to avoid the gnawing suspicion that he will finish only the Fleming.

Truly, with apologies to Coleridge and to Shakespeare, one could apply to these people the epithet "myriad-minded". When they are not pondering over the Sino-Soviet rift, or over the latest song-and-dance spectacular at the cinema, they are dissecting Marx or debunking Ginsberg over a cup of coffee. Nor do they stand alone. The brittle sophistication that is fast becoming the fetish of our times demands, as it were, that anybody with pretensions to education must be able to talk with equal fluency on Beethoven, Baudelaric, Bretolt Brecht and Art from the Mayans to Disney. If it is at all possible to drop a casual comment now and then on the Hoyle-Narlikar theory.

Offending The Text : Mr. Peter Handke Speak-in-g!

ARKA CHATTOPADHYAY
Ex-student, Department of English

Me? To write? An essay? How? Why? Why not? Well, an essay on Peter Handke's **Offending The Audience** (1966)? That is a contradiction in terms! Why so! Why not! Do you not know about it? That play does not exist! Handke calls it an "anti-play" (Like Ionesco's **The Chairs**?). It is anti-performance, anti-dialogue, anti-plot, anti-character, anti-meaning, anti-representation, anti-stage and well, even anti-audience! It thwarts all idelogy, all discourse, all propaganda! As Handke says, it has no spatial locus and it is outside time too! That is because it is a "pure-play", which according to Handke's on-stage speakers, has to exclude temporalty. One can read **Offending The Audience** as an essay on theatre. Then what am I writing, or trying to write? An essay about an essay? A meta-essay it is then! Let me embark. I will (I think) end up writing an essay just as Handke, despite all that is said and done, does end up writing a play!

Peter Handke is to the German theatre, what Richard Foreman is to the American. Widely recognized as the most brilliant of dramatic voices to have emerged in European avant-garde theatre, post Samuel Beckett, Peter Handke is a curious amalgamation of Beckett's meta a theatre and Odon Von Horvath or Heiner Muller like destruction of the entire theatrical spectrum. He calls his plays — **Offending The Audience, Prophecy, Calling For Help, Quodibet** — "speak-ins". This is the theatre of words, No images (This is precisely the departure from Beckett) exist here. Only signifiers exist and proliferate ad infinitum. It is a new form — The language play. Language makes and unmakes itself. Words dramatise their history of self-alienation. Beckett reduced characters to mere figures. In Handke, it is only words, stirring on. Theatre is pushed off to its extreme hinterland of existence where the onion is peeled off. The core is where the void is. Handke, being "nauseated by language" (in his own words) makes us encounter the void like a Lacanian phallus, like a Derridean "centre" that is always a posited being and always sans any ontological status. But where is the text? What about that? Can Handke escape the text-almighty? Mr. Derrida hits back. The text is a police-state — "Mr. Handke, you are under arrest."

These are some of Peter Handke's comments on theatre and language, his spool of theatrical expression. I would throw them at your face. I would not explain. That is not allowed. Hanke is still alive.

(i) "The stage is an artefact".

(ii) ".... my words are not descriptions, only quotations."

(iii) "Morality is the least of my concerns."

(iv) "My theatrical plan is to have the audience always look upon my play as a means of testing other plays."

(v) "One should learn to be nauseated by language.

(vi) "I think a sentence doesn't mean something else : it means itself."

I have only quoted Handke! Please remember this. Do not offend me. I am being written inside this text. Burried in this word-heap. That is what I am. That is wnat I ever can be. One can be. All under Handke's panoptic gaze. All hail to thee!

Bertolt Brecht's "alienation effect" started the castration of the audience. The implants gave the audience a performativity. Then, Samuel Beckett gifted us with the inexistence of the audience — Godot who could never have come. So, Beckett's figures kept on, auto performing. Peter Handke kills off the audience, in his turn! His speakers offend the audience with a flurry of slangs. They decapacitate the audience, through the text, turning all audience-actions, behaviours, reactions and possible interpretations into speaking spectacle (homage to Jean Baudrillard). The audience is snapped of all logical probables. The audience cannot even clap. Because, Handke's speakers narrate out the action of clapping and use a recorded applause from the back-stage. How the audience decided to see a play, how they came out of their houses, caught a public vehicle, reached the theatre, watched the play, analysed it, went out, caught yet another public vehicle to return home

— all this is narrated out of existence (i.e. the audience's text) and the audience, rendered importent to do all this. The more the content wants to liberate and autonomise the audience, the more the form of Handke's text recuperates to repress the audience. The audience is deconstructed.

As Handke says, **Offending The Audience** is a "Verbal rock concert". The whole text runs like a rockaby indeed! It lulls and rocks the audience to stasis. The subject-object between the performers and the audience is turned on its head. The argument of this play-cum-essay transforms the audience into the principal subject of the text. The audience is textualised. The performers become the audience. The audience is minimised into performance. This is the "structure" that faces Derridean decentring. The centre, here, exists, as in Derrida, both inside and outside the structure. The audience is outside the stage-structure. They are brought inside by the speakers. They are thrown out by Handke. The "play" of signs ruptures the structure. The auditorium seat is where the play lies. The text is made to incorporate its ever-tantalising exterior, thus. Mr. Derrida — all smiles. The audience addressed. The audience silenced. The rules of the game!

Pirandello gave inaugoral voice to the actor's rebellion against the athor, against textual doctoring. Six characters searched for their author. When the author came, they commited suicide. They were the first martyrs of theatre. Late Beckett's Artaudian insistence on the actor-performer's power-suppression under the authorial and the theatrical gazes, extend the protest. Who can forget the subjection of the compelled performer in Beckett's **Catastrophe?** The lights of theatre that keep falling upon the faces of the three performers in a randam movement to emanate speech from them in **Play** or the poker which forces the boxed up actor to burst into performance in **Act Without Words-II** or even the performer who is abrupthy thrown from the wings, right into stage-centre, facing the audience in **Act Without Words-I** — all underscore the Beckettian compulsiveness of the performer and the relentless power-game that theatrical performance supplements. Peter Handke's speakers are, as it were, a post-script to Beckett's realisation of the theatrical power-rhetoric. They break the shackles. They come out of the authorial text. They deny performance that has always put them on trial in front of the audience. Pirandello shows us the slit. Beckett elaborates. Handke performs the overthrow. Or is it so? I need to think twice, be twice! Theatre is in the Artaudian "double".

In a negative and selfcontradictory register, offending all linguistic logicality, the Handke-text pastiches the entire theatrical tradition from the Greek plays to Shakespeare to the so-called "theatre of the absurd" (though, there is hardly one such thing, in the form of a real literary movement) to Harold Pinter's semantically loaded silences and pauses to the trends of "fourth Wall" realism and so on. The text eschews the need of objects on stage and insists that it is just an elevated platform to stant upon and no separate world. Theatrical space is slaughtered. The speaking also reduces the notion of theatrical time to a hollow as the speakers of Handke bring in the example of the football-game where the time of the performers and the time of the spectators are the same. It is all one, single, live-time. The play is about itself, about perpetually "unrepeatable" and perpetually "expiring" time. Real time can never be dramatised. That is because it does not existl Reality is murdered in a "perfect crime"! Jean Baudrillard remains its simulacrum-witness!

Offending The Audience, being to conscious of its ideological eschewing, becomes one enormous ideology, one wild propaganda! The characters are words. But, all said, and gone (!), they are all Handke's words. In finality, he is indeed suduced by language. The repressive audience— state is surely brought down but only through counter repression and verbal plethora in and as verbal violence. Handke's characters do seem to speak out. But, that is another of those power-permeating illusions of the theatrical topos. As the name itself connotes, Peter Handke's speakers can only "speak in"! They only manage to speak into the authorial text to embrace it as a master-textuality of sorts. And Peter Handke is compelled to re-perform, from the scraps, the most antique theatrical mirage of the actor's emancipation. The mirror remains in disappearance. The textual condition offends Handke. But, he has to go on and end on ... I have also ended up writing my essay! Finally!

The Seventh Seal : A search for the Divine...

ANUPARNA MUKHERJEE
3rd Year, Dept. of English

"Lead, kindly light, amid th' encircling gloom,
Lead Thou me on;
The night is dark and I am far from home;
Lead Thou me on..."
(Lead Kindly Light by John Newman)

In his late thirties, when the Swedish film director Ingmar Bergman, was vacillating between his declining faith in religion and his strengthening scepticism about God's existence in a post-apocalyptic world that has already seen the genocides of the two World Wars and was threatened by yet another catastrophic Cold War, **The Seventh Seal** (1957) comes as a revelation of his own spiritual pursuit, and a personal expression of his fears and trepidations about the precariousness of existence in a universe that seems essentially tragic and nihilistic. In a rivetting interview on his life and career, Bergman is quoted as stating: "For me in those days, the great question was: Does God exist? Or doesn't god exist? ...if god doesn't exist what do we do then?" — It is this dwindling faith in the Divine that forms **the rational groundwork of The Seventh Seal,** a film that can be at once termed as an Existentialist's manifesto and a private quest for God in the annihilating times when death was the only certainty.

The Seventh Seal which is the first of the trilogy (others being **The Face** and **The Virgin Spring**) was developed from a minor dramatic sketch, Wood Painting which Bergman wrote in 1954. Principally a low budget enterprise, Bergman called this celluloid masterpiece, "a little film I and my friends made one summer" and completed the entire shooting in just thirty-five days.

Right at the outset of the film, a voice-over narrator recites from the holy **Book of Revelations** "When the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven for the space of about half-an-hour..." The quotation from Revelations evokes the ominous idea of judgment and Doomsday and makes it clear that the title refers to God's book of secrets guarded by seven seals; only after breaking the seventh seal will the secret of life be revealed.

Set against a doom-laden landscape of medieval times, **The Seventh Seal** maps the homeward journey of a 'battle-weary' knight, Antonius Blok (Max Von Sydow) with his earthy squire, Jöns (Gunnar Björnstrand), after an ostensibly pointless decade of crusading in the Holy Land. He finds his native land riddled with plague and persecuted by an overwhelming sense of guilt has given over to self-mortification through flagellation, and witch hunting, a movement spearheaded by a sadistic ex-seminarist, Ravel. This grotesque reality of life in the Middle Ages, when women were tied to the stake and burned as witches, holy flagellants mutilated their bodies in the name of Lord and Black Death took toll of thousand lives, provides the unnerving backdrop to the physical as well as the spiritual journey of a battered knight (and the director) into his inner psyche, and the entire allegory with its mythic associations becomes a pilgrim's progress in search of the knowledge of a manifest God in a seemingly Godless universe.

In the midst of his spiritual turmoil, the knight encounters the personification of Death (Bengt Ekerot) in a black hooded figure, who informs him with a cold frigidity that his time has come. What follows next is an apparently unflustered conversation between Death and his victim in brief staccato words :

Knight : Who are you?
Death : I am Death.
Knight : Have you come for me?
Death : I have been walking by your side for a long time.
Knight : That I know.
Death : Are you prepared?
Knight : My body is frightened, but I am not.
Death : Well there is no shame in that.

But before Death could take him under his shroud, the knight manages to win a brief reprieve by challenging him in a game of chess with a clause that if the knight loses he shall accompany Death to his 'other kingdom': if he wins, Death must leave without him. Thus against the vast and infinite canvas of the sea and the sky begins

the eternal battle between life and death-the Knight and the Reaper, the predator and the prey, with the ambience forming a stark contrast to the fragile and ephemeral game of life played out against eternity.

However, the players are soon interrupted for Death to carry on his errand, bringing even more virulent illnesses to cut a swathe through the area, but the slow dissolve of the scene tells us to regard the game continuing, metaphorically, through the story.

In the meantime, the knight too continues on his journey through the plague-ridden land with his squire, Jöns, seeking answers for his metaphysical quandary about the reality of God. At one time, the knight in sheer desperation voices his angst before the altar of God: "Is it so cruelly inconceivable to grasp God with senses? Why should he hide himself in the midst of half spoken promises and unseen miracles... What was going to happen to those of us who want to believe but aren't able to... I want God to stretch out his hand towards me, reveal himself to me...In our fear, we make an image and that image is called God". But God remains silent. The knight calls out in the dark but no one seems to be there, except Death in disguise. He acknowledges that his life has been a 'futile pursuit, a great deal of talk without meaning', yet he cannot accept an absurd universe where life is merely a tale scripted by an idiot, 'full of sound and fury, signifying nothing'. "No one can live in the face of death, knowing that all is nothingness" he claims and decides to use his reprieve for one meaningful deed.

As for Jöns, the squire, he is loyal to his master but contemptuous about the Crusade, he says: "it was such madness that only a genuine idealist could have thought it up." It is who Jöns identifies the 'meaninglessness' of the existence as he watches the death of the young girl branded as a witch, and argues with Blok who is unable to grapple with the indifference of the universe:

Jöns : Who watches over that child? Is it angels, or God or the Devil, or only the Emptiness, my lord?

Knight : This cannot be.

Jöns : Look at her eyes my lord. Her poor brain has just made a discovery. Emptiness under the moon.

Jöns concludes by pointing at their inability to provide solace to the dying girl (the witch): "We stand powerless, our arms hanging at our sides, because we see what she sees, and our terror and hers are same. That poor little child..."

Having realized the absurdity and nothingness of human life, he indulges in the pleasures of the senses. A worldly 'Sancho Panza' to his master, a 'spiritual Don Quixote', the squire expresses a stoical acceptance to death by discarding the all ranting about the doom. Gerald Mast thus writes, "Like the gravedigger in "Hamlet", the Squire [...] treats death as a bitter and hopeless joke. Since we all play chess with death, and since we all must suffer through that hopeless joke, the only question about the game is how long it will last and how well we will play it."

In stark antithesis to the knight's anxious dilemmas concerning faith and the bitter cynicism of Jöns, stands Joff a poor travelling entertainer, who in his simplicity of faith and unpretentious devotion to God has recurrent visions of the Virgin and the child. He with his beautiful young wife Mia and their infant son Mikael represents of the 'Holy family' in the film. It is only in the blessed company of these unassuming couple does the knight find some comfort: "Everything I have seemed meaningless and unreal while I sit here with you and your husband", he claims, as he encounters for the first time since his journey, human love and compassion. It is almost, as a critic suggests in her book on Bergman, 'a kind of primitive Eucharist which momentarily redeems the knight from his doubt.' Mia serves her weary guest with him milk and wild strawberries, the latter stands as a personal symbol for asspring and revival of life in the natural world.

At the film's end, Death has his final triumph over the mortals by inevitably crushing Antonius in his attempts forestall his fate, but Blok manages to halt him long enough for the family of the pantomime actors to go beyond the reach of the circle of his bending sickle. Though the knight succumbs to the scourge of death: he has performed his significant act- in the celebrated climactic scene, as the silhouetted spectres of the knight his companions dance hand-in-hand to the tune of Death-their strict taskmaster, against the horizon, we see Joff and Mia are spared by the knight's benign interference. At this juncture, we apprehend that our life too, inevitably encloses in death, yet if one can accomplish even a single gesture of goodwill, then the strife-worn existence, in spite of its fret and fever, may find a meaningful

end. It is this realization that enables the characters (as well as the director) to transcend the fear of Death, rather than the fact of it. It is with this note of hopeful humanity and a touch of sincere optimism the tale of death eventually redeems itself to a quest for new life for Joff's family in the light of a clear dawn. The movie may be well be wrapped up by Bergman's own confession that the film is "about the fear of death" but paradoxically, "It freed me from my own fear of death". Full of captivating images, the symbolism in **The Seventh Seal,** functions on a multiple level. The plague that haunts the cities of Europe, for instance, may be viewed as 'a personification of the destructive forces inherent in the human condition'. A film that has given the phantom of death a tangible form and fear a new face, successfully weaves around the allegory of the medieval knight, a gothic world of dark happenings as anxious as our own. In a programme note released with the film, Bergman purported that "In my film the crusaders return crusades and the soldiers return from war today. In the Middle Ages Man lived in terror of the plague. Today they live in the fear of atom bomb." The film refuses to provide a conclusive comment on God's existence. Bergman deliberately places two opposing beliefs-the doubts of Antonius and the faith of Joff side by side, allowing each to state its case in its own way. One may believe that God reveals his presence by the very existence of love in the world and from this perspective, the altruism of Antonius is a meaningful act, an act of love, a revelation of God. Yet God, like Godot, does not appear in person till the very end and the only language with which he communicates is silence. Death similarly arouses many questions but answers none-it has no secrets to divulge and has nothing to tell. But still the quest for human knowledge must continue. So when Death asks the Knight: "Don't you ever stop asking question?" the Knight, the representative of mankind, answers: No, I'll never stop."- For the great spectacle of life must go on, with or without us...

References—

1) Ingmar Bergman by Robin Wood

2) Sources from the Internet

3) Bergman on Bergman: Interviews With Ingmar Bergman by Stig Bjorkman (Author), Torsten Manns (Author), Jones Sima (Author), Paul Britten Austin (Translator)

Third World' and the dilemma of the 'left' : Rethinking the discourse of development

PROSIT DAS
Dept. of History

God said, 'Let there be development!' And there is development. We are living in an age when the entire human life is being driven toward the attainment of the development. The public sphere is dreaming the development. The state is exploring the different means of achieving the development. And the institutional left in India has become the crusaders of development.

Amidst this euphoria (both social and cultural) over development, this obvious presence of development in the political rehtoric cutting across the party-lines, this article attempts to problematize the given notion of development and understand the dilemmatic position of the left regarding the notion. To be more clear on the later issue, we see the institutional left glorifying and preaching the agenda of development on the one hand and the Protestant left violently criticising this model of development which have their own model of development. This article attempts to find out the fallacies of this peculiar consensus amongst the left regarding the inequitability of development.

The discourse of development : From the politics of globalisation

The discourse of development begins with the assumption that the economics need to be developed are presently undeveloped or else 'undeveloped? And there underdeveloped economics constitute the 'third world'. The third world birds on inferior position in the discourse of development. And therefore the project of development in the third world has to be modelled on the idea of development in the first world, the beast. This project bears resemblances to the project of colonialism to a great extent.

Edward Said has shown as home Europe constructed the category of the 'Oriental' to serve the purpose of the colonial enterprise and the category was a product of a knowledge system as organised as ever. There was an underlying assumption of the coloniser in the construct that the 'Orient' can not speak of on his own and therefore he has to be represented.

Such constructed categories and rule categories were always at work to the fuel of colonialism. For example, in the days of the Raj in India the category of the manly, masculine Englishman was introduced as opposed to the not masculines, to put it differently, globalization, equipped with the tool of development, has colonised (in both technical and historical sense of the term) our imagination, effeminate Bengali. These constructs had interesting implications for the political economy of the imperial enterprise of the Raj.

In much the same way we can see the notion of a masculine development which materialises its agenda bulldozing the underdeveloped, the feminine other of the development. Because this development is essentially looking forward. It attempts to create a world order that would establish a uniformity across the globe, the notto of the globalisation.

Thus we see a hierarchisation of the ronomies and in this hierarchical structure third world has to catch up with the first world. The politics of globalisation, then, can be traced back to the politics of colonialism.

Now one point has to be underlined here necessarily. The agenda of the development constitutes the agenda of the capitalism and one does not have to be an economist to realise this. Capitalism, after the set back it received during the age of decolonisation, has become equipped with the motion of development. And this journey of the global capital operating under the must of the development has to be undisturbed.

As development necessarily means progress for the economy (and the society as well) it breaks away from all the elements of underdevelopment. For example, the portrayal of the peasant is shabby in the discourse of the development. The peasant is a category associated to the underdeveloped in third world and therefore, is a constraint in the path of the development. Thus this peasant of the third world has to be put into the structure of a highly technicalised, industrialised agriculture, the so-called green revolution.

This example of the peasant is applicable to the other socio-economic categories as well. These catego-

ries have been constructed and re-constructed to legitimise, the journey of the development.

The dilemma of the left : Marx and the legitimacy of development.

As I have mentioned at the very beginning a curious consensus has been reached by the left regarding the inevitability of development. While the institutional left is trying to preach the importance of capitalist development drawing its legitimacy from Marx the Protestant Left is arguing for a people's development strengthening the idea of the holiness of development. More importantly the latter is also convinced regarding the concept of the development (in the sense Marx used it) of capitalism. The non-institutional left argues that 'the remnants of feudalism' have made an alliance with capital and capital has changed its character in the third world. But they don't differ from their institutional counterpart regarding the inevitability of the stage of capitalism.

Capitalism, as we know, has assigned a crucial role in history by Karl Marx. With the socialization of the instrument of production the bourgeoisie freed history from the closure of feudalism. It 'batters down the Chinese Walls' and thus capitalism becomes the 'unconscious tool of history.' And more importantly for our purpose Marx here makes mentions of the 'nations of peasant' on nations of bourgeois', of 'the East on the West' as the result of the development of the bourgeoisie.

Marx elsewhere traces down the genelogy of capital reaching his theorisation of the 'primitive accumulation of capital', the 'original sin' of political economy. Here he deals with the expropriation of the peasantry from land in England of the 16th century by means of force and legislation. Marx has given a fair description of the process of expropriation but he has also shown us that this process finally resulted in the capitalist form of agriculture, the conquest of the home market by the capitalist and above all, the supply of the urban proletariat.

Thus the expropriation of the agricultural population accelerated the course of history. Because the 'pre capitalist' has to be displaced for the establishment of all that is capitalist. Consequently this logic of displacement is applicable to the third world to materialise the project of what Marx called the 'revolutionary reconstitution of society; thus we can see the West reaching, constructing and constituting the East, the third world ('as also mentioned above) and thus Marxism falls prey to Orientalism. So the left has to take side with the notion of development in one way or the other.

So we discover that this historicities of capital posses the problem of 'Westward logic'. And one of the derivatives of this problem may be the notion of development. But if we want to dismantle this logic of development we have to do so resting on theorisation of the third world, own. Marx does provide some important equipments for that purpose and this article does not want to ridicule Marx but to focus on him critically to get an understanding more relevant to our purpose. But this does not prevent us from saying that the people's resistance against the 'development' has greater implications for the struggle against globalisation.

Notes and references :

1. I use the word 'Left' in this article more in its political sense than in its sociological sense — that is, the use of the word refers more to the left clear in its party affiliation (both institutional and non-institutional) than to the social left, the left-minded people.

2. See A. Chawdhury, D. Das and A. Chakrabarti, pp. 80-81. Margin of Margin : Profile of an unrepentant. Postcolonical collaborator, Kolkata, 2000.

3. See Edward W. said, Orientalism, Penguin Books India Ltd. New Delhi, 2001.

4. For a discussion on the relationship between the 'colonial masculinity' and the political economy of the British India Empire see Mrinalini Sinha, Colonial Masculinity : The 'manly Englishman' and the 'effeminate Bengali in the late nineteenth century, Kali for Women, New Delhi, 1997.

5. For a detailed discussion of the global capital and the discourse of development see Angan Chakrabarti and Anup Dhar, pp. 77-80, 'Imperialism in the age of Empire : Global capitalist Hegemony and the 'World of the third'', Other Voice, January, 2005.

6. Interestingly the peasant has been constructed and reconstructed in the political discourse of the mainstream again and again. We can think of the peasants of Nehrunian Socialism to the peasant of contract farming. Today regarding the investment of private capital in the agro-retail sector we see the same politics of incorporating the peasant into the fold of 'developed' market economy.

7. See Karl Marx and Frederick Engles, pp. 38-39, Manifesto of the communist Party, National Book Agency (P) Ltd., Kolkata-2004.

8. Of course, there are other traditions of reading Marx, distinguishing between early and late Marx and exploring 'Many Marxes' as opposed to 'the one Marx'. But this article limits itself within a particular, mechanised and also popular reading of Marx to the purpose of understanding the politics of the left.

9. See Karl Marx and Frederich Engels, pp. 38-39, Manifesto of the communist Party, National Book Agency (P) Ltd. Kolkata, 2004.

10. See Karl Marx, pp. 713-60, Capital, vol.-I, Progress publishers, Moscow, 1965.

11. For a post colonial analysis of the orientalist and historicist sensibilities in Marx see Dipesh Chakrabarti, pp. 17-19, 45-71, Provincializing Europe, Oxford University Press, New Delhi, 2001.

For a perspective on the paradox of the economics regarding the third world and capitalism see Kalyan Sanyal, pp. 15-55, 'From Imperialism to Globalization : Reconstituting the third world', other voice, January 2005.

12. See W. Benjamin, 'Thesis on the philosophy of history, pp. 255-56, Illuminations, Collins/Fontona Books, London, 1973.

13. To use the term 'third world' here is not to accept the pre-determined category of the West but to give the term sense.

It might seem to one that all problem lies in the implementation of Marxism (an opinion indeed popular among the Left intellectual circles). But the thought pattern derived from the methodology of Marxis m indeed speaks for a course of history too pre determined. As Benjamin has shown us the device of historical materialism is always to win in the game of chess (of the historical course) because somebody 'out of right' is playing for it. And this historical materialism can well identify itself with the slogist logic of development.

সায়ন্তন বিশ্বাস
দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

An Ikebana of Fermi Problems

AMRIT KUMAR
2nd Year, Mathematics Department

Variety of problems of mathematical and even with origin in theoretical Physics can be categorized as Fermi Problems. I envisage highlighting the importance of this unique, simple and intuitive approach to problems of such kind which seem to be of galactic dimensions at the first sight.

One of such problems was posed to over 400 brightest minds of the world representing their countries at the International Physics Olympiad 2006, held in Singapore. This article is all devoted to the toughest of the competitions on the planet. The Physics Olympiad is considered to be the most prestigious of its counterparts in other basic science subjects.

One of the professors at IIT Kanpur, V.A. Singh once asked students in his class : How many bicycle repair shops are there in the IIT-Kanpur campus? The answer was to be provided on the spot and without recourse to any empirical survey. All were stumped. Now, the solution that Singh gave was like this : the student population in the campus was 3000 and we assume that 75% of them had bicycles. There were a thousand resident families and two bicycles per family was a reasonable guess. Assuming that a bicycle would need some repair once a week we get that the no. of bicycles visiting the friendly neighbourhood repair person is 4250 per week. Given six a day week, the no. of visits per day (say 10 min. per bicycle), we get the no. of cycle shops as 12. A survey revealed 11. The spectrum of Fermi problems is wide and diverse. A story says that the Nobel laureate H G Bethe arrived at the correct sequence of nuclear determining the energy production in the sun and the stars, while travelling in a train.

Let's solve a Fermi problem :

Hanuman was one of the first full length fast moving Indian animation movies. Estimate the total no. of frames in this 100 min. movie.

Solution : From our knowledge of the persistence of vision, the no. of frames per second (FPS) is 16-20 to ensure continuity. We also know that normal movies run at 24 FPS. Taking into account that the movie includes fast moving frames, we assume that on an average there are 30 frames per second in the high quality movie.

Since it is 100 min. long, the total no. of frames are 100x60x30=1,80,000.

The exact figure is 2,00,000.

My math's muse pushed me to add a leaf, not greener compared to the above work done by Himanshu Asnani, a 2nd year Electrical Engl. student at IIT-B.

But, I reckon it as a quintessential of Fermi problems from Real Analysis.

I choose a real seuqnece

$$X(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + \ldots\ldots$$
$$= \Sigma 1/n$$

Clearly, $X(n+1) > X(n)$

i.e. $X(n)$ is an increasing sequence.

By Monotone Convergence Theorem, the question of whether the sequence is convergent or not is reduced to the question of whether the sequence is bounded or not.

Attempt to use direct numerical calculations arrive at a conjecture concerning the possible boundedness of the sequence $X(n)$ leads to inconclusive frustration.

A computer run will reveal the approximate values $X(n) = 11.4$ for $n = 5,0000$ and $X(n) = 12.1$ for $n = 100,000$.

Such numerical facts may lead the casual observer to conclude that the sequence is bounded. However, the sequence is in fact divergent.

Now, my question, is, how much time a computer takes to find the no. of additions needed to achieve $X(n) > 50$?

Solution : The terms $X(n)$ increase extremely slowly. For example, it can be shown that to achieve $X(n) > 50$ would entail approximately 5.2x10^21 additions, and a normal computer performing 400 million additions a second, would take more than 4,00,000 years of perform the calculation. Even a super computer that can perform more than a trillion additions a second, would take more than 164 years to reach the modest goal.

Joie De Vivre

DEBAJYOTI DUTTA
1st Year, English

"Four years" Amartya recounted to himself. It was exactly four years ago today Amartya left Calcutta. His father, Ashutosh was promoted to the designation of a Product Manager. Being a national responsibility, it was required of him to be transferred to either Delhi or Mumbai. A handsome salary coupled with a lofty rent allowance and paraphernelia of other perks was lucrative enough to allure him. Furthermore, Delhi was palpably deemed to be an ideal city for Amartya's further education. What more could Ashutosh ask for? Two years later, Ashutosh was promoted yet again to the designation of General Manager. This time he chose to be relocated to Mumbai. And now four onerous years have passed metamorphosing his once gregarious son into a miserable surpuss. Amartya felt stifled amidst the ostentation of a moribund, mercenary environment. He almost became a recluse. A devout follower of Tagore, he would often querulously pray in his solitude.

"Hark! Is it thee?
Who will break my latch and make me free."

One fine morning his prayers were answered. An ex-collegue hailing from Calcutta proposed Ashutosh to join in tandem the business venture he had successfully embarked upon. He almost grabbed the opportunity so as to say. Nevertheless he remained stoic to hide his ebullience and pragmatically negotiate the terms and conditions of the proposed offer. After a proposed offer. After a prolonged discussion and negotiation he finally managed to secure for himself, the coveted designation of a CEO and relocation to Calcutta. Ashutosh felt exuberant. All these years he had contemplated stupendous success in his career. He even accomplished it nevertheless at the cost of his familial bliss. His wife Aparna, his son Amartya could hardly reconcile to the cultural shock. Ironically Ashutosh's attempt to spend quality time with his family would often lead to squandering money on mindless shopping spree in the malls. Sapience would rightly aid us to infer this as an unhealthy practice to break free from modern day ennui. All these emanated from the pernicious depression, which like a cancerous disease was engulfing their family.......

A month had elapsed since Amartya settled in Calcutta along with his parents. They were still in a phase of resetting when he received an invitation for the wedding ceremony of his baro-mash's daughter. Damayanti, fondly nicknamed as Doyel by Aparna.

Aparna couldn't believe herself. Was it the same little Doyel who used to pester her for lipstick and other maquillage while Aparna decked herself for college? Doyel never called her mashimoni. She always called her 'Bumba'. That's because Aparna's nickname was Boonta. But at the tender age of two she could hardly pronounce Boonta. And she wouldn't call her mashimoni. Even after she grew up, the way of addressing her still remained the same.

It was during the pre-weeding nupital of aibaro-bhat that Amartya got acquainted with a distant maternal cousin, Sandy, whom he never met before. He was presently studying in a convent school. He was in tenth standard. Aubum dyed hair, buckteeth with braces, fat bracelet-quite saturnalias in disposition as it seemed to Amartya. His father made a good fortune out of his estate consultancy business that nevertheless made him an arrogant youth and a brat. Ruminating his chewing gum quite literally he demanded of Amartya (in the attic)

Sandy "Hey bro, wanna puff?"

Amartya "No thanks."

S –"Come again? You amuse me. Don't you fag? You are in college right? .... Oh, I understand, typical middle class values, your father is a medicial representative, eh?

A – "My father is the CEO of a company. And it ain't about middle class values dude! You gotta know when your lungs evaporate."

Ever since Sandy learnt that Amartya's father is a CEO he started flattering him in a rather servile way which he rather detested. Though they were cousins, they never met before. It was long back he overheard his parents discussing that Ashutosh mesho is a medical representative. He still bore that impression in mind unaware of the statusquo and now he got snubbed because of his superciliousness.

Never before did Amartya speak to anybody in such an impetuous way. He was extremely amicable with his cousins. But he could't endure Sandy's arrogance. He repudiated vanity. He could still recollect those phases of unberable uncertainty when his father was without a job. The companies Ashutosh worked with had collapsed leading to largescale unemployment.

They were compelled to stay in just a two-room apartment of modest means. They couldn't even afford a maid-servant. But Aparna never complained. Amartya's parents sought financial assistance from their 'relatives' but to no avail. They drifted apart and alienated themselves. Ironically they are once more flocked with relatives at Ashutosh's newfond success. Back then Ashutosh never gave in. He was resilient and he fought back. Ashutosh's mother was still alive then.

She was an optimistic lady who inculcated certain noble values in him. They were patience and forgivance. Perhaps that was the reason Ashutosh bore a grudge against their so-called relatives. During this wilderness phase, celebrations for Durga Puja were impending. Impecunious Ashutosh was despondent. Plapably Aparna and his mother were mature adults to have no expectations. But the fact that he couldn't buy new clothes for little Amartya made him sad. At this juncture Ashutosh's mother shelled out money for puja shopping from her fixed deposit account. "Let this puja also be celebrated with equal mirth and gaiety!" she said. Amartya was deeply attached to his thamma. Her recent demise had a lasting impact on his mind.

Amartya could still recollect the ineffable effusions of joy when his father got a job once again. His happiness knew no bounds. He bought sweetmeats, gifts and toys for Amartya. It was a quantum leap for Ashutosh on the careter front. Earlier he had been a medical representative. Now he became one of the regional managers for an MNC. This was also the first time he would get a car, a Maruti 800 as a perk. Amartya could still recollect how excited they were about their first car. They went to the Maruti Greenwheels showroom in Alipore near Kothari Hospital and got their car delivered. First they went to the Kalighat temple to offer their Puja and then on Amartya's pestering they went to famous 'Scoop', ice-cream parlor overlooking the Ganges where he gorged on dollops of sinful banana split. Later they dined in Moulin Rouge restaurant in Park Street.....

The date of bashi-biye coincided with Rabindra-Jayanti. Every year Nava-Nalanda, Amartya's alma mater commermorated the legendary poet's birth anniversary with profound veneration and reverence. Eminent artists would come to recite and sing Tagore songs. Students would enact plays written by Tagore for childern. Amartya decided to skip the ceremony of bashi-biye and attend the school function along with Ashmita, his best friend and classmate hailing from the Nava Nalanda days. Amartya decked himself in traditional outfits. Ashmita came in a sari. They met in Golpark near the Mouchak sweetmeat shop. Amartya was pleasantly surprised to see her wearing a sari for the first time. He felt somewhat coy in paying her a compliment. This was strange for Amartya has always been so frank or open with her. Perhaps it marked a beginning of a new phase in his life the youth, and recognition of feelings of hetero-sexual attraction.

Nevertheless

He mustered up some courage and said, "You look graceful in a sari. "Thanks. That's formidable." replied Ashmita. They took a cab. On their way to Boulevard, they went past Rabindra Sarobar stadium. Amartya fondly reeminiscence old memories.

Amartya – "Do you remember how we danced to 'Aye tobe shohochori" during one of the Rabindra-Jayanti celebrations?"

Ashmita – "Yes, I do. We performed at Rabindra Sarobar. And the outfits were sewn at....."

Amartya – "Stanrose Tailors in Gariahat. Yellow kurta and white pajama for boys and orange salwar with green dupatta for girls."

Ashmita – "Correct!"

Amartya – "How quickly the time passes by!"

Ashmita – "Gather ye rose buds while ye may
Old time is flying!"

"Hitherto thou pass ye Past

Hearding fanciful plays (of Present), yet to last!" Amartya recited to himself. Suddenly it started drizzling. Yet again Amartya embarked himself on the journey down the memory lane. Dirt, grime and squalor, stagnant rainwater mixed fuel of vehicles giving out bluish-yellow hues in the potholes to set sail the paper-boats, smashed flowers conjuring up revolting images; yet how they have become a source of rejuvination. Amartya let out his palm through the cab's window to feel the raindrops.

A few drops fell in his new gold ring. After so many years, (it seemed to Amartya) he went for *hal-khata*. He remembered how they used to go to Senco Jewelery Shop, Gariahat Branch. After *hal-khata* used to eat folls from Bedwin. At first they would board a tram from Lake Market. Single-seats by the window were his favorite. Later they would take another tram from Rashbihari back to their home in Tollygunge. These simple joys were a source of joie de vivre for Amartya.

ঋত্বিক ঘটক ঃ সত্যানুসন্ধান, আত্মিকতা ও 'সুবর্ণরেখা'

দেবল ব্যানার্জী
প্রাক্তন ছাত্র, দর্শন বিভাগ

চলচিত্র সম্পর্কে মত দিতে গিয়ে আন্দ্রেই তারকভ্স্কি বলেছিলেন —"পরিচালক সত্যের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করলে সিনেমায় তার প্রভাব হয় সর্বনাশা, তাই চিত্রগ্রহণে সর্বোচ্চ সত্যতা অর্জনের চেষ্টা আমি করে থাকি।"

সত্যমূল্য নির্ধারণ, সত্যের অনুসন্ধান ইত্যাদি বিবিধ দার্শনিক অবতারণা অনেক ক্ষেত্রেই সিনেমার অগ্রগমনে পথ প্রদর্শন করে এসেছে, বলা বাহুল্য সিনেমার রাজনীতির নির্ধারক উপাদান হিসাবে উপরোক্ত অবতারণাগুলির অবদান ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। 'চিত্র-গ্রহণের সত্যতা' শব্দ যুগলটি তারকভ্স্কি তাঁর দার্শনিক বোধ নিঃসৃত সমাজ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের সাপেক্ষে বিচার করেছেন তাই সত্যতা ও সত্যতা এক্ষেত্রে সমার্থক বলেই অনুমান করা যায়। তবে সত্য, সত্যমূল্য ইত্যাদি আধামূর্ত ধারণাগুলিকে সিনেমার সামনে দাঁড় করানো হয় তবে সে সংক্রান্ত তর্কসাপেক্ষতা সিনেমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। একথা মানতেই হবে যে মূর্ত অভিভাবক সংস্থার উপস্থিতি এবং গঠন ও বিবর্তনের ইতিহাসের কারণে সিনেমা একটি অসত্য এবং ক্ষুদ্র Viewing Angle-কেই প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। ফর্ম, কনটেন্ট এবং টেকনিক এই তিন উপাদানের সহাবস্থানে সিনেমা কখনই ব্যাপ্যতা ও ব্যাপ্তির একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে উঠতে পারেনি, তবে চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার রাজনৈতিক অভিযোজন সত্যানুসন্ধানের পথে সহায়ক হতে পারে। এক্ষেত্রে বিতর্ক থাকলেও ক্ষমতাতন্ত্রের অধীন নিয়ামক সংস্থার দ্বারা প্রদত্ত নিদের্শনামার সাথে বিপ্রতীপ বা বিরোধী অবস্থান রক্ষাকারী কোন বাচনের নির্মাণ ব্যতিরেকে শিল্প বা ভাষাগত কোন মর্যাদা লাভই সিনেমার দ্বারা সম্ভব ছিল না। নির্মাণ হয়েছে, হচ্ছে .... স্বল্প উদাহরণের অন্যতম হল সুবর্ণরেখা। ঋত্বিক ঘটক।

শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট যে আলোচনার বিষয়বস্তু হল 'সুবর্ণরেখা' ও তাঁর পরিচালক। সিনেমাটি যেহেতু লেখকের তুচ্ছ প্রচেষ্টার থেকে মহান তাই প্রাথমিকভাবে সিনেমাটি দেখে ফেলা প্রয়োজন। নিবন্ধে সিনেমাটির কাহিনীরেখ বর্ণনের কোন প্রয়াস লেখকের তরফে আশা না করাই ভাল।

শিল্পের মাধ্যমগত অবস্থান সম্পর্কে প্রায়োগিক মার্কসবাদের সমস্যার কথা ঋত্বিক ঘটক তাঁর 'On The Cultural Front' নামক গবেষণা পত্রে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। শিল্পের মাধ্যমগত স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অবস্থান প্রায়োগিক মার্কসবাদ দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে। সমস্যাটি দর্শনে ন্যকি তার প্রয়োগে তার অসমাধিত বিতর্কে দর্শনের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন ঋত্বিক ঘটক, কিন্তু নিজস্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে বার বার চ্যুত হয়েছেন দর্শন থেকে। সুবর্ণরেখা হল এমনই একটি পবিত্র চ্যুতি। ব্যক্তি ও তার জাতিসত্তা বারবার এসে হাজির হয়েছে ঋত্বিক ঘটকের সিনেমায়, জাতিসত্তা ক্ষমতাতন্ত্রের সাথে, কথোপকথন চালিয়েছে .... বিবরণ দিয়েছেন ঋত্বিক ঘটক। জাতিসত্তা, সংস্কার, পরম্পরা এই তিনের সহাবস্থানে গড়ে ও আঞ্চলিক আত্মিকতা, একটি সাধারণ নির্দেশতন্ত্রের অধীনে থাকলেও নির্মাণগুলি কখনও হয় ক্ষমতাতন্ত্রের অনুবাদ কখনও হয় আঞ্চলিক, সমান্তরাল প্রত্যক্ষের জনক ... হয় প্রান্তের রাজনৈতিক নির্মাণ, ঈশ্বর, সীতা, অভিরাম, রানওয়ে, কালীরূপ বহুরূপী, টিলাঘেরা সুবর্ণরেখা নদী ইত্যাদি সমস্ত রূপক উপকরণ বিষয়বস্তুর অনিবার্যতায় হয়ে ওঠে অভিসারযোগ্য। দেশভাগ, রিফিউজি ক্যাম্প, সামাজিক সঙ্কট ইত্যাদি পূর্বশর্তগুলি কঠোর বাস্তব হলেও কনটেন্ট নিজের নিয়মে সিনেমার ইতিহাসের প্রত্যাশি পথ পরিত্যাগ করে এবড়ো-খেবড়ো অপ্রত্যাশিত বেদনায় ভর করে পৌঁছায় এক মূল্যবোধ গত মিলনাত্মকতায়, বার্গম্যানের দগদগে রক্তিম বাস্তবতা নয়, অরমণযোগ্য ফরাসী সিনেমা নয়, তারকভ্স্কির একান্ত নিবিড় দৃষ্টিপাতের অভ্যাস নয় ঋত্বিক ঘটক পৌঁছে যান তাঁর স্বতন্ত্র Viewing Angle-এ নিজস্ব আত্মিকতার অনেক কাছাকাছি। ইউরোপ তথা চীন, জাপানে যখন চলছে সিনেমার রাজনৈতিক অভিযোজন প্রক্রিয়া সেই সময়েই তৈরী হওয়া সুবর্ণরেখায় আমরা পাই জন্মদাতার জাতিসত্তার ছাপ, জন্মদাতার জল, মাটি, হাওয়ায় নিহিত মহাকাব্যিক রসের স্বাদ। তৈরী হয় এপিক সিনেমা। রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার মত বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন নয় বা শূন্য দশকের কবিতার (২০০০ খ্রীস্টাব্দ পরবর্তী কোনো কোনো লিট্‌ল ম্যাগাজিন তাদের প্রকাশিত কবিতাকে এই নামেই ডেকে থাকেন) সিন্ধুতে বিন্দু দর্শনও নয় কঠোর সমাজ বাস্তবতার অন্তরালে অনিবার্যভাবে নিহিত মহাকাব্যিক বাস্তবতায় ভর করে তৈরী হওয়া এপিক সিনেমা। 'ঈশ্বর' সত্তায় পিতা ও পুত্র, 'সীতা' সত্তায় মাতা ও কন্যা একে অপরের সাথে জায়গা বদল করে নেয় চিরায়তের মাধুর্য বর্ণনের স্বার্থে, মানবিক অনিবার্যতার স্বার্থে। অনিবার্যতা ও মাধুর্য সহাবস্থান করে তাই সীতার নাম হয় 'সীতা', ঈশ্বরের নাম হয় 'ঈশ্বর', ফর্ম ও টেকনিক নিয়ামকের মুঠো থেকে বেরিয়ে আসে, ঘটে রাজনৈতিক অভিযোজন। অভিযোজিত হয় কনটেন্টের সহাবস্থানে, হস্তক্ষেপে, মিথষ্ক্রিয়ায়।

একজন Visual art-এর ছাত্র হিসাবে বলতে পারি 'সুবর্ণ রেখা' তথা ঋত্বিক ঘটকের সমস্ত সিনেমার ক্ষেত্রে চিত্রগ্রহণ একটি গবেষণার বিষয় হতেই পারে কারণ সেক্ষেত্রেও বিশেষভাবে পূর্বোক্ত তথ্যগুলি খাটে ছবির কম্পোজিশন ও আলোর ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ামকের মুঠো থেকে বার করে আনতে পেরেছিলেন।

Visual art-এর ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই পরিসরে সম্ভব নয় কারণ বিশেষ কিছু পূর্বশর্ত ব্যাতিরেকে এরূপ আলোচনা সম্ভব নয়। তবে এক্ষেত্রেও বলা যায় জাতিসত্তা ও পরম্পরায় ভর করেছেন ঋত্বিক ঘটক। দেবীপূজার অভ্যাস, নিকট আত্মীয়দের দেখার অভ্যাস ইত্যাদি নানাবিধ আঞ্চলিক গুণ বার বার এসে হাজির হয়েছে ঋত্বিক ঘটকের Image-এ, Visual-এ। Visual-এ হাজির হয়েছে মুঘল চিত্রকলা, পটচিত্র ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। Cinematography নামক Visual art-এর শাখাটিতে ঋত্বিক ঘটকও হয়ে যান অবন ঠাকুরের মত এক সন্ধিক্ষণের সাক্ষী। আমাদের দেশে চিত্রগ্রহণের স্বতন্ত্র শৈলী গড়ে ওঠা দূরে থাক বিশ্লেষণের ভাষাই গড়ে ওঠে নি। একথা নিশ্চিতভাবে বলে ফেলা যায় যে বেশ কিছু উৎসাহী পাঠক এক্ষেত্রে সময় ও সুযোগের অভাবে অক্ষম দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং বিভ্রান্ত হন সিনেমা বিশ্লেষণের অক্ষম ও ভ্রান্ত উপায় গুলির দ্বারা। ফর্ম, কনটেন্ট, টেকনিক, ঘাম, রক্ত, কল্পনা, বঞ্চনা ইত্যাদি সমস্ত কিছু সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা এবং বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে সিনেমাকে বোঝা সম্ভব নয়।

নীতা জন্মেছিল জগদ্ধাত্রী পূজার দিন। চাইত পাহাড় দেখতে শক্তিপদ রাজগুরুর ইচ্ছায়, এই পবিত্র সমাপতনের সাথে সুবিচার করে ঋত্বিক ঘটক আর্তনাদকে পাহাড়ে প্রতিফলন ঘটিয়ে ফেরত আনতে পেরেছিলেন স্থবিরতার অনেক কাছাকাছি। 'ছিন্নমূল' সীতাকে একদিন চলে যেতে হয়েছিল বেশ্যাপাড়ায় এবং সেখানেই দেখা হয়েছিল পিতৃতুল্য-সন্তানপ্রতিম দাদার সাথে। সীতা তার সন্তানকে শুনিয়েছিল "আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়া ...." দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ঘটিয়েছিলেন অস্থির প্যানিং, তৈরী হয়েছিল ভারতীয় পুরুষের সমর্পণশীল আঁচল পিপাসু Viewing Augle। 'পোস্টমাস্টার' গল্পের পোস্টমাস্টার এবং ক্যামেরা 'Viewing Angle গত ভাবে এক হয়ে গিয়েছিল। এই সমস্ত কিছুর পরেও চলচ্চিত্র কম হয়ে যায়, নিয়ামকের ভাষায় বলতে পারি Screen text-এ মানুষ, নবজাতক ও চিরজীবিতের 'জয়' ঘোষণা করতে হয়, আর অভিযোজন সম্ভব হয় না ফর্ম ও টেকনিকের তবু এই 'জয়ের' অনিবার্যতা শিল্পীকে দিয়ে এমন কাজ করিয়ে নেয় নিয়ামকের মতানুসারে Non-cinematic।

সত্য নিহিত থাকে বাস্তবতায়, স্বাভাবিকতায়, সংস্কার ও পরম্পরার পবিত্র পিঠে, নারী-পুরুষ বাবা-মা, ভাই-বোন ইত্যাদি সহাবস্থান গুলির স্বাভাবিক অনিবার্যতায় নিহিত থাকে ঐ সম্পর্কগুলির মানবিক সত্যমূল্য। পুরো 'সুবর্ণরেখা' জুড়ে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ-র সুনিপুণ সঙ্গীত সঙ্গতের পর ছবির শেষপ্রান্তে এসে আবার শোনা যায় "আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়া ....". সুবর্ণরেখার পাথুরে তটে, বিনুর গলায়, পবিত্র বেসুরে (শব্দ চয়নটি কবীর সুমনের)। ঐ পবিত্র বেসুরে নিহিত থাকে জীবনের স্বাভাবিক দ্বান্দিক সত্যতা। শ্রেণী দ্বন্দ্ব ও তার সমাজ-মানসিক দোলাচল এবং জাতিসত্তা ও পরম্পরার অমোঘ ছায়া তদুপরি উভয়ের কথোপকথন 'সুবর্ণরেখাকে' একটি মূর্ত সত্তা রূপে Project করে ফেলে। বাসনা, কামনা, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তির ইত্যাদি সমস্ত কিছুর মূর্ত Projection হয়ে যায় সুবর্ণরেখা, কঠোর কঠিন বাস্তব থেকে জয়ধ্বনির সত্যসংবেদী পবিত্র 'অবাস্তবতা' এই দুই-এর মধ্যে চলাচল করে সিনেমার ফর্ম, কনটেন্ট ও টেকনিক, জীবনের অনিবার্য যাত্রা মহত্ত্বর হয়ে ওঠে সিনেমার থেকে। সাপেক্ষ সত্যের স্বরূপ বর্ণন থেকে শুরু হয় সত্যানুসন্ধানের পথ। মিলনাত্মক অনিবার্যতার খোঁজ ও সত্যানুসন্ধানের প্রক্রিয়া কখনও একে অপরের সাথে কথোপকথন চালায় কখনও একাত্ম হয়ে ওঠে, 'সীতার' নাম হয় সীতা, 'ঈশ্বর' ব্রহ্মচারী হয় ....

ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন "চির ব্রহ্মচারী 'ঈশ্বর' বেশ্যাপাড়ায় গিয়ে যাকেই দেখত সেই সীতা হত। আমি নেহাত সীতার জায়গায় 'সীতা' কে দেখিয়েছি....". সত্য অনুসন্ধানকারী শিল্পী ঈশ্বরকে ব্রহ্মচারী রাখেন। সীতাকে বেশ্যাপাড়ায় পাঠান, মদ্যপ ব্রহ্মচারীর কৌমার্য রক্ষা করেন সীতার সাক্ষাৎ সৃষ্টি করে। তৈরী হয় এপিক সিনেমা, তাই ঈশ্বরের ব্রহ্মচর্যই সত্য এবং যা সত্য তা অনিবার্যও বটে।

বাজে গল্প

অভিজিত ঘোষ
প্রাক্তন ছাত্র, ভূগোল বিভাগ

গোটা পনের ঝিকমিক করতে থাকা তারার সঙ্গে সরু একফালি চাঁদটা জানালা দিয়ে চুপি চুপি উঁকি মারছে। আবছা অন্ধকার আকাশের পটভূমিতে কদমগাছের আলতো নড়তে থাকা পাতাগুলো বড় কালো রহস্যময় দেখাচ্ছে। দূরে, হাটতলার দিকটাতে বুনো ঝোপঝাড়ে জোনাকির দল যেন টর্চলাইট জ্বেলে কিছু খুঁজছে। নিঝুম, নিশুত রাত! ঝিঁঝি পোঁকার একঘেয়ে, বিরক্তিকর ডাকটাও যেন বড্ড মিষ্টি লাগছে! সে এক অপার্থিব অনুভূতি! বললে বিশ্বাস করবি না, আমারই কেমন যেন কবিতা পাচ্ছিল! হাতে খাতা কলম থাকলে, আর এমন একটা টাটকা ভয়ঙ্কর বিপদে না পড়লে হয়ত লিখেই ফেলতাম—

"গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে গরজে গগনে
মেঘলা আকাশে তারকার রাশি
রামগরুড়ের ছানার হাসি
হাটতলার ওই ঝোপে-ঝাড়ে দেখ
জোনাকি জ্বলিছে সঘনে—"

যদিও চত্তিরমাস চলছে, তবুও কেন জানি না, কবিতা লিখতে গেলেই বৃষ্টি বাদলার ব্যাপার চলে আসে — "মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী, ময়ূর নাচত মাতিয়া—" কী নাম হত কবিতাটার? 'শেষ কবিতা'? হুঁ, শেষই বটে! আর কী কোনওদিন ওই — যাঃ কী যেন বলে! হ্যাঁ — ওই নক্ষত্রখচিত আকাশ আর জোনাকিখচিত বুনোঝোপ দেখতে পাবো? শুনতে পাবো ঝিঁঝিঁ পোকার ফোক্ সঙ্? আবার কী কখনও — "ঘ্যাঁ–অ্যাঁ–হুঁ–উঁ–ম্‌ম্"!!

বাঃ, বেশ একটা, কী বলে — হ্যাঁ, একটা তদ্‌গত ভাব এসেছিল, দিল মাটি করে! কে চ্যাঁচায় অমন বিকটভাবে? আবার সেই "ঘ্যাঁ--অ্যাঁও..... হু-উ-ম্।।" ওরে বাবা, দাদুরী-টাদুরী নয়তো? দাদুরী জিনিসটা ঠিক কী আমি জানি না, কিন্তু সে যে বেশ একটা বিভীষণ ব্যাপার হবে, তাতে আমার কোনওদিনই সন্দেহ ছিল না। যাক্‌গে, কিন্তু সে তো বর্ষার কবিতায় পাওয়া-টাওয়া যায়। এই চত্তির মাসে — আবার সেই "ঘ্যাঁ-হুউম্!!" তবে কী কদমগাছের মাথায় প্যাঁচায় চ্যাঁচাচ্ছে? কী গেড়োয় পড়া গেল, নিমপ্যাঁচা নয়তো — আমারে কুড়ায়ে নেবে, সেই গেছো ইঁদুর নাকি কুচো ইঁদুরের মতো মরণের ঘরে? বাপ্‌রে, কোথায় লুকোই খাটের তলায়? পাগল না নেপাল পুলিশ!! শেষকালে আবার—

না, ব্যাপারটা তোকে গোড়া থেকেই বলি তাহলে। জানিস তো সেই কুম্ভকর্ণ না ঘটোৎকচ, কে যেন গীতায় বলেছিল — "মা ফলেষু কদাচন" — কাজ করে যাও, ফলের আশা কোরো না! সেই মন্ত্রই জপ্ করতে করতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাটা কোনওরকমে উৎরে দিয়েছি। বলটা হায়ার সেকেণ্ডারী কাউন্সিলের কোর্টে ঠেলে দিয়েই সোজা হাওড়া-মোকামা প্যাসেঞ্জার! টানা তিনটে মাস ছুটি আছে। কলকাতার ধোঁয়া-ধুলো, প্যাঁপো-ঘ্যাঁঘোঁ থেকে অনেক দূরে, আরও অনেক বেশি দূর সম্পর্কের এক কাকার বাড়িতে। জায়গাটা আসানসোল ঝাঝা লাইনে, জসীডিহর আগের স্টেশন — কুমড়াবাদ রোহিনী। কুমড়ো-টুমড়ো যে সেখানে খুব পাওয়া যায়, তা অবশ্য একেবারেই নয়। যাইহোক, পল্লীগ্রামে, যাকে বলে বিশুদ্ধ সমীরণ-টমীরণ সেবন করে, দিনকতক স্রেফ ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়িয়ে, কাকার আদরে মোটাসোটা হয়ে তবেই কলকাতায় ফিরবো — এই ছিল মৎলব। তা আপাতত একমাসও হয়নি। পরশু সোদপুরের সিধেকে ফোন করেছিলাম। ব্যাটা ফোনের মধ্যেই শুরু করলো "একমাস হয়ে গেল, আর কবে ফিরবি? ..... সবাই পড়াশুনা শুরু করে দিল .... কত বড় বড় সিলেবাস .... ম্যাথ্‌স .... ফিজিক্স —" না, হতভাগাটা আর মানুষ হল না! স্রেফ বাজে কথাগুলো বকে আমার বেয়াল্লিশ টাকা বত্রিশ পয়সা এস.টি.ডি-র বিল তুলে দিল। বেয়াল্লিশ টাকা মানে বুঝিস্! তখনকার বাজারে একশো সাতাশটা জিলিপি! চাইলে গোটা তিনেক ফাউও দিত হয়তো—

মরুকগে! আপাতত মাসদেড়েক এখান থেকে তাঁবু গোটানোর কোনও প্ল্যান নেই। বিশেষতঃ মাইল দশেকের মধ্যে বাবা বৈদ্যনাথ শিবের বড়সড় ঘাঁটি। রেজাল্টের আগ দিয়ে একবার সেখানে জল ঢালা — ঘন্টা নাড়া — ঢিল ঝোলানো — এসব বিশেষ প্রয়োজন। তার উপর এমন দিব্যি জায়গা! দূষণ-টুষণ নেই, ত্রিকোণমিতি নেই, ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি কিচ্ছুটি নেই! সারাদিন কাজ বলতে খাওয়া, বল পেটানো আর সাইকেলে চক্কর কাটা। সেদিন সন্ধ্যেবেলাও লুকোচুরি খেলার প্ল্যানটা আমারই ছিল। গত কয়েকদিনে গাঁয়ের অনেক ছেলেপুলের সঙ্গেই ভাব জমিয়ে ফেলেছি। যাইহোক, পাড়াগাঁয়ে সাড়ে সাতটা মানে বেশ রাত্রিই। তাও আবার লোডশেডিং। সেই অন্ধকারেই শুরু হল আমাদের 'আস্‌পাস্' আর 'ধাপ্‌পা'। লুকোচুরি খেলার সময় চোর কাউকে দেখতে পেলে তার নাম বলে 'আস্‌পাস্' বলাটা ওদেশের রীতি, বাংলাদেশের যেমন 'পঞ্চাশ' বা 'হুস্' বলা হয়। যাইহোক, আমিও কয়েকবার আস্‌পাস্ হয়ে গেলাম। চোর হয়ে একবার সবাইকে আস্‌পাস্ করেও দিলাম। আর 'ধাপ্‌পা' দিতে তো আমি চিরকালই বেশ মজবুত। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ধাপ্পাবাজিকা' বলে একটা বই পর্যন্ত লিখতে শুরু করেছিলাম একসময়—

খেলা তখন পুরোদমে চলছে — স্লগ ওভার যাকে বলে। কে যেন একটা চোর হয়ে আস্‌পাস্ করে বেড়াচ্ছে। ধাপ্পা দেওয়ার ছক করে বেশ ঘাপটি মেরে বসেছিলাম আমার ছোট্ট ঘরে, খাটের

তলায়। হঠাৎ বাঁ পায়ে গোড়ালির পেছনদিকটায় কুট্ করে কী একটা ফুটল। বেশ জ্বালা করছিল বটে, তবে আস্পাস্ আর ধাপ্পার উত্তেজনায় সেটাকে মোটেই পাত্তা দিলাম না। গোল বাধলো রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার শেষে হাত-মুখ ধুতে গিয়ে। বাঁ পায়ের গোড়ালির পেছনটায় খানিকটা জায়গা রক্ত আর ধূলোময়লা একসাথে জমাট বেঁধে কালো হয়ে আছে। সেটা জল দিয়ে ভালোমতো পরিষ্কার করতেই বুকটা ধড়াস্ করে উঠল—

ছোট্ট দুটো ফুট্কির মত দাগ পাশাপাশি — অনেকটা 'কোলন' চিহ্নের মত। দাগটা যে সাপে কাটার সেটা বেশ বুঝতে পারলাম। তবে কোলনটা কতক্ষণে আমার জীবনে ফুলস্টপ বসিয়ে দেবে, সেটাই আপাতত ভাববার ব্যাপার। সেমিকোলন এতক্ষণে নিশ্চয়ই পড়ে গেছে। যাইহোক, বাড়ির লোকজনকে এখন আর কিছু জানিয়ে লাভ নেই, মরতে যখন হবেই—

আমি মারা গেলে জগতের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখছি না। বাড়ির সবাই অবশ্য খুব কান্নাকাটি করবে, ইস্কুলে একদিন ছুটি দেবে, আর হয়তো দু'মিনিট নীরবতা পালন! যাই হোক, সেই শঙ্করাচার্য না বিদ্যাসাগর কে যেন বলেছিলেন—" জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা হবে—" এ জগতে কে কার! ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা! এ সংসারের মায়াজালে — মায়াজালে, ... যাঃ কী বলে ভুলে গেলাম! মরুকগে, মোদ্দা কথা হল, এইসব কঠিন কঠিন তত্ত্ব মনে মনে আলোচনা করতে করতে, আর এই সুন্দর গ্রাম্য রাত্রিটাকে শেষবারের মত উপভোগ করতে করতে পঞ্চত্বের অপেক্ষায় সেই ছোট্ট ঘরটায় অভিশপ্ত সেই খাটের উপর লম্বা হয়ে আছি। সেই ইঁদুর-কুদুনি নিমপ্যাঁচাটা অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ করছে না। ডানহাতটা মশারির গায়ে ঠেকে গেছিল, মশাগুলো গেরিলা কায়দায় অ্যাটাক করল। করুকগে, জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো এভাবে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করে — মানে, যাকে বলে 'বহুজন হিতায় বহুজনসুখায় চ'! বেশ তন্দ্রামতো এসেছিল, প্যাঁচাটা বিচ্ছিরিভাবে চেঁচিয়ে তার বারোটা বাজাল। চেয়ে দেখি অবাক কাণ্ড—

বিশাল বড় এক ফটকের সামনে আরও বিশাল এক লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ঠেলাঠেলি করছি। ঠিক যেন ইস্কুলের অ্যাড্মিশন ফর্মের লাইন, কিম্বা দুর্ভিক্ষের খিচুড়ির লাইন! পাশে একটা বড় হোর্ডিংয়ে অনেকগুলো কচি পটোলের ছবি আঁকা, তলায় লেখা — 'পটল — তুলুন ও তোলান'। চারপাশে আরও অনেক ব্যানার-ফেস্টুন — "নতুন কমরেডদের পটলডাঙায় সংগ্রামী অভিনন্দন ও লাল সেলাম" ইত্যাদি ইত্যাদি! ভাবুক টাইপের এক লালমুখো সাহেব ওপাশে ছোট্ট একটা নৌকায় বসে বালির মধ্যেই বৈঠা মারছে। তার গলায় ঝোলানো একটা ভাঙা স্লেট, তাতে খড়ি দিয়ে লেখা — 'টেনিসন'। সে আমার কাছে এসে করুণমুখে বলল, "বুঝলে হে, বার্ খেয়ে তো চলে এলাম, কিন্তু এই বার্টা ক্রস করা বড্ড কঠিন!" বলেই খ্যা খ্যা করে বিশ্রীভাবে হাসতে লাগল। আমিও বেশ করে মুখটা ভেংচে দিলাম।

লাইনটা বেশ তাড়াতাড়িই এগোচ্ছে। আমার পালা এলে সবার দেখাদেখি আমিও কলিংবেলটা টিপলাম। ছোট্ট জানালাটা দিয়ে চশ্মাপরা, পাকাদাড়ি এক বুড়ো মুখ বাড়ালো — "কত নম্বর? ভিসা কই?" যাব্বাবা, নম্বর আবার কার! ভিসাই বা কীসের? বুড়ো আবার খেঁকিয়ে উঠল, "কত নম্বর বললে না?" আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল— "মা খু চিহ্ল ও পঞ্জম হস্তম্ — আমি তো পয়াঁতাল্লিশ নম্বরের!" বুড়োটা চটে উঠল "থাক্, আর বিদ্যে ফলাতে হবে না, ভিসা দাও—" পকেট হাতড়ে মানস্থলি-টা ছাড়া আর কিছু পেলাম না। অগত্যা সেটাই বুড়োর হাতে ধরিয়ে দিলাম। আর দিতেই—"অ্যাঁ, চিত্রগুপ্তের সঙ্গে এয়ার্কি! আমি শেয়ালদা স্টেশনের মামা! ভাগো হিয়াঁসে—"

কোথায় ভাগবো, সেটাই ভাবছি, হঠাৎ লাইনের পেছন থেকে একপাল মশা একসাথে বিনবিনিয়ে উঠল — "ছেঁড়োনি গোঁ, ওঁ বেঁটারে ছেঁড়োনি, জ্যালেঁ ভঁইরেঁ দ্যাঁও। ব্যাঁটা মোঁদের ফুঁড পয়জঁনিং কঁইরেঁ — ভ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ .... ওঁ দঁরোয়াঁনজীঁ গোঁ-ওঁ-" এটুকু শুনেই বুড়ো লাফিয়ে উঠল। ফটকটা খুলে, খেরো-বাঁধানো ইয়া মোটা একটা রেজিস্টার খাতা নিয়ে তেড়ে এল — "কী! এতবড় আসপদ্দা? আমি দারোয়ান!" ব্যস্, নিমেষে চতুর্দিক ফর্সা! সাহেবটা পর্যন্ত নৌকো ফেলে কোথায় পিঠ্টান দিল। আর আমায় সামনে পেয়ে বুড়ো আমার মাথাতেই ধাঁই করে এক খাতার বারি বসিয়ে দিল—

কী জব্বর খাতা মাইরি! এক বারিতে আমি আবার বিছানায় ফেরৎ চলে এলাম। গোটা ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে যা বুঝলাম, নিশ্চিত মারা গেছি। ভিসার অভাবে পরলোকে জায়গা হয়নি — ভূত হয়ে ঘুরছি! ভাবতেই বুকটা কেমন ধড়াস্ করে উঠল! বেঁচে থাকলে নির্ঘাৎ হার্টফেল করতাম। ইস্, এভাবে বেঘোরে মারা গেলাম! সাপটাকে একবার পেলে তার ঘাড় মট্কে — হুঁ হুঁ বাবা, ঘাড় মটকানোটা আমার মৃত্যুসিদ্ধ অধিকার! একবার ভাবলাম, ভুতুড়ে স্মৃতিটা হাত্ড়ে একটা লিস্টি বানাই — কাদের ওপর রাগটাগ আছে! তারপর — ঝট্পট্ অ্যাক্শান্! কিন্তু আশেপাশে একটাও ভূতের টিকি দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য ভূতেদের টিকি থাকে কি না আমি এখনো জানি না — কিন্তু একটা পুরনো ভূত পেলে একটু ভুতুড়ে জগতের রীতিনীতিগুলো জেনে নেওয়া যেত। তাছাড়া, নিজের বেরাদরির লোক পেলে মেজাজটাও বেশ খুশ হয়ে যেত আরকি—

কিন্তু মশাগুলো কী নিলর্জ্জরে বাবা! একটু আগে ফুড পয়জনিং-য়ের অ্যালিগেশান আনছিল, এখন আবার কামড়াচ্ছে! ভূত বলে কি মানুষ নই! যাইহোক, চারপাশ বেশ ফরসা হয়ে এল। উষাকাল! জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি রামকির্পাল সিং আর জনদিন তেওয়ারী দাঁতন মুখে, লোটা হাতে ক্ষেতের দিকে চলেছে। রামকির্পাল বড্ড বিচ্ছিরি লোক। গত একমাসে রোজ নিয়ম করে তিনবার তার সাথে আমার ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে। অনেক রাগ জমে আছে। নেহাৎ ভৌতিক জগতের 'কোড অব্ কন্ডাক্ট'-টা এখনও রপ্ত করা হয়নি,

নয়তো রামকির্‌পালের ঘাড়টা দিয়েই বউনি করা যেত। হঠাৎ দেখি সদর দরজা দিয়ে পাশের বাড়ির জগদীশ চেঁচাতে চেঁচাতে ঢুকছে, "পেনোদা— আরে ও পেনোদা — আভিতক্ সুতলে বা—? পউনে পাঁচ বাজ গইলিয় —" ইস্! আজ ভোরে ফুটবল খেলার কথা আছে, মানে ছিল! বেচারা জগুয়া এখনো জানে না আমি মারা গেছি। ডেডবডি দেখলে বুঝতে পারবে। খুব কান্নাকাটিও — কিন্তু আমার ডেডবডিটা কোথায় গেল? খাটে নেই, আশেপাশেও নেই খাটের তলায় — সেটাও টুঁনে ফেলালাম, কিন্তু নাঃ। তবে কি একরাতের মধ্যে পাচার হয়ে গেল? খাটের তলা থেকে বেরোতেই দেখি জানালায় জগুয়ার কাজলকালো মুখ, তাতে হলদে হাসি "ভোরে ভোরে খটিয়া কে নীচে কি করৈছি — আরে ও পেনোদা — আব জল্‌দি সে নিকাল বা নি—"

সে কী! জগুয়া আমায় দেখতে পাচ্ছে! তেমন তো কথা ছিল না! আমি এতদিন বেঁচে থাকতে একটাও ভূত দেখতে পাইনি! তবে কি এখনো মরিনি? নিজের গায়ে একটা চিমটি কেটে চমকে উঠলাম্ — ভূতের গায়ে কী চিমটি লাগে? আর ডেডবডিও যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আইনের হিসাবেও আমি জ্যান্তই আছি! ওঃ কী বিভীষণ রকমের আনন্দ যে আমার হচ্ছিল, বললে বিশ্বাস করবি না—

"করব না ই তো! তোমার এতক্ষণের একটা কথাও বিশ্বাস করি না! সব ভাঁট!" আমি এতক্ষণে প্রথম মুখ খুললাম।

পেনোদা বেশ উৎসাহ নিয়ে এতক্ষণ গল্প বলছিল। আমার কথা শুনে কেমন উদাস হয়ে পাশে ঘাস চিবোতে থাকা ছাগলটার গায়ে হাত বোলাতে লাগল!

শান্তিবাদী আইনস্টাইন

সঞ্জয় কুমার দে
মলিকুমার বায়োলজি এণ্ড জেনেটিক্স

সভ্যতার আদিমযুগ থেকে আজকের উন্নয়নশীল পৃথিবীসৃষ্টির মুহূর্ত পর্যন্ত আবির্ভূত সমস্ত শান্তিবাদী মনীষীদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। তিনি পৃথিবীতে শান্তি চাইতেন শুধু একজন বুদ্ধিজীবীর মতবাদের জন্য নয়, মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা ও ঘৃণা দেখলে কিংবা শুনলেই তাঁর মন বেদনার্দ্র হয়ে উঠত। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষার জন্যে 1919 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জাতিসঙ্ঘে আইনস্টাইন 1922 খ্রিস্টাব্দে যোগদান করেন এবং সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামীর মনোবৃত্তি দূর করতে বিজ্ঞানকেই একমাত্র হাতিয়ার করে তুলতে সচেষ্ট হন। একজন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীর বিশ্বশান্তি আন্দোলনে যোগ দেওয়ার এটা ছিল সূচনা। এরপর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সারাবিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন।

1879 খ্রিস্টাব্দের 14ই মার্চ জার্মানির উল্ম (Ulm) শহরে জন্ম নিয়েছিলেন শান্তির দূত অ্যালবার্ট। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন শান্ত ও সংযত। যুদ্ধের বাজনা ও তার তালে তালে সৈন্যদের মার্চ করে যাওয়া তাঁর মনে শৈশবকাল থেকেই ভীতির সঞ্চার করত। এই অনুভূতিই ভবিষ্যতে তাঁকে একজন বড়মাপের শান্তিবাদী (Pacifist) করে তুলেছিল, যার জন্য তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই রোমা রোঁলা প্রমুখ বিখ্যাত শান্তিবাদী মনিষীদের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়তে চেয়েছিলেন। 1896 খ্রিস্টাব্দে জুরিখে পলিটেকনিক কলেজে পড়ার সময় থেকেই আইনস্টাইনের মনে ইচ্ছে জাগে 'বিশ্ব নাগরিক' হবার। পৃথিবীর সবাই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এক পৃথিবীর নাগরিক। স্বদেশভিত্তির অথবা জাতীয়তাবাদের কোন মানে নেই, দুই-ই অবান্তর ও হাস্যকর, তাই "One World Government" বা "এক বিশ্ব সরকার"-এর প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অনেক পরিকল্পনা করতে থাকেন এবং এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধও লেখেন।

আইনস্টাইন সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ, উৎকট স্বদেশভক্তির ও দেশজয়ের জন্য যুদ্ধের উন্মত্ততাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "The World as I see it" — এ তিনি লিখেছিলেন — "চারজন চারজন করে শ্রেণীবদ্ধ প্রতিটি ফৌজের স্নায়ুপীড়ক ব্যাণ্ডের বাজনার তালে তালে একজন লোক কুচকাওয়াজ করে যেতে আনন্দ পায় শুনলেই তার প্রতি আমার ঘৃণা হয়, ভুল করে তাকে একটি বড় মগজ দেওয়া হয়েছে; একটি মেরুদণ্ডই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সভ্যতার এই দূষিত অংশ যথাসম্ভব সত্বর দূর করে দেওয়া উচিত। স্বদেশভক্তির নামে এই যে ফরমাসী বীরত্ব, অর্থহীন হিংসা এবং সবরকমের মারাত্মক নির্বুদ্ধিতা এইসবকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি।" এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই আইনস্টাইন জার্মান জাতির রণ-উন্মাদনার সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে তিনি সেই জার্মান নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন, যে জার্মান জাতির অহমিকা ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদই ছিল বিধ্বংসী দুই বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক কারণ।

1919 খ্রিস্টাব্দে আপেক্ষিকতাবাদের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনস্টাইনের খ্যাতি পৃথিবীময় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে লিওপোল্ড ইনকেল্ড তাঁর 'Quest' নামক আত্মজীবনীতে সুন্দর যুক্তি দেখিয়েছেন — "এই পরীক্ষা নিরীক্ষাটি হল ঠিক বিশ্বযুদ্ধের শেষ হবার সঙ্গেই। পৃথিবীর মানুষের মন এই নারকীয় যুদ্ধে ঘৃণা, মৃত্যু, অত্যাচার, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ইত্যাদির বীভৎসতা দেখে এই বাস্তবজীবনের সৌন্দর্য, মাধুর্য ইত্যাদি ধারণা হারিয়ে ফেলেছিল, মন হয়েছিল অত্যন্ত তিক্ত ও দুঃখবাদী। প্রত্যেকেই যুদ্ধের বীভৎসতা মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করছিল আর শান্তির নূতন যুগের আবির্ভাবের জন্য ব্যগ্র প্রতিক্ষায় ছিল .....।" ইনফেল্ড আরও লিখলেন, "আইনস্টাইনের এই দ্রুত খ্যাতিলাভের কারণ বোধ হয় এই যে, একজন জার্মান বিজ্ঞানীর মতবাদ ইংরেজ জ্যোতির্বেত্তারা সত্য বলে প্রমাণ করেছেন। এতে মানুষ মনে শান্তিলাভ করল যে, বিজ্ঞানে শত্রুমিত্র নেই এবং মানুষের মনে আশা হল শান্তির নূতন যুগের আবির্ভাবের।"

ঐ বছরই প্যারিসে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে ও ভার্সাই সন্ধিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি মিত্রপক্ষের সমবেত রাজনীতিজ্ঞগণ জার্মানির সামরিক শক্তিকে ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু, এইখানেই তাঁদের বিচারে বেশ কিছুটা উদারতা, ন্যায় এবং দূরদৃষ্টির অভাব দেখা যায়। এমনকি শান্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত জাতিসঙ্ঘের নীতি দিয়ে বিচার করলে জার্মানির প্রতি কিছুটা অন্যায় করা হয়েছিল স্বীকার করতে হবে। যার জন্য মাত্র কুড়ি বছরের ভিতরে 1939 খ্রীস্টাব্দের 1লা সেপ্টেম্বর জার্মানির পোল্যাণ্ড আক্রমণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করল। এদিকে 1921 খ্রিস্টাব্দে আইনস্টাইন দম্পতি বার্লিনে ফিরে এলে, আমেরিকা ও অন্যান্য জায়গায় তাঁর অপরিমেয় সমাদরে ঈর্ষান্বিত হলেন কয়েকজন জার্মান বিজ্ঞানী। একই সময়ে জার্মানির জনগণকে গতযুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে উত্তেজিত করতে কয়েকজন উদ্ধত প্রকৃতির যুবক একটি প্রচারপত্রে জনগণকে সই করাতে লাগল। আইনস্টাইন দেখলেন যে, ঐ প্রচারপত্রে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর নামও আছে। তিনি এতে প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়ে বললেন, "আমি এই আন্দোলনে যোগ দেবার চেয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে মৃত্যুবরণকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।" এর

পরেই তিনি শান্তিবাদী আন্দোলন গঠনের উদ্দেশ্যে অধিকতর শক্তি নিয়োজিত করে মানবকল্যাণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেখে একজন জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি যে বিজ্ঞানের চিন্তা ছেড়ে মানুষের কল্যাণের জন্য চিন্তা করছেন, এতে কি বিজ্ঞানের ক্ষতি হচ্ছে না?" আইনস্টাইন উত্তর দিলেন, "পৃথিবীর সর্বত্র এখন নানারূপ আন্দোলন হচ্ছে, নানা বিষয়ের জাগরণ হচ্ছে। এই সময়ে আমরা স্বতন্ত্র বা এককভাবে নিজের মতে যদি চলি, তবে সেটি ঠিক হবে না। এখন সময় এসেছে সমস্ত জাতির একত্রিত হয়ে মানুষের নানাবিধ সমস্যা সমাধান করবার।"

1930 সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (non-violent non cooperation movement) আইনস্টাইনকে অতিরিক্ত মাত্রায় বিস্মিত করেছিল। তিনি নিজেও মনে প্রাণে শান্তিকামী ছিলেন বলে মৃত্যু, কারাবরণ, নানারূপ নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার সহ্য করেও ভারতীয়রা গান্ধীজীর প্রেরণায় ও তাঁর নেতৃত্বে বছরের পর বছর এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে দেখে তাঁর গান্ধীজীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। প্রিন্সটনে তাঁর লেখাপড়া করবার ঘরে টেবিলে থাকত গান্ধীজীর ফটো। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য গান্ধীজীর অহিংস নীতিকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে বলেন।

আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত "Special theory of relativity" আবিষ্কার করেন 1905 খ্রিস্টাব্দে যা থেকে তিনি $E = mc^2$, অর্থাৎ কোন বস্তুর ভর m কে আলোর বেগ C-এর বর্গ দিয়ে গুণ করলে তার তুল্য পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় — এই অনুসিদ্ধান্তটি বের করেছিলেন। এই অনুসিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে তৈরী হওয়া পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় আমেরিকা — হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে। এই বিস্ফোরণে লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীর নিহত ও আহত হওয়ার খবর পেয়ে গভীর মনস্তাপ ও আত্মগ্লানি হয়, যার জন্য বেশ কয়েকমাস তিনি বাড়ি থেকে বের হতেন না এবং তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছিল নিজেকে এর জন্য দায়ী ভেবে। তিনি গভীর দুঃখে বলেছিলেন যে, আবার যদি নূতন করে জীবন শুরু করা সম্ভব হত, তবে তিনি বিজ্ঞানের সাধনা না করে মিস্ত্রী বা ছুতোর হতেন। এই বিস্ফোরণের পরেই জাপান সরকার শান্তি স্থাপনের জন্য রাজী হলেন (10ই আগষ্ট, 1945) এবং ২রা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

1950 খ্রিস্টাব্দে একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিবিরোধী এবং যুদ্ধবাদী নীতির কঠোর সমালোচনা করে আইনস্টাইন বললেন, "এই রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির প্রতিটি বিষয়ের একটি মাত্র লক্ষ্য ঃ যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের চেয়ে সব বিষয়ে সৈন্য পরিচালনার সুবিধার জন্য পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজনীয় স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন। সম্ভাব্য ক্ষমতাবান ও কার্যকর মিত্রপক্ষকে সামরিক সম্ভার দিয়েও আর্থিক সাহায্যে আরও শক্তিশালী করা, আর দেশের অভ্যন্তরে সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয়ের ক্ষমতা দেওয়া; যুবকদের সামরিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন করা; ....."

তাই হিরোশিমা ও নাগাসাকির মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর তিনি স্থির করলেন যে, পৃথিবীর মানুষকে বোঝাতে হবে পারমাণবিক শক্তি শুধু ধ্বংসই করে না, মানুষের অশেষ কল্যাণও করে; আর সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আবেদন করতে হবে যে, এই শক্তির ধ্বাংসাত্মক ক্ষমতাকে কেউ যেন যথেচ্ছ ব্যবহার না করে আয়ত্তে রাখে।

অর্থাৎ— "It stands to the everlasting credit of science that by acting on the human mind it has overcome man's insecurity before himself and before nature."

তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিজ্ঞানীদের ও চিকিৎসকদের সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করলেন পরমাণুর শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের বিষয়টি। তাঁদের আলোচনার ফলস্বরূপ, কাগজে-কাগজে প্রকাশিত হতে থাকল—

তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের ব্যবহার গলগণ্ড রোগ নিরাময় করতে পারে;

নিউট্রন রশ্মি ক্যান্সার রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়,

পরমাণু শরীরের হাড়ের ক্ষয় প্রতিরোধ করে।

পারমাণবিক চুল্লীতে নানারূপ পদার্থের আইসোটোপ

তৈরি হয়, সেগুলি চিকিৎসা ছাড়াও অধিকতর ফসল ফলাতে সাহায্য করে;

পারমাণবিক চুল্লীর তাপ-বিদ্যুৎ জন্মানোর কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ায় পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা বানাবার প্রতিযোগিতা দেখে আইনস্টাইন খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছিলেন, "মানুষের দ্বারা সৃষ্ট এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা দূর করবার কি কোন পথ আছে? আমাদের সবাইয়ের, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও সোভিয়েত রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, আমরা একটি বাইরের শত্রুকে পরাজিত করলেও, যুদ্ধের জন্য সৃষ্ট মানবতাকে দূর করতে পারিনি, যতদিন পর্যন্ত ভবিষ্যৎ সংগ্রামের কথা মনে রেখে প্রতিটি কাজ করা হবে, ততদিন কখনও স্থায়ী শান্তি পাওয়া যাবে না। শান্তপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য চাই সব রাষ্ট্রের আন্তরিক সহযোগিতা।"

অর্থাৎ— "Peace cannot be kept by force

It can only be achieved by understanding."

তিনি প্রস্তাব দেন, "একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করবার, যার হাতে থাকবে সমস্ত পৃথিবীর প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা, তাহলে পৃথিবীর মানুষের কিছুটা নিরাপত্তার ভাব আসবে। এই সংস্থাকে বলা যেতে পারে "Supra national Organisation" অথবা "Restricted World Government"

(সীমিত বিশ্ব সরকার)।

বর্তমান পৃথিবীতে শান্তির অভাব হওয়ার মূল কারণ তাঁর মতে, আমরা ভুলে গেছি যে, আমাদের অন্তর ও বাহির দুটি জীবনই নির্ভর করে জীবিত ও মৃত বহু মানুষের শ্রমের উপর এবং আমাদেরকে যে, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে, আমরা অপরের থেকে যতটা পেয়েছি এবং এখনও পাচ্ছি; ঠিক ততটা পরিমাণেই আমাদেরকেও অপরকে দিতে হবে — এই ন্যূনতম কর্তব্যবোধটারও অবলুপ্তি ঘটেছে। পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক অরাজকতা বর্তমানকালে যেভাবে বিদ্যমান, আইনস্টাইনের মতে সেটিই হল সব অনিষ্টের মূল। তিনি পুঁজিবাদকে ভীষণভাবে ঘৃণা করতেন, কারণ "পুঁজিবাদের সবচেয়ে ক্ষতিকর ফল হল মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্ভাবনাকে পঙ্গু করে দেওয়া। আমাদের সব শিক্ষাপদ্ধতিতে বেশিরভাগ ছাত্রেরই শিক্ষালাভের একমাত্র উদ্দেশ্য হল — কি করে প্রতিযোগিতায় সিদ্ধিলাভ করে ভবিষ্যৎ জীবনে কর্মক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে আরোহরণ করা যায়, এরা হল সব carrerist যারা নিজেদের জীবনে উন্নতি করে সুখে ও সম্মানে থাকতে চায়, সমাজের দশজনের কথা এদের মনেও আসে না।" তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পুঁজিবাদের মহা অনিষ্টকে দূর করার একমাত্র পথ হল দেশের একটি অভিন্ন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা, যা দেশের প্রতিটি পুরুষ নারী ও শিশুর জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। শিক্ষার বিষয় এমন হতে হবে যে, প্রতিটি ছাত্র তার সহজাত গুণাবলী উন্নতি করা ছাড়াও, আত্মকেনিদ্রক না হয়ে, সমাজের অপর দশজনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

অবশেষে এই শান্তির প্রচারক আইনস্টাইন, যিনি জ্ঞানের তপস্যায়, মানবপ্রেমে এবং চারিত্রিক মহত্ত্বের সুষ্ঠু সমন্বয়ে মহাপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন, তিনি 1955 খ্রিস্টাব্দের 18ই এপ্রিল পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে তাঁর ভালোবাসার সুধারস থেকে বঞ্চিত করে পরলোক গমন করেন, কিন্তু, তিনি তাঁর শান্তির আদর্শের জন্য, মানব কল্যাণের আদর্শের জন্য আজও আমাদের মনে শ্রেষ্ঠ মানুষের আসনটি অলংকৃত করে আছেন। যার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষের সম্মানে ভূষিত করে বিশ্ববাসী আজ ধন্য। পৃথিবীর যেখানেই তিনি অশান্তি, অরাজকতা আর যুদ্ধের ন্যায় পাশবিক অত্যাচারে মানুষকে লাঞ্ছিত হতে দেখেছিলেন, সেখানেই তিনি বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন শান্তির আলোকশিখা।

আজ হয়ত তাঁর আবিষ্কৃত পারমাণবিক শক্তির অকল্যাণকর ব্যবহারে পৃথিবী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, এমনকি কোন বিশ্বযুদ্ধও হচ্ছে না, কিন্তু পৃথিবীময় আজও কিছু সংকীর্ণ স্বার্থচেতা মানুষ সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ, ঘৃণ্য জাতী বিদ্বেষ, বর্ণ-বিদ্বেষের বীজ বপন করে বেড়াচ্ছে, আজও একদেশ অপর দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মুখোমুখি হচ্ছে, পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও আজ বিষাক্ত হয়ে গেছে, যার ফলে পৃথিবীতে আজ সন্ত্রাসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সুপ্ত নখর যেগে উটেছে। এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়ই হল আইনস্টাইন প্রস্তাবিত সারা বিশ্বে একজাতির আদর্শকে বাস্তবায়িত করা, বিশ্বশান্তি স্থাপনে "One World Government"-এর প্রবর্তন করা। যে ধারাকে ত্বরান্বিত করতে 1979 খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্মশতবর্ষে রাষ্ট্রপুঞ্জ ঘোষণা করে প্রতি বছর আইনস্টাইনের জন্মদিন 14ই মার্চ তাঁর বিশ্বে শান্তি স্থাপনের ও বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্যে তাঁর স্মরণে 'অ্যালবার্ট আইনস্টাইন' শান্তি পুরস্কার দেওয়া হবে। আসলে যুগাতীত মহামানব, শান্তির পূজারী, সর্বকালের সেরা চিন্তানায়ক আইনস্টাইনকে সমগ্র পৃথিবী এভাবেই যুগ যুগ ধরে শ্রদ্ধা জানাবে মানবিকতার স্বার্থে।

তথ্যঋণ ঃ

১. "অ্যালবার্ট আইনস্টাইন" — দ্বিজেশচন্দ্র রায়।
২. "মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন" — প্রশান্ত প্রামানিক।
৩. "মনোরমা ইয়ার বুক — ২০০৩"।
৪. "দেশ" পত্রিকা।

শিল্প হিসেবে আবৃত্তি ঃ স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা এক "অকথ্য অলীক" বাস্তবতার খণ্ডচিত্র ও পূর্ণতার খোঁজ...

অভিষেক ঘোষাল

স্নাতক, ২য় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

অন্যান্য শিল্পের পাশে নিজ কৌলীন্য প্রতিষ্ঠা করতে আবৃত্তিকে আজও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। আবৃত্তি বলতে ঠিক কী বোঝায়, কবিতার সঙ্গে এর পার্থক্যই বা কোথায়, কবিতার আবৃত্তি হয়ে ওঠার দরকারই বা কী, কিংবা আবৃত্তি আদৌ শিল্প পদবাচ্য কি না — আবৃত্তি- প্রেমী মানুষজনেরও খুব কম অংশেরই এসব ব্যাপারে স্পষ্ট ধ্যানধারণা রয়েছে। ফলে, খোদ কোলকাতায় ও মফস্বল-শহরতলীতে ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে আবৃত্তি শেখার স্কুল গড়ে উঠতে থাকলেও বা আবৃত্তি নিয়ে বাজারচলতি যে কোনও লেখায় এর জনপ্রিয়তার আতিশয্যে যে কেউই গদগদ হলেও শিল্পটির প্রকৃত অগ্রগতি সম্পর্কে সন্দিহান হবার যথেষ্ট কারণ কিন্তু রয়েছে।

জন্মাবার পরমুহূর্তেই একটি শিশু নিজ অস্তিত্বের জানান দেয় যে দুর্বোধ্য শব্দে, বৃহত্তর অর্থে ধরতে গেলে সেটিও আবৃত্তি। ইতিহাসে শ্রুতির যুগ বা আবৃত্তির উপযোগিতা সম্পর্কেও কমবেশি সকলেই জানেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম এই শিল্পমাধ্যমটির বর্তমান সূক্ষ্মতর ও শিল্পিত রূপের জন্মমুহূর্ত নিয়ে যথেষ্ট গবেষণার অপ্রতুলতাই শিল্পটির প্রতি যাবতীয় ঔদাসীন্যের সবোৎকৃষ্ট নিদর্শন। "এহেন অস্পৃশ্য শিল্পকে" নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনে একটি পূর্ণাঙ্গ লেখা প্রকাশিত হতে সময় লেগে গেল প্রায় দু'শো বছর, এতে আর আশ্চর্যের কী?

আবৃত্তি : শিল্প না কি

শিল্পী তাঁর শিল্পবোধ ও জীবনবোধ থেকে সমসাময়িক বা অতীতে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার অভিঘাত বা অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধিকে নিজ মাধ্যমে প্রকাশ করেন, শিল্প রচিত হয় তখনই। সাধারণভাবে বিভিন্ন শর্ত, আঙ্গিকের নানা রকমফের, প্রায়োগিক ও তত্ত্বগত নানান তর্কবিতর্ক, ভাঙাগড়া ইত্যাদি বিচার বিশ্লেষণ করে শিল্পতত্ত্বের নিরিখে শিল্প বলতে তো একেই বোঝায়। আবৃত্তিও সেই অর্থে একটি আদ্যন্ত শিল্প, এর সুদূর ঐতিহ্যগত দিকটি পর্যালোচনা করে দেখলে পৃথিবীর প্রাচীনতম শিল্পগুলির একটি। কিন্তু আবৃত্তিকে পৃথক কোন শিল্পমাধ্যম হিসেবে দেখতে বা শিল্পের পর্যায়ে একে গণ্য করতেই নারাজ যাঁরা, তাঁদের এই বীতশ্রদ্ধার কারণ মূলত এর শিল্পগত স্বাতন্ত্র্যের দিকটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হওয়া। আর, এই স্বাতন্ত্র্যের অন্বেষণে এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে একটি কবিতার আবৃত্তি হয়ে ওঠার সামগ্রিক প্রক্রিয়াটির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ। শিল্প তত্ত্বের নিরিখে আবৃত্তি কিভাবে শিল্প — এইপ্রশ্নের সঙ্গে তাই অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত আবৃত্তির স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটিও।

শিল্প হিসেবে যাঁরা আবৃত্তিকে মানতে চান না, তাঁদের তত্ত্বগত-ভাবে আবৃত্তির শিল্পতাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি খুঁজে পাবার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় কবিতা ও আবৃত্তির মধ্যে পার্থক্যের জায়গাটি সম্পর্কে সম্যক ধারনার অভাব। আবৃত্তি কবিতার Extention মাত্র নয়। কোন একটি রচনা বা রচনাংশের সঙ্গে নিজ চিন্তার মিল পেয়ে, বা নিজ উপলব্ধিপ্রসূত কোন মতামতের সমর্থনে প্রকাশোপযোগী ভাষা খুঁজে নিয়ে কোন কবির রচনা থেকে, আবৃত্তিকার যথোপযুক্ত স্বরের সাহচর্যে, ছন্দের স্পন্দনে, অভিব্যক্তির পরিমিত ও সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণে, উচ্চারনের অভ্যাসজাত দক্ষতায় রচনা করেন আরেক শিল্প যার নাম আবৃত্তি। আবৃত্তি শিল্পের কোন একজন শিল্পী তাঁর নিজস্ব মেধা, মনন, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধিজাত জ্ঞানকেই বিচ্ছুরিত করেন তাঁর আবৃত্তিতে। একটি সার্থক আবৃত্তিরূপ সৃষ্টির সময় আবৃত্তিকার কোন কবিতা বা কোন লিখিত ভাষাকে (তো সে গদ্য-পদ্য যাই হোক না কেন) ব্যবহার করেন মাত্র। সেই আবৃত্তিতে বিধৃত মানসিকতা, তাতে প্রকাশিত জীবনবোধ, সমাজ-পরিপার্শ্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি — সবকিছুই একান্তভাবে ওই আবৃত্তিকারের। মূলতঃ কবিতা বা কবিতাংশের আবৃত্তিই শুনতে যেহেতু আমরা অভ্যস্ত, তাই বলা যায় আবৃত্তির সৃজনকালে কবিতা একটি উপকরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আবৃত্তি করা ও আবৃত্তি শোনা — দুই ক্ষেত্রেই দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ধারনার বশবর্তী হয়ে কবিতাপাঠ বা কবিতাকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারার অপর নামই যে আবৃত্তি নয়, তা বোঝার ব্যাপারে বড়সড় খামতি থেকে গেছে। ফলে, আবৃত্তির মধ্যে কবিতার মূলভাব বা কবির মানসিকতা, কবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাবার আশা করা যে কোন দিক থেকেই শিল্পসম্মত নয়, তা প্রথমে বোঝা দরকার। কবিতার ভাষাশরীরকে ধার করে গড়ে উঠলেও শ্রুতিগত মাধ্যমে আবৃত্তি স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে লাভ করে এক বহুমাত্রিকতা, যা কবিতাটি পঙ্‌ক্তিবিভাজন বা বিরাহচিহ্ন অনুযায়ী পড়ে গেলেই হয় না। কবিতাটিকে সম্পূর্ণ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পুনরালোকিত করে তাকে ভিন্নতররূপে প্রকাশ করতে হয় একজন আবৃত্তিশিল্পীকে। কবি যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন তাঁর কবিতার, আবৃত্তিশিল্পীও কবিতা

বা কবিতাংশকে অন্যতম উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে নিজেকেইপ্রকাশ করেন তাঁর আবৃত্তিতে। কবিতাকে বুঝলেই তাই তার আবৃত্তিও বোঝা হয়ে যায় না, কবিতার তন্নিষ্ঠ পাঠক হলেই তাই আবৃত্তিকারও হয়ে যাওয়া যায় না, কোন কবিতার রচনার প্রেক্ষিত বা কবিতাটির নিরিখেই কেবলমাত্র তার আবৃত্তিরও বিচার করতে বসা যায় না। আবৃত্তি শিল্পীকে যদিও কবিতা বুঝতেই হয়, কবিতার নিমগ্ন পাঠক হতেই হয়, কোন কবিতার রচনার প্রেক্ষিতও বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে হয় যতোদূর সম্ভব, কিন্তু সে সবই এর পরের ধাপ, অর্থাৎ কবিতাটির আবৃত্তি রূপ সৃষ্টির প্রয়োজনে। কোন কবিতা বুঝতে গেলে যেমন সেই কবিতাটি সম্পর্কে কবির ভাবনাচিন্তা বা কবির কবিতাটি রচনার সমসাময়িক অন্যান্য লেখাপত্র ইত্যাদি পড়লে সুবিধা হয়, আবৃত্তি রূপটি বুঝতে গেলেও তেমনি, কবির মানসিকতা বা উপরোক্ত কবিতা বোঝার অনুকূল শর্তগুলি নয়, বুঝতে হয় আবৃত্তি রূপটি সৃষ্টির গল্প। কিভাবে ও কেন আবহমানকালের কবিতার ভাণ্ডার থেকে একটি নির্দিষ্ট কবিতা বা লিখিত ভাষা শরীরকেই নিজ ভাবপ্রকাশের উপকরণ হিসেবে, অর্থাৎ আবৃত্তি করার জন্য বেছে নিলেন আবৃত্তিকার, চেনা বা বহুপঠিত ও কবি-সমালোচকদের নানারকম ব্যাখ্যাসম্বলিত কোন কবিতায় আবৃত্তিকার কি পেলেন কোন নতুনের খোঁজ, প্রতিটি লাইনকে তিনি যেভাবে উপলব্ধি করলেন বা শব্দগুলিতে পেলেন নিজস্ব চিন্তার মিল, তা ঠিক কোন্ স্বরে কোন্ ছন্দের চলনে ছন্দকে গলায় এনে, অভিব্যক্তির ঠিক কোন্ স্তরে, কোন্ মাত্রায় তিনি প্রকাশ করলেন, বা করতে চেয়েছিলেন, বা কয়েকটি আসরে পরিবেশনের পর বদল করেছিলেন, কিছু স্বর, ঠিক যেভাবে কবি প্রকাশের পরও অদলবদল ঘটান তাঁর কবিতার, কিংবা চলচ্চিত্রকার চিত্রনাট্যের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটান ছবি তুলতে তুলতেই....

বলা বাহুল্য, আবৃত্তিরূপ সৃষ্টির গল্প জানা কোন আবৃত্তি উপভোগের জন্য অনিবার্য কিছুই নয়, আর "শিল্প" হিসেবেই বা এখনও ঠিকমতো প্রতিষ্ঠিত নয়, তেমন কোন শিল্পের সৃষ্টির রহস্য জেনে নেবার পরিশ্রম স্বীকার করবেন সাধারণ শ্রোতা, এও নেহাত চিন্তার বিলাসিতামাত্র। কিন্তু কবিতার সৃষ্টিকাহিনী কবিতা বুঝতে সহায্য করতে পারে, তার আবৃত্তিকে নয়। আবৃত্তি বুঝতে ঐ জাতীয় কোন সৃষ্টিকাহিনীর যদি দরকার করে, তবে তা সেই আবৃত্তিরূপ সৃষ্টির পেছনে আবৃত্তিকারের দাঁতে দাঁত চেপে সমব্যথী স্বরান্বেষণের কাহিনী।

নিজ ভাবনা চিন্তাগত সাযুজ্য অনুযায়ী বা রুচির নিরিখে কবিতা বা প্রকাশোপযোগী ভাষাশরীর নির্বাচন থেকে শুরু করে তার আবৃত্তিরূপ সৃষ্টি ও স্বরলিপিনিষ্ঠ পরিবেশন — এই গোটা ব্যাপারটিকে যদি আমরা একটি সার্থক আবৃত্তি সৃজনের সামগ্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে ধরি, তাহলে এর শিল্পগত স্বাতন্ত্র্য ও বহুমাত্রিকতার দিকটি খুব কিছু অধরা থেকে যায় কি? আর আবৃত্তির এই স্বাতন্ত্র্যগত দিকটি উপলব্ধি করলেই তার শিল্পতাত্ত্বিকভূমি খুঁজে পেতে কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়, কারণ তা বুঝতে শেখার, কবিরা বিদগ্ধ ধোপা, আর আবৃত্তি শিল্পীরা তাঁদের হৃদয় ও মগজ নিঃসারিত বৈদগ্ধ্যের ভারবাহক গাধার দল এমনটা কোনমতেই নয়।

সম্পূর্ণ ভিন্নগোত্রের একটি শিল্পমাধ্যম, পর দোষের মধ্যে দোষ, নিজ সৃজনকালে সে কবিতার ভাষা শরীরটিকে ব্যবহার করে মাত্র, তাকে আলাদা কোন স্বীকৃতিই শিল্প হিসেবে দেওয়াই হবে না, তা সে যতোই অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে ডঃ সাধন ভট্টাচার্য অবধি প্রত্যেকের শিল্পতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে শিল্পের শিল্প হয়ে ওঠার শর্তাবলী পূরণ করুক না কেন, এ ঠিক কোন্ ধারার শিল্পবোধ!!

স্বয়ংসম্পূর্ণ এক শিল্পমাধ্যম ঃ আবৃত্তি

কবিতার লিখিত ভাষা শরীরের উপর আবৃত্তিকে একটা পরিমানে নির্ভর যেমন করতেই হয়, তেমনিই এও ঠিক যে আবৃত্তির রূপটির সম্পূর্ণতা ঐ লিখিত ভাষা শরীরটির উপরই কেবলমাত্র নির্ভরশীল নয়।

স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম হিসেবে আবৃত্তির স্বয়ং সম্পূর্ণতার প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে শিল্পটির সৃষ্টির ইতিহাসের মধ্যেই। বৈদিক শিক্ষার একটি বিশিষ্ট অঙ্গরূপে পরিগণিত হত আবৃত্তি, শুধু এ কারণেই, যে কণ্ঠস্বর, স্বর পরিবর্তন পদ্ধতি, স্বরের নানান সূক্ষ্মচলন, সুর ও সুরের টান, হ্রস্ব-দীর্ঘ-অর্ধমাত্রার উচ্চারণের ঝোঁক ও অন্যান্য এ জাতীয় বৈশিষ্ট্য কেবল আবৃত্তিতেই রচিত হত। প্রায় দু'হাজার বছর ধরে এজন্যই বেদ লিখিত হয়নি, গুরু-শিষ্য পরম্পরায় কণ্ঠে কণ্ঠে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। লেখ্যরীতি চালু হয়নি বলেই শুধু না, একটি অক্ষরও যাতে বাদ না পড়ে বা বিকৃত না হয়, সেজন্যই নানান ছাঁদে বেদ আবৃত্তি করা হত। প্রত্যেক আবৃত্তিবিষয়েরই ছিল এক সুনির্দিষ্ট নিয়মনিষ্ঠতা, যার সুপ্রযুক্ত ব্যবহার ও অনুসরণ প্রায় দু'হাজার বছর ধরে বেদের কবিতাগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল একান্ত ভাবেই শ্রুতিগত মাধ্যমে। ভাবতেও অবাক লাগে, প্রায় দু'হাজার বছরকাল যাবৎ কণ্ঠে কণ্ঠে প্রবাহিত হয়ে চলেছে বেদের কবিতাগুলি, যার প্রবাহন প্রক্রিয়ার সামন্যতম স্বরের বিচ্যুতিই ঘটিয়ে দিতে পারে কবিতার অন্তর্বস্তুগত পরিবর্তন। কী কঠোর সেই স্বরসঞ্চালন। কী অমোঘ সেই উচ্চারণ! কী অপরিসীম সম্ভাবনার গর্ভগৃহ সেই আদিম শিল্প — আবৃত্তি! আর, এই ইতিহাসই সামনাসামনি দাঁড় করায় এক অপ্রিয় সত্যের। কবিতার সারাৎসার তাহলে আবৃত্তি ক্ষেত্রে ঠিক কতটা প্রয়োজনীয়, যখন আবৃত্তিকালে স্বরের সামান্যতম হেরফের ঘটিয়ে দিতে পারে সমগ্র কবিতার রসের বিস্তারিত পরিবর্তন!

শিল্প মাধ্যম হিসেবে আবৃত্তির স্বাতন্ত্র্যের দিকটি পেরিয়ে এসে তার স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রশ্নে তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় কোন শিল্পের শিল্পগত বা আঙ্গিকগত অনিবার্যতার জায়গাটি। এ নিয়ে আলোচনার সময় আমার কিছু সাহিত্যপ্রেমী ও আবৃত্তিজিজ্ঞাসু বন্ধু আমাকে প্রশ্ন

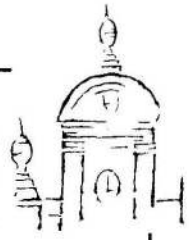

করেন, একজন চলচ্চিত্রকার কোন মোদ্দায় পছন্দ উপন্যাসের অদলবদল ঘটিয়ে, উপন্যাসটি তেমন কিছু উচ্চপদবাচ্য না হলেও, তা থেকে অসাধারণ কোন চলচ্চিত্র সৃষ্টি করতে পারেন। সেখানে তাঁর একটি বড়সড় ছাড় থাকে, দরকারে তিনি উপন্যাসটির আমূল পরিবর্তন সাধনেও পিছপা হন না। কিন্তু আবৃত্তিকার তো দরকারে কবির কোন রচনার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন না। তবে? আবৃত্তির স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার পথে বড়সড় একটি বাধা কি এখানেই তৈরী হল না? প্রশ্নটির উত্তরে প্রথমেই বলা চলে, এখানে কিন্তু কোন খারাপ বা খারাপ লাগা কবিতার বা কবিতাংশের কিছু শব্দ বা বিরামচিহ্নের পরিবর্তনের কথাই বলা হল না, একইসঙ্গে বলা হল, কবিতার উপর আবৃত্তির অমোঘ নির্ভরতার কথাও।

নিম্নমানের কোন কবিতা বা কবিতাংশ দিয়ে কি রচিত হতে পারে না কোন সার্থক আবৃত্তিরূপ? তার অজস্র নিদর্শন কিন্তু আছে। যেহেতু, এ বিষয়ে সমগ্র উপলব্ধির বেশীরভাগটাই নির্ভর করে শ্রুতিগত দিকটির উপর। তাই সেইসব নিদর্শন নিয়ে খুব বেশী আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। শুধুমাত্র এটুকু বলা চলে, শিল্প-তত্ত্বের নিরিখে বা পূর্বাপর আলোচনার সূত্র ধরে এটি প্রমান করাই যায়। আবৃত্তির ভালো-মন্দ যেহেতু কবিতাটির মানের উপর খুব কিছু নির্ভরশীল নয়, তাই কবিতা বা কবিতাংশটি ভালো কি খারাপ, আবৃত্তির জন্য নির্বাচনকালে নির্বাচকবিশেষে আপেক্ষিকভাবে তা কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলেও; আবৃত্তিরূপটি পরিবেশন বা তার বিচারের ক্ষেত্রে কোন প্রণিধানযোগ্য বিষয়ই নয়। এখানেও তাই চলে আসে আবৃত্তির স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রসঙ্গ, যা অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম ও যথার্থভাবেই প্রায়োগিকদিকে অধিকতর নির্ভরশীল।

কবিতার উপর নির্ভরতার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, কবিতা আবৃত্তি শিল্পের একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ তা পূর্বেই বহুবার বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য উপকরণ। কিন্তু তাতে আবৃত্তির স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার পথে কোন বাধা পড়ে না। কবিতার উপর এই নির্ভরতা আবৃত্তির একটি আঙ্গিকগত সীমাবদ্ধতা হিসেবে পরিগণিত হতেও পারে, কিন্তু এই সীমাবদ্ধতাই শিল্পটির আঙ্গিকগত অনিবার্যতার, বলা ভালো শিল্পটির শিল্প হিসেবে পরিপূর্ণতা লাভের অন্যতম শর্ত হিসেবে প্রযোজ্য। লিখিতভাষা শরীর কখনই একটি পূর্ণাঙ্গ আবৃত্তিরূপ সৃষ্টি করতে পারে না। কবিরচিত একটি সুচারু ভাষাকে ব্যবহার করেও আবৃত্তিকার পারেন নিজ মতামত, দৃষ্টিভঙ্গির ধ্বনিমুদ্রন ঘটাতে। আর, এই সামগ্রিক রূপসৃষ্টিতেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে আবৃত্তি নামক শিল্পটি। সেলুলয়েডে যেভাবে লেখা সম্ভব না একটি আস্ত উপন্যাস, ঠিক যেভাবে খাতাকলমে রচিত হতে পারে না কোন সার্থক চলচ্চিত্র, সেভাবেই কোন আবৃত্তি কবিতার পাঠমাত্র হলেই আবৃত্তি হয়ে ওঠে না, তা কবিতার পাশাপাশি জন্ম দেয় অন্য আঙ্গিকের, ভিন্ন স্বাদের এক শিল্পের। কখনও কখনও ছাপিয়েও যায় কবিতায় লিখিত ভাষা শরীরটিকে, কখনও কবিতার অভিঘাত, ধ্বনিময়তা, চিত্রকল্পকে ছাপিয়ে যেতে পারেও না আবার। কিন্তু যে কোন সার্থক আবৃত্তি, তা সে কবিতার পাশাপাশি সমানতালে নিজ অস্তিত্বের জানান দিক, বা ভুলিয়ে দিক কবিতাকে কিংবা ছাপিয়ে যেতে ব্যর্থ হোক কবিতার মাদকতা সকলক্ষেত্রেই আবৃত্তির অস্তিত্বগত স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না।

সহায়ক গ্রন্থ পত্রপত্রিকা—

১। আবৃত্তিকোষ : ড. নীরদবরন হাজরা
২। আবৃত্তিচর্চা (১ ও ২) : উৎপল কুন্ডু
৩। আবৃত্তি করার আগে : ঐ
৪। 'অমৃতকুম্ভ' আবৃত্তিপত্রিকার নির্বাচিত কয়েকটি সংখ্যা
৫। 'ছন্দনীড়' আবৃত্তিসংস্থার দশবছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ
৬। বাংলা আবৃত্তি সমীক্ষা : প্রমোদ মুখোপাধ্যায়
৭। আবৃত্তিচর্চার আনন্দ : উৎপল কুন্ডু (কমপ্যাক্ট ডিস্ক)
৮। 'শঙ্খমালা', 'বাল্মীকিস্মরণ', 'কথক' পত্রিকার নির্বাচিত সংখ্যা

অসীম রায় ঃ কয়েকটি রাজনৈতিক গল্প

ঐশিক দাশগুপ্ত

"এবং প্রতিরোধের সব শক্তি যখন ভেঙে চুরমার রাস্তার মোড়ে, ঠিক মাঝখানে অচঞ্চল স্থবিরতায় দাঁড়িয়ে থেকে স্তব্ধ নরেশ মুখোমুখি তাকাল। .... ভারসাম্য রাখতে পারছে না সে। বিধ্বস্ত শরীর ভেঙে ভেঙে পড়ছে। অথচ শাসন প্রশাসনের রক্তচক্ষু ভ্রূকুটিতে কিছুমাত্র তোয়াক্কা না রেখে বানভাসি স্রোতে ছুটে আসছে উত্তাল গর্জন...."

'রোহিতাশ্বের নামে'— অমলেন্দু চক্রবর্তী

দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় ওরকম একটু মনে হয় — এই ভঙ্গিমা দাঙ্গাকেই চ্যালেঞ্জ জানায়। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা এবং তার এক বছরের মধ্যে দেশভাগ — এতবড় বিরাট ওলটপালটের চ্যালেঞ্জ, যা দেশের ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই ওলটপালট করে দেয়। তখন রণদিভের নেতৃত্বে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দিকে ঝুঁকেছেন তিনি। আলিপুর জেলের তালা ভাঙতে গিয়ে পুলিশের লাঠিতে মাথা ফাটিয়েছেন—

"মাথায় ফেট্টি বেঁধে মাঠের মধ্যে ট্রেন থেকে নামলাম। সূর্যাস্তের সামনে উটের পাল চলেছে, গমের ক্ষেত কুয়ো থেকে ঘুরে ঘুরে জল টানছে গরু, আর হাঁক আসছে, 'পানি আও, পানি আও।'

সেই খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হল — কয়েকজন তরুণ-তরুণী যদি কলকাতার রাস্তায় মাথা ফাটিয়ে মরে যায় তা হলেও ভারতবর্ষের বাস্তবতা এক চুল নড়বে না। জীবনযাত্রার এই প্রেক্ষিতে সেইসব চমকপ্রদ ক্লাইম্যাক্স আশ্রয় করে, নীরবে এগিয়ে যান অসীম রায়, এই চরম ও সুদক্ষ বাস্তববাদী পর্যবেক্ষণ করেন সমাজের নানাবিধ ব্যাধি। যখন শীতল চাহনি নিয়ে বাড়িতে বসে থাকা দায় হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের সেই অস্থিরকালের প্রত্যক্ষদর্শী অসীম রায় তখন কলম ধরেন। সামাজিক বক্তব্য মিশে থাকে কাহিনীর পরতে পরতে। সমকালের উপাদান ছেঁকে তুলে আপন চেতনায় নবরূপ দান করে ব্যবহার করেন আধুনিক জটিল জীবনে।

চারের দশক থেকে সাতের দশক এবং তার পরেও সত্তরের স্বপ্ন, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, ঘরে ফেরা, না ফেরার সেই উথাল-পাথাল ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দিনগুলির ছবি, বামপন্থী আন্দোলনের বিশ্বস্ত দলিল আছে তাঁর এই লেখাগুলোয়। একসময় বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং শেষ পর্যন্ত মার্কসীয় দর্শনে তাঁর বিশ্বাস থাকলেও কোন মতবাদের প্রভাব তাঁর রচনাকে কুণ্ঠিত ও একপেশে করে তোলেনি, বরং তা হয়ে উঠেছিল তাঁর অভিজ্ঞতারই অংশ। পার্টির ভিতর থেকে দেখেছেন পার্টির কাজকর্ম, অনুসন্ধান করেছেন পার্টির ভেতর ব্যক্তি মানুষটির মূল্য কতখানি? সৎ বিবেকবানদের যন্ত্রণার কথাও বলেছেন আবার রাজনৈতিক নেতাদের চিৎকৃত অন্তঃ-সারশূন্যতা তাঁকে আহত করেছে। বিকলাঙ্গ রাজনীতি আর পচাগলা প্রশাসন উভয়কেই একটি প্রতিবাদের শরে বিদ্ধ করেছেন। তিনি জানতেন, নিরপেক্ষতাই প্রকৃত শিল্পীর স্তব, হয়তো নির্জনতাও, তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয় কাল ও জীবন। এই দুটি মুখের নাটক, আলো ছায়া খেলা স্থান ও কালের রঙ্গমঞ্চে শিল্পীসত্তার দ্বন্দ্বকে বুঝতে সাহায্য করে।

'স্টেটসম্যান' কাগজে তখন পেছনের পাতায় 'ক্যালকাটা কেসবুক ফিচার' বেরোত। নিউজ এডিটর মারে সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন অসীম রায় — হাতে 'মন্দিরের রাস্তা'। আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। খবরের কাগজের তাৎক্ষণিক জগৎ তাঁকে আহ্বান জানায়। নিঃসঙ্গতার বিরুদ্ধে যা লড়ছে তারা যাতে সাহস না হারায় সে জন্য মাঝে মাঝে চিৎকার করে সাহস জোগানোর দরকার হয়।

"ব্রীজের কোণায় কোণায় র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা মানুষ-গুলোর দিকে চেয়ে বিজুর একটা চিৎকার দিতে ইচ্ছে করে।"

আসলে জীবনে নতুন দিগন্ত না হলে বাঁচা অসম্ভব, তাই শূন্যতাকে সামনে রেখে পর্বতের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে লেখক সেই আভাস দিয়েছেন। তিনি ঠিক টিপিক্যাল বাঙালি লেখক নন। সাসপেন্সই তাঁর লেখার মূল উপজীব্য। চারপাশের গতিময় জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কতগুলি বস্তু তুলে প্রকান্ড উত্তেজনা, তার চেয়েও বড় প্রকান্ড প্রত্যাশাকে নির্দিষ্ট স্থির সত্তা অস্তিত্ব দানে সক্ষম তিনি।

ঘটনার উপরে নয় তিনটি চরিত্রের উপর অসীম রায়ের প্রথম গল্প 'আরম্ভের রাত।' এই গোলমাল, ভিড়, ধুলো, ধোঁয়া আর রাজনীতি এই ও ভারহোয়েলমিং রাজনীতি সবটাই গোলমেলে মনে হয় তাঁর। এর চেয়ে অফিসে দশটা পাঁচটা করা অনেক ভাল — হয়ত জঞ্জাল থেকে বাঁচতেই অসীম রায় যান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করেন মাঝে মাঝে। আসলে গুমরানো থেকে গর্জন এর আত্মবিশ্বাসটাই তাঁর নেই। কারণ তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

"....ঐসব বন্দুকগুলো আগুন ঝলসাচ্ছে তখনও ওরা এগিয়ে গিয়েছে। .... মদন সেই যে ফেরার আর ফেরেনি।"

সাহিত্যের তরল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন গম্ভীর, চিন্তাশ্রয়ী তাঁর কাল্পনিক চরিত্র পানু চক্রবর্তী, বিজু, হীরক মিত্র, ম্যানেজার বাবুরা জীবন্ত ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। নতুন কিছু বানিয়ে বলার মেজাজ এ লেখকের যেমন নেই, তেমন কিছু বানিয়ে বলার পথে হাঁটতেও অসীম রায় গররাজি। তিনি একজন অনুসন্ধিৎসু যিনি জীবিকার টানাপোড়েন থেকে সযত্নে আলাদা করতে পারেন শিল্পীর ভূমিকা। যিনি বছরের পর বছর অনুধাবন করে চলেন মানুষের প্রায় একই ধরনের অনুভূতিতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন ব্যঞ্জনাময় উপলব্ধি। তাই পানু, বিজু, হীরকদের চিন্তাভাবনার পার্থক্য কালের বর্তমান জীবননাট্যের বিশাল ক্যানভাসে আকাড় প্রতিরূপ হিসেবে ফুটে ওঠে। মানুষের নীচতা, অবিশ্বাস, ফুরিয়ে যাওয়া আর প্যাচ্‌প্যাচে

কাদার মধ্যে বেঁচে থাকা আর না থাকাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন তিনি। সিগারেট ধরিয়ে প্রথম ট্রামের অপেক্ষায় বিজুর দাঁড়িয়ে থাকা মুক্তির প্রত্যাশায় বা এই মানুষদের নিয়েই যে ভবিষ্যৎ সম্ভব — এই দোলাচলতায় সংকট আর ব্যক্তিকে সমাজের চালচিত্রে, সমাজকে রাষ্ট্রের চালচিত্রে বসান তিনি। কিন্তু তাঁর মন সন্দিগ্ধই থাকে।

'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র' গল্পে ফেলুকে খুন করে মুকুটহীন রাজা বেণু বিশ্বাস। গুন্ডারা বড় হয়ে গেলে তারা আর গুন্ডা থাকে না, তারা তখন হয়ে ওঠে সমাজের নিয়ন্ত্রক। ফেলুর মা আর তার ভাই রতনের জীবনবোধ গড়ে উঠেছে নারকেল গাছটাকে কেন্দ্র করে। ফেলুর মা'র তাড়নায় রতন থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে জীবন সমুদ্র মথিত দুঃখের হলাহলের সম্মুখীন হয়। বিষ জ্বালায় সে যখন জর্জরিত তখন বড়বাবু অজিত দাসের লাল চোখের উদাসীনতা, হাই তোলা, ক্রমাগত সিগারেট খেয়ে বড় বড় বুলি কপচানো রতনকে জীবনের সঙ্গে পরিচিত করায়।

"চাকরি নেই, ব্যবসা নেই, আলো নেই। সাপ, মশা, পাঁক। এখানে যদি ক্রাইম না হবে কোথায় হবে?"

বড়বাবুর এই উক্তিতেই স্পষ্ট হয় ক্রাইম হওয়াটাই যেন স্বাভাবিক। তাঁর শিল্পলোক ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়েও সামাজিক জীবন চৈতন্যে উদ্ভাসিত। অধীরের কথা রতনের চিত্তবিক্ষেপ আরও বাড়িয়ে তোলে। তার চিন্তা শক্তি তার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। সামাজিক জীবন রতনের কাছে দাঁতমুখ খিঁচানো একটা বেয়াড়া মুখোশের বীভৎসতায় এসে দাঁড়ায়। ধ্বংসের তাণ্ডবে ফেলুর বুকে চাপ চাপ রক্ত রতনের চোখের সামনে লাফ দিয়ে আর্তনাদ করে। রতনের দাদা বলে ডাকবার ইচ্ছা যেন অর্থহীন শব্দ — যা আশ্রয় হারানোর বেদনায় সকালবেলার ঘাসের গন্ধে শৈশবের পরিচিত পরিবেশের হারানো সুরটাকে খুঁজে পেতে চায়। তখন মনে হয় বার্ণাড শ'র হতাশ নায়কের সঙ্গে রতনের কণ্ঠও কোথাও মিল খোঁজে—

"I stood on the rock I thought enter nal, and without a word it reeled and crumbled under me."

একবার হিরণকুমার সান্যাল বলেছিলেন — "আপনার 'শ্রেণীশত্রু' পড়তে পড়তে গা ছমছম করে।" যারা একসময় পরস্পরের বন্ধু ছিল, তারা আজ দুটো পরস্পর-বিরোধী দলীয় শিবিরের সদস্য। ব্যক্তিগত আর দলীয় নীতির কার বশ্যতা স্বীকার করবে তারা? মনুষ্যত্বহীন রাজনীতিতে তারা আজ একে অপরের শ্রেণীশত্রু—

"আমি ভেবেছিলাম তুই আমায় স্ট্যাব করবি"

এই উৎকণ্ঠা তাদের অর্ন্তদ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন।

"অবিভক্ত বাংলাদেশের প্রতিভূ এই যশোর রোডের মেহেগনিগুলো আজ শ্রেণী গ্রামের / বিজয়কেতন।" এর প্রতিটা নিশ্বাস যেন আমাদের গায়ে এসে লাগে। শ্রেণী শত্রুকে খতম করার জন্য সন্ধ্যের পর টহল দেয় নন ও তার স্কোয়াড। এই জীবন মরণ সংগ্রামের বাইরেও আসন্ন প্রসবা স্ত্রীর কথা সে ভুলতে পারে না। পাশাপাশি রমেনদের স্কোয়াডের খবরও তাকে রাখাত হয়। আসলে শ্রেণী সংগ্রাম বা শ্রেণী শত্রু নিছক একটা আইডিয়া নয়। আর এগুলো নিশ্চয়ই কোন নতুন কথা নয়। কিন্তু নতুন কথা একটা দাঁড়ায় জাতিগতভাবে এই অহেতুক রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঠেকিয়ে আরও উন্নত পথে দেশকে পরিচালিত করার কাজ দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। কিন্তু এইসব ভাঙা, ক্লান্ত ও বিরক্ত যশোর রোডের বাসিন্দারা নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে খুব একটা সচেতন নয় বলেই মনে হয়। বটগাছের নীচে পেট্রো-ম্যাক্সের আলো নেতার মৃত্যু — ননকে স্থির থাকতে দেয় না। সর্বদা একটা অস্বস্তি একটা অস্পষ্ট আতঙ্ক তার মনে জেগে থাকে। সে ওসব মার্কসবাদী থিওরির কচকচি বোঝে না, লক্ষ লক্ষ লোকের করতালি—মুখর বিরাট মিটিংয়ে নেতাদের আত্মতৃপ্ত বক্তৃতা তাকে শান্তি দেয় না। সে শুধু বোঝে জ্বলন্ত সংঘর্ষে দু-পক্ষের প্রাণ ঝরে যায়। দাঙ্গায় মনস্তত্ত্বই মুখ্য হয়ে ওঠে। সুধীরবাবুর কথাও ননকে বদলাতে পারে না। নন ভাবতে পারে না ভারতবর্ষের শ্রেণী সংগ্রাম এ রকম অগ্নিবর্ষী রক্তক্ষয়ী রূপ নেবে। প্রতিহিংসাকুটিল এই প্রেতনৃত্য সে চায়নি। সে ভেবেছিল জনতার অর্থনৈতিক সংগ্রাম ধাপে ধাপে রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ নেবে — এ মনোভাব আসলে লেখকের। বিনয় বাদল দীনেশের স্বপ্ন — মনে দীপার সর্বক্ষণ উপস্থিতি — বাবার মৃত্যু — চাকরি — বৃষ্টিতে ফুটবল খেলা — কবিতার মত শ্লোগত্রানের আওয়াজ তুলে শ্রেণী সংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখার ড্রিবল — এ ক্লান্ত নন নিঃশেষিত হয়ে যায় আস্তে আস্তে। অন্য অনেকের মত গেঁজিয়ে যায়। এই নিঃসহায়তাটাই অসীম রায় দেখাতে চান। দুটো গুলির আওয়াজ ব্যর্থ ননকে মৃত্যুর মত নিঃশব্দ করে দেয় — আলুর দোকান থেকে কাননবালার গান ভেসে আসে—

"তার বিদায়বেলার মালাখানি আমার গলায় দোলে।"

এই তীব্র শ্লেষ নিঃসহায়তাটাকেও প্রকট করে তোলে। স্রষ্টার নিরাবেগ করুণাই এই পর্যায়ের গল্পে মানবিকতার রস নিষ্কাশিত করেছে হয়ত বা ননকে মুক্তিও দিয়েছে। কিংবা এই মর্ত্যলোকের অপরূপ নাটকের সামনে দাঁড় করিয়ে লেখক পাঠকের চোখ ফেরাতে চান অনন্ত কালের দিকে, সমাহিত স্তব্ধতার দিকে।

"সে সময়টা ছিল ঝড়ের দিন। চারপাশে এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল যাকে টেনে বড় করা যায় না, অথচ যার তীব্রতায় সারা মন আচ্ছন্ন করে। ..... লালবাজারে দোতলার বারান্দায় সারি সারি উদ্বিগ্ন তরুণ দাঁড়িয়ে। এখনই তাদের জেরা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের মধ্যে আমার নিজের মুখটা দেখতে পেলাম। ফিরে এসে অনি গল্পটা লিখলাম।"

—'অনি' গল্পে রাজনীতিকে কেন্দ্র করে অনি ও তার বাবার মধ্যে দূরত্ব রচিত হয়। বাবা আর ছেলের মধ্যে অন্ধকারে কানামাছি খেলা চলে কেন। কেউই কাউকে ছুঁতে পারে না। মানসিক বনিয়াদটা তাদের এমনই যে কেউ বোধহয় কাউকে ছোঁয়ারও চেষ্টা করে না। অনির বাবা নিজের অতীত থেকে বেরোতে পারেন না। কারণ তিনি আর পলিটিক্যাল এলিমেন্ট নন। ওদিকে অনি বিশ্বাস করে তারা

যে যুদ্ধ শুরু করেছে তার শেষ আছেই। অনিদের শ্লোগানে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আছে, যা আপাতদৃষ্টিতে ভাবের কথা, মেলোড্রামার কথা, কিন্তু তার প্রচণ্ড রোখ অনির বাবাকেও স্পর্শ করে। মধ্যবিত্ত জীবনের অস্তিত্বের শিকড় ধরে নাড়া দেয় তা। কারণ ঋত্বিক ঘটকের ভাষায় — 'Melodrama is also an art'.

"ছেলেটাকে পাঁচ বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারব তো"—

এই দুঃখবোধ, অনির বাবর সমুদয় চাওয়া পাওয়া এবং মানসিক সংলাপ চালানোর বিড়ম্বনার পরম মূল্যই অসীম রায়ের অন্বিষ্ট। অনি ও তার বাবার পরস্পর সম্পর্কের টানাপোড়েন ব্যক্তি জীবনের মুকুরে সমাজ জীবনের মূল্যবোধকে প্রত্যক্ষগোচর করায়। অনির বাবা রাশিয়া, চীন, কিউবা, ভিয়েৎনামের বিপ্লবের ইতিহাস জানেন কিন্তু যুব মানসের গভীর তরঙ্গকে ধরতে পারেন না। অনিরা যে সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখে তাকে তিনি 'মেড-ইন-বেঙ্গল' বলে মনে করেন। বিপ্লব তো খবরের কাগজে সম্পাদকীয় লেখা কিংবা ককটেল পার্টি নয়। আপ্তবাক্যের ঘ্যানঘ্যানানি আর রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সেটাই তাঁর লেখাতে ফিরে ফিরে আসে।

কলকাতা এখন মুক্তাঞ্চল হতে চলেছে। ধনতন্ত্রের অতি অসম বিকাশে অর্ধস্ফুট কিন্তু বর্ণবাহার ফুল কলকাতা নগরী। এখন রাস্তায় বেরোলে বারুদের গন্ধ নাকে আসে না। লেখক বোঝাতে চান সত্যি কি আসে না? গরীব মানুষদের নিয়েই কলকাতা — এ কলকাতার নীচে আরেকটা কলকাতা — তাদের নিয়েই বিপ্লব। অনির বাবার স্বপ্ন রয়েছে নাগরিক জীবন, বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্য-বিলাস, আর অনির বাস্তবে রয়েছে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোয় ধৃত এক দুশ্ছেদ্য পিতৃ-তান্ত্রিক বশ্যতা। লেখকের এই প্রশ্ন পাঠকের মানোলোকে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আন্দোলন, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, এইভাবে সমাজের প্রভাবেই বারে বারে সক্রিয় হয়েছে — সে কি কোন ভাবে সমাজের একটা মানে খুঁজে বার করেছে, এ সব প্রশ্নের উত্তরেরই অন্বেষণ করেন অসীম রায়।

বিপ্লবের জোয়ার চলে যাবার পর পাঁকে কাদায়, পেটি বুর্জোয়াদের চেষ্টায় লক্ষ্য হারানোর প্রশ্নই অনির বাবার ব্যক্তিসত্তায় অঙ্কুরিত হয়েছে। তখন থেকেই তার মনের মধ্যে শুরু হয়েছে ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার দ্বন্দ্ব। অনির রাফ খাতায় — "আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে" এই লাইনটা অনির বাবার মনে চমক লাগিয়ে দেয়। জীবনকে জানার যে গভীর মনন এবং অন্তর্দৃষ্টি অপরিহার্য অনি তা আহরণ করেছে জীবনানন্দের কবিতা থেকে। অনি কি শুধু অভ্যস্ত জীবনের দাস? অসীম রায় কখনও জীবনের একটা প্যাটার্নকে ধরতে চাননি। জীবন বিন্যাসের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃজন করে সমাজ তাই তাঁর লেখাকে গভীর ও অর্থবান করে তোলে। অনির সঙ্গে অনির মার সম্পর্কে যে জীবন্ত রূপ ছিল বাবার সঙ্গে তার সে সম্পর্ক ছিল না। প্রৌঢ়ত্বের আত্মচিন্তার জগৎ থেকে অনির বাবা ধড়মড় করে উঠে বসেন — ভায়োলেনস ভালো কি মন্দ — এই চিন্তাই তার মনে ঘুরপাক খায়। ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে পলায়নে অনির বাবা বিশ্বাসী নন। পলায়নে সাময়িক সমাধান হতে পারে কিন্তু যে ছেলে বাবার নিরাপদ আশ্রয়ে এসেছে অনির বাবা তাকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিতে পারেন না কারণ তিনি আদর্শবাদী। অনির্বাণ মুখার্জী চোর-শাসক শ্রেণীর নাম পাল্টানোর ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় অশেষ ক্লেশ ও কষ্টের মাঝখানে স্নায়ুকোষের জটিলতা কিংবা সমাহার থেকে মনে আসে কবিতার সেই লাইন—

"আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে।"

বস্তুত অনেক লেখকের কাজ দেখলে বোঝা যায়, তাঁদের কোন বিষয় নেই। কেউ কেউ হয়ত ভেবেছেন এগুলো বাজারে খাবে ও প্রায় চোখ বুজে লিখে গেছেন। আর লেখাগুলো হৈ হৈ করে কাটার ফলে নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছেন জীবদ্দশায়। কিন্তু অসীম রায় অন্তরালেই থেকে গেছেন নিজেকে পুড়িয়ে, রক্তাক্ত করে প্রতিটি শব্দ নির্মাণ করেছেন আজীবন।

রাজনীতি সমাজবিচ্ছিন্ন কোন বস্তু নয়। রাজনীতি মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। অসীম রায়ের ছোটগল্পগুলো তাই রাজনৈতিক হয়েও দেশব্যাপী ভাবাবেগের ঘূর্ণাবর্তে, আদর্শবাদের দূরারোহে শিখরের দিকে যাত্রাপথে মানুষের জীবনের বিশিষ্ট রূপটিই উদ্ঘাটিত করেছে। যেমন স্টীম রোলারের চাপে রাস্তার উঁচু নীচু সব গুঁড়িয়ে সমতল হয়ে যায় তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সমষ্টিগত উদ্দেশ্য সাধনের অন্তরালে আত্মগোপন করে। অসীম রায় তাঁর মনন ও বর্ণনার অভিনবত্বে নতুন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনের স্বপ্নবিহ্বল আকুতির মাঝে, মানুষের জীবনকেই অন্বেষণ করেছেন।

"আমরা যদি তিতো না হয়ে যাই, লোভ থেকে নিজেরে মুক্ত রাখতে পারি, যদি ওই দীর্ঘ তীর্থযাত্রার বন্ধুর পথে ঝড়ের মাঝখানেও নিভু নিভু দীপশিখা নিয়ে বছরের পর বছর হাঁটতে পারি এবং হেঁটে আনন্দ পাই তাহলে কোনো ভয় নেই।"

ঋণস্বীকার ঃ

(১) অসীম রায়ের গল্প, (মনীষা কলকাতা ১৯৮১)।
(২) লেখকের জবান — অসীম রায়, (মনফকিরা – ২০০৬)
(৩) সঙ্গ ও প্রসঙ্গ (দিব্যেন্দু পালিত)
(৪) সমাজ সংসার — নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
(৫) নকশাল আন্দোলনের গল্প — বিজিত কুমার দত্ত (সম্পাদনা)

অনিতেশ চক্রবর্তী
দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

উল্টো হাওয়া

মলয় ভট্টাচার্য
দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

পায়রার পালক ওড়া ছেলেমানুষ ছাদটা হ্যাংলা আকাশটার এইপ্রান্ত থেকে ওইপ্রান্ত পর্যন্ত টানা। এ ছাদটা আইবুড়ো, বে-আক্কেলে, বেলাজ। আকাশটা জানে, কিংবা হয়তো খোঁজ রাখতো বলাই ভালো --- লালবাড়িটার। লালবাড়িটার আচারের বোতলের, রোদে মেলা কাপড়-জামা-প্যান্টির, লাল বাড়িটার শীতে ফাটা দুটো কচি গোড়ালির, খুস্‌কি ভরা জট পাকানো শ্যাওলা টিপির, এমনকি উঠনোর ওধারে পলেস্তারা খসা বাথরুমটার পেছনে যেখানে রাস্তার কুকুরগুলোর ছেঁড়াছেঁড়ি করার জন্য রক্তমাখা ন্যাকপিনগুলো পড়ে থাকতো — আড়চোখে তারও। আর ছাদটা জানতো আহ্লাদী নারকেল গাছটা, বন্ধ্যা তালগাছটা, অথর্ব অ্যান্টেনাটার ব্যারিকেডের গল্প। যাতে লালবাড়িমাখা হ্যাংলা আকাশটাকে ঘিরে ধরে জেরা করা যায়।

আকাশ আর ছাদের এই দ্বৈরথের মধ্যে চিরকাল যে ভোঁদাই -কলমচি নিজের ছায়ায় গোঁফ আঁকে, কিংবা নারকেলি-হাওয়ায় জানলার পর্দা কাঁপছে দেখে যে এদিক ওদিক তাকায়, আর বাতাসা গোলা জল হাতে কলম চিবোতে চিবোতে খেঁজুরের সাথে চোখাচুখি হলেই লজ্জা পায়, হেসে ফেলে, পরক্ষণেই কান্না চাপে, যে কিনা নিজের অপ্রস্তুত ভাবখানা চাপতে শরমাবনত চোখে পাজামার দড়িটা কড়ে আঙুলে প্যাঁচাতে থাকে, — সে আর যাই হোক স্পোর্টস্‌ম্যান নয়, আর যেই হোক চ্যবণপ্রাশখেঁকো ভালো মানুষ নয়, আর যেমনই হোক রাত জেগে হাত কাপানো তার ধাতে নেই। তাহলে আসলে সে কি বা কে বা কেন ....? বলব না, বলব না, বলবোই না।

— প্লিজ বলো। আমাকে প্রচ্ছদ বানাতে হবে যে।

— বলবো না।

— এমন ক'রো না, পিলিজ, আমার কৌতুহল এদ্দম সহ্য হয় না। সময়ও নেই হা করে থ মেরে বসে থাকার মতো, কাজ আছে, রান্না .... তোমার চা .... ফিনাইল ....

— ফিনাইল!!! না মানে ইয়ে মানে সে ফিনাইল নয়।

— মরণ! মরণ!! মরণ!!! ফিনাইল-নিমাইল-মিশাইল ছেড়ে বলো তো কে সে? কোনো রাজপুত্তর?

— না।

— কোনো লেঙ্গি খাওয়া ব্যাথাতুর? PLZ বলো, mmm wwwhhh...

— বলতে পারো, আবার নাও পারো। আসল কথা তো হল 'উড়ান' আর নকল ব্যাপারটা হল 'উল্টোরথ'।

— কি যা তা বক্‌চো? সে কি পাখি? সে কি ভূত? ভালো মানুষ? কানামাছি? নাকি ফিনাইল, ভালো কোম্পানির?

— ওফ্! আবার সেই! ইয়ে মানে যাকে বলে— আবার কেঁচে গণ্ডুষ! যাহ্লে...

আরে ওব্বাবা!

এ কি গো!!

দেখো দেখি!!!

বিঁপ্! বিঁপ্! বিঁপ্! বিঁপ্! বিঁপ্! বিঁপ্!!!!

— .....

— এখন আর সময় নেই, উড়ান, ঘুড়ি ইয়ে মানে উল্টোরথ, আরে মানে আর কি অ্যালকোহল না কি ফিনাইল ..... ইয়ে ..... আরে ধ্যাত্তেরি ..... ওসব পরে হবে, অ্যান্টেনা মনে হয় নতুন কোনো পুরোনো গপ্পো ক্যাচ্ করেছে, ফাঁদতে হবে।

ফিনাইল। ছাদের এককোণে বমির ফিন্‌কিতে উগ্‌ড়ে দেওয়া ফিনাইলগুলো যদি লম্বা পাইপ বেয়ে নেমে নালার বগলেই জমে থাকতো, তাতে অ্যাতো কথা চালাচালির ব্যাপার থাকতো না, ব্যাপার বা স্যাপার কোনোটাই থাকতো না যদি, অন্ততপক্ষে, নালার শিরদাঁড়া বরাবর গড়িয়ে গিয়ে হাইড্রেনের অন্ধকারে থম্‌কাতো ....; কিন্তু ফিনাইল .... ইয়ে মানে .... মোদ্দা ব্যাপারখানা যখন হাইড্রেনেও না কুলিয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত মা গঙ্গায় গিয়েই সঙ্গম নামালো, তখন কথকতার পাবনধারা সটান গিয়ে কাহিনীর সাগর Touch না করা পর্যন্ত তো কুলু কুলু-কুলু কুলু চলবেই .... চলবেই .... আর এই কেচ্ছাসঙ্কুল চলার পথে আমাদের চেনা লালবাড়িটা আর ছাদটার বাঁকে আহ্লাদী নারকেল গাছটা, বন্ধ্যা তালগাছটা, অথর্ব অ্যান্টেনাটা আর হ্যাংলা আকাশকে সাক্ষী রেখে সে যে নিয়মমাফিক কিছু পাললিক 'উপহার' রেখে যাবেই, তা শুধু বলা কেন, বলতে চাওয়াও বাহুল্য।

অবিশ্যি সোনালি ফিতে, রাংতা, ফুল — এসবের দরকার হয়তো তেমন একটা ছিল না, তবু .... আদরের উপহার কিনা, তাই নারকেল পাতার আঙুলগুলো এরপরেও খানিকটা পেঁজা মেঘ আর উদাসী নীল তার পোড়ো চোখ দুটোর কোলে, লেপটে থাকা ধ্যাবড়া রাত্রিগুলোর ওপরই। গ্যাদ্‌গ্যাদ্ করে, আহ্লাদীর মতো, নিজের মর্জিমাফিক বুলিয়ে দিলো। এর ফলে বেশ একটা ঘেঁটে দেওয়া সঙের মতো মানালোও তাকে।

ঘড়িতে তখন চারটে বেজে বাইশ কি তেইশ....

.... যেহেতু সে ফিনাইল, ... না মানে .... ধ্যাত্তেরি ..... যেহেতু

সে ফিনাইল-নিমাইল-মিশাইল, কিংবা ব্যথাতুর, উড়ান, উল্টোরথ, পাখি, ভূত, ভালোমানুষ, কানামাছি কোনোটাই পুরোপুরি নয়, তাই .... এমনটা হতেই পারতো, এরপরে সে চিৎ থেকে ডাইনে কিংবা বাঁয়ে (এটুকু তার মর্জির ওপর ছাড়া যেতেই পারে) কাৎ হলো, এরপর আরও জুৎ করে উপুড় হয়ে শুলো, এরপর সে তার হাতদুটো দুপাশে সোজা করে দিলো, এবং তারপর বুকে দাঁড়ে দুহাতে চাপ দিয়ে মানানসই খাড়া হয়ে ডানা আর লেজ পৎপতিয়ে প্রয়োজনমতো হাওয়ায় নিজেকে মেলে দিলো, ...

ঘড়ি তো তখন সবে সোয়া চারটের গপ্পো বলছে ....

এবং আকাশও তখন ঐ লালবাড়িটার ছাদের রেলিং-এ হেলান দিয়ে জব্বর একটা উড়ান খুঁজছিলো, একগতর জং নিয়ে পায়রাদের দলও মিস্‌কল করছিলো নিজেদের মধ্যে, বালিশের মতোন করে গোছানো বাঁধা ঝুলির থেকে বিরল ঠাকুমাদের ভগ্নাবশেষগুলোও মাথা তোলেনি তখনও ....

তবুও

কেন জানিনা

সোয়া চারটের সেই গল্পটা ওখানেই থেমে গেছিল।

জমাটি যে উড়ালখানার একটা সম্ভাবনা, একটু হলেও, ছিলো; যেটা কিনা 'হতেই পারতো' ...., সেটা আর হয়ে ওঠেনি। কারণ শেষ মুহূর্তে তার মনে হয়েছিলো — আহ্লাদী নারকেল গাছটা, বন্ধ্যা তালগাছটা, আকাশমাখা নিঃসঙ্গ লালবাড়িটা, অথর্ব অ্যান্টেনাটা — চারপাশের এই মানুষগুলোকে সে এমনভাবে এমনি এমনিই ফেলে যেতে পারে না। আর এইসব তার যতক্ষণে মনে হতে শুরু করেছে, ততক্ষণে নীচের বিভিন্ন খুপরিগুলোর কোনোটায় একটি ভদ্রমহিলা আর একজন বিড়াল, কোনোটাতে একটি বিড়াল আর একজন বিড়ালনী, আবার কোনোটাতে বা একজন আয়না আর একটি ভদ্রলোক পরস্পরের মধ্যে ধাতব শব্দের লোফালুফি খেলা শুরু করে দিয়েছে।

আর শেষমেষ, এটাও সে বেশ ভালোমতোই জানতো, যে একবার ডানা মেলে দিলে, অনেক অনেক অনেকটা না উড়ে সহজেই লালবাড়িটার ছাদে গিয়ে নেমে পড়া যাবে না, ডানামক্‌সো অত সহজ কাজ নয়, ...

এবং

ছাদটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অ্যাত্তোসব ভাবনাচিন্তা করতে করতে, কারোর জন্য বা কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে করতে যখন তার চটকা ভেঙেছিলো, দেখেছিলো—

বেমানান ও বেয়াড়ারকমভাবে ঘড়িতে চারটের ঘন্টা বাজছে!!!

প্রত্যয়, অপ্রত্যয় ঃ পথিক, তরুণ, একজন কবি

দেবরাজ দাশ
প্রথম বর্ষ, বাংলা বিভাগ

যে অকস্মাৎ "হাজার মশাল জ্বেলে। নিজেই নিজের ঘর ভীষণ পুড়িয়ে দেখে নেয়/অগ্নুৎসব", তার পক্ষেই বোধ হয় একথাটা বলা সবচেয়ে সহজ "দ্বিধাহীন আমি উড়ে/গেলাম সূর্যের ঠোঁটে কোন রক্ষাকবচ বিহীন/প্রার্থনার মতো"।

"এ রঙের বিপরীত আছে অন্য রঙ" ঃ পথিক

"আমি আর আমার মতই বহু লোক। রাত্রিদিন ভূলুণ্ঠিত ঘাতকের আস্তানায় কেউ মরা, আধমরা কেউ" — ক্ষুধিত শৈশব পীড়িত কৈশোর আর নগ্ন যৌবনের জাহান্নামে পথিক বেঁহুশ আহত স্বপ্নের বীজ বুকে বেয়ে বেড়িয়ে। ফুটিফাটা বুক চেরা অগ্নি দহনে যে ঝলসে গেছে পথিকের চোখ, সাধ, প্রেম আর চামড়ার থলে ভরা মদিরার উজ্জ্বলতা। উদ্যত ঘাতক, শাণিত মারণাস্ত্রে নির্লজ্জ মাতলামীর মুখোমুখী তাই সে পথিক বলে— "প্রতারিত চোখে দেখি অবিরাম/পথে প্রান্তরে ছিন্ন মুণ্ডু দোলে/নিষ্ফল আমি...."।

তবু পথিকের বিশ্বাস "এ রঙের বিপরীত আছে অন্যরঙ", তাই "পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে জ্বলন্ত। ঘোষণার ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে/নতুন নিশানা উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক" তাকে আসতেই হবে, যার জন্য রক্তগঙ্গা, খাণ্ডবদহন, দগ্ধঘর আর "হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে/বসে আছে পথের ধারে"।

তাই "আসন্ন বিলয় জেনে শোকবিদ্ধ অগ্নিদগ্ধ পাখির মতন দিশাহারা" হয়েও সেই অনাথ কিশোরী কিংবা নেপথ্য চারিণী মা'র দুঃখ জাগানিয়া গান তার মনে উড়িয়েছে উজ্জীবনের ধ্বজা, অগ্রগমনের উজ্জ্বল তোরণ, জেগে ওঠে পথিক, শোষণ আর লাঞ্ছনার কলঙ্কিত ভস্মস্তূপে দাঁড়িয়ে উজ্জীবিত পথিক হয়তো একাই বলে—

"পুনরায় জাগরণ, গুল্ম ঢাকা আমার গুহার
আঁধারে প্রবিষ্ঠ হলো রশ্মি ঝরনা, জাগালো কম্পন
এমন নিঃসাড় ম্রিয়মান সত্তাতটে।...."

—কিন্তু এই "....উচ্চারণে বস্তুত নগরবাসী দেবে না আমল", কেননা পৃথিবীর সেই অন্য রঙ তাদের চোখে ধরা পড়ে না, তাই পথিক একলাই হাঁটবার লড়াই লড়ে যাবে অবিরাম। কেউ যদি তার পথ আটকায়, কেউ যদি তাকে সাবধান করে বলে— "নো এক্সিট, শোনো/তোমার গন্তব্য নেই কোনো", তবে পথিক তাকে বলবে— "না থাকুক তবু যাবো"। নিষ্ফল রাত্রিতে মায়ের তরতাজা কণ্ঠে ঘুম ভাঙানি গান কিংবা বিষাক্ত বসন্তে যুবতীর আশাবরী প্রেম তাকে নিদ্রাহীন পথে দস্যু কবলিত পৃথিবীতে সূর্যোদয়ের সাধনায় জুগিয়েছে প্রাণের ইন্ধন। পথিক তাই কোন রক্ষাকবচ বিহীন প্রার্থনার মতই এগিয়ে যায় আগুনের পথে, দুঃসাহসের পালক ঢাকা দুখানি উদ্ধত ডানায় ভর দিয়ে সে উড়ে যায় সৌরলোকের অগ্নিবলয় স্পর্শ করে। সাহসী পথিক নিষেধের তর্জনী, সুপ্রাচীন শকুনের কর্কশ আওয়াজ কিংবা ঈগলের দুর্নিবার ঊর্ধ্বচারী ডানার চাঞ্চল্যকে অগ্রাহ্য করেই নির্বাচন করেছে "জ্বলজ্বলে, ক্ষমাহীন, রুদ্র নিজস্ব আকাশ"। পুড়ে ছারখার হয়ে গেল সে, মারা গেল, কিন্তু সে আমাদের দিয়ে গেল তার "মৃত্যুঞ্জয় নান্দনিক সঞ্চয়"। তার বিশ্বাস, অঙ্গীকার কিংবা অগ্নিশুদ্ধ প্রতিবাদ গেঁথেছে আমাদের মনে প্রত্যয়ের মূল, হয়তো সূর্যের পথে তার ভয় রেখাই অন্তিম পরিণাম, তবু আমাদের পৃথিবীর এই অন্তহীন জাহান্নামে শুচিস্নিগ্ধ প্রভাতের প্রথম আজান সেই গেয়েছে, অনন্ত নরকের পথে জীবনের স্বপ্নদেখা সে-ই প্রথম প্রভাতী পথিক; তাই তার মরণ থেকে আমাদের জীবনপাঠ শিখে নেওয়ার পালা শুরু — তার পূতভস্মরঞ্জিত মোহনা থেকেই আমাদের গঙ্গোত্রীর পথ চাওয়া, আর সেজন্যই এ পথিকের মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাদের কবিতা;—

"এলাম আমরা রাখবো কোথায়?
তেমন যোগ্য সমাধি কই?
মৃত্তিকা বলো, পর্বত বলো,
অথবা সুনীল সাগর-জল—
সব কিছু ছেঁদো, তুচ্ছ শুধুই!
তাইতো রাখি না এ লাশ আজ
মাটিতে পাহাড়ে কিম্বা সাগরে,
হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই।।"

কেউ কি এখন এই অবেলায় আমার প্রতি বাড়িয়ে দেবে হাত ঃ তরুণ

বিপন্নতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অসহায় পৃথিবী — একদিকে দলিত মানুষের অন্তরাত্মার সর্বক্ষণের আপন জ্বালা, অন্যদিকে পীড়িত বিশ্বাস বোধ — কিছু তরুণ, যে ভোরবেলার সফেদ আলোর হাতছানিতে বেড়িয়েছিল এক বুক প্রত্যাশা, এককণ্ঠ প্রতিজ্ঞা আর চোখ ভরা অভীপ্সার উথাল-পাথাল আলোড়ন নিয়ে সে এই রক্তে, নির্মম অত্যাচারে, অমানবিক ২৯৯ লীলার দুর্নিবার অরাজকতায় কিভাবে সমর্পণ করবে ইতিহাসের গায়ে তার প্রত্যাশার অঞ্জলি, কীভাবে সে তার দয়িতার প্রতি অর্পণ করবে নিদাঘ প্রেমের রচনা—না, সে তো স্বস্তিতে নেই, "যে তার কবিতায় .... মেনিমুখো শব্দাবলী ঝেড়ে ফেলে/অপেক্ষা করত সেদিনের জন্য/সেদিন তার কবিতা হবে মৌলানা ভাসানী/এবং শেখ মুজিবের সূর্যমুখী ভাসনের মতো", সে কীভাবেই বা নিশ্চল হয়ে থাকবে যখন "ক্ষ্যাপাটে অন্ধকারে/ভবিষ্যত কাতরাতে থাকে"।

তরুণ তার বুকের গহনে নিয়ত লালন করে এসেছে যে প্রেমের স্বপ্নাবেশ, যে দয়িতা কে সে ভালোবেসেছে একান্তে; সেই প্রেম, তার দয়িতার প্রতি তার অন্তরের চেনা ও যে বিপন্ন বিশ্বে পর্যুদস্ত, তাই অসহায় তরুণ বলে—

"আমার স্বপ্নের ঝড় লণ্ঠন বেবাক অতিশয়
হিংস্রতায় বারংবার দিয়েছে দুলিয়ে।"

যে প্রেম তার গোপনে বুনেছে আশার তৃণলতা, যে প্রেম তার সত্তার খাঁজে খাঁজে গেঁথে দিয়েছে উদ্যোগের মন্ত্রণা-শেল, যে প্রেম তার ললাটে দিয়েছে উপপ্লবের রক্তটীকা, যে প্রেম তাকে শক্তি যুগিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে জান কবুল করার সোৎসাহে — সেই প্রেমের খোদার আসন যখন টলমল করে, সেই প্রেমের সফেদ কবুতর "যখন হাঁপায়/অন্তরালে গুটিয়ে ঘর্মাক্ত ক্লান্ত ডানা, চোখ বুজে—/দুঃস্বপ্ন দখল করে তাকে, শোকাবহ সুর বাজে/বুকের ভেদরে", তখন সে তরুণ হাতরায় উত্তোরণের পথ, সন্ধান করে উজ্জীবনের সুধা, অস্ত্র তুলে নেয় নির্মম আক্রমণের বিরুদ্ধে—জেহাদ ঘোষণ করে ঃ

"অশুভের সাথে আপোসবিহীন দ্বন্দ্ব চাই।
....সর্বপ্রকার কারগার থেকে মুক্তি চাই।
মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।"

—তরুণ মুক্তি চায়, তার তরতাজা খুনে, টগবগে শিরায় শিরায় ধমনীতে বেজেছে মুক্তি যন্ত্রণা। তার মুক্তি কামনা শোষণের বিরুদ্ধে, আক্রমণের বিরুদ্ধে, অবৈধ দখলদারির বিরুদ্ধে, গুপ্ত হিংসা, পাশবিক হিংস্রতা, ধর্মীয় ভণ্ডামী, ক্ষমতাধরের গুণ্ডামী, খুন, লাঞ্ছনা, লাম্পট্য আর যাবতীয় কাপুরুষতা, নীচতা ও কদর্য পুরুষার্থহীনতার বিরুদ্ধে। এই মুক্তি পিপাসাই তরুণের কাছে কখনো দয়িতার প্রতি প্রেম, সায়োনারার প্রতি ব্যকুলতা কিংবা সহসাই ভেসে আমরা রঞ্জিতার স্মরণ খেয়ায় ভর দিয়ে হারিয়ে যাওয়ার উদাসীনতা অথবা ম্যানিলার প্রতি সকরুণ উদ্বেগ—

"...ওদের কণ্ঠ নালী কেমন পাথুরে হয়ে গ্যাছে, সেখানে
উচ্চারণের কোন ডানাঝাপটানি নেই।
হঠাৎ চমকে উঠে শুনি রিজালের মূর্তি আর স্মৃতিসৌধের
তৃণ
হাওয়ায়ইতিহাসের রেণু উড়িয়ে বলে ফিলিপিনো, ফিলিপেনো।"

তরুণ লড়াই করে বাঁচবার জন্যে; তার প্রেম, তার প্রত্যাশা, তার আজকাল ও প্রত্যন্ত পরশুকে বাঁচাবার জন্য। আর তার দয়িতা, সায়োনারা বা রঞ্জিতা অথবা ম্যানিলা তার সেই লড়াইয়ের সাথী। তাই যে "....নেকড়েগুলো দেখার তীক্ষ্ণ দাঁত", তাদের রাঙানো চোখ, হিংস্র দাঁত আর ভয়ঙ্কর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ করে। হয়তো পরাজিত হবে সে, তবুও সে সাজায় তার যুদ্ধতরী, প্রস্তুত হয় যুদ্ধের জন্যেই—

"আমিও বাঁচতে চাই, ...
.... বুঝি তাই ঋতুতে ঋতুতে
সাহস সঞ্চয় করি এবং জীবন তুরঙ্গের
বর্নিল লাগাম ধরে থাকি দৃঢ় দশটি আঙুলে।
কখনো এড়িয়ে দৃষ্টি ছুটে যাই অস্ত্রাগারে, ভাবি
লম্পট জোচ্চোর আর ঘাতকের বীভৎস তাণ্ডব
কবে হবে শেষ? সূর্য গ্রহণের প্রহর কাটবে
কবে?"

ঝটপট হটো, ভেতরে না গিয়ে মরবো না আমি অনাহারী ঃ একজন কবি

"অনেক সমুদ্র ঘুরে কতো বন্দরের গন্ধমেখে
একদিন সার্থবাহ বার্ধক্যের অবসন্ন তটে
ফিরে আসে পণ্যবাহী সার্থক জাহাজ, পালতোলা
গালফোলা নাবিকের গানে গুঞ্জরিত। মূর্খ যত
চেঁচিয়ে মরুক তারা, পূর্ণতার স্তবে রাত্রিদিন
জপেছি ভীষণ মন্ত্র ক্ষয়ে ক্ষয়ে ..... কিন্তু তারপর?"

—এ কবিতার শেষ যেখানে, সেখানেই শুরু হয় স্বার্থের চক্রান্ত, বিশ্বাসের পরচুলা পড়া কবন্ধ শাস্ত্রের শাসনে সেখান থেকেই শুরু হয় ব্যক্তি খলতার কপট নৈরাজ্য। কিন্তু কবির বুকে বিশ্বাসের অতল সাগর, জ্যোৎস্নার অসীম আকাশ। বঞ্চনা, পীড়ন, অধিকার হারানো বা হারাতে বসা মানুষের কান্না তাঁর কানে পৌঁছয়, তাঁর কানে পৌঁছয় সভ্যতার আজব মাটিতে খোলামেলা নগ্নতা দানবের হাতে ধর্ষিতা যুবতীর যন্ত্রণার অশেষ চিৎকার। অথচ কবি অভিশপ্ত করতে পারেন না তাঁর আতুড় ঘরের মাটিকে, হামা দেওয়া কাদাল্যাপা আঙিনাকে, নবান্নের দিনে মায়ের হাতের আল্পনা দেওয়া তাঁর বারান্দাকে।

কবি দেখেন, "বারান্দায় পাখির কংকাল, / গোলাপের ছাই পড়ে আছে।" কবি প্রত্যক্ষ করেন, আগ্রাসী সময় "সহসা খিঁচিয়ে মুখ ছিঁড়ে নেয় অন্তগামী/সূর্যটির মাংস একতাল", সৌন্দর্যের ললিত সুর রুদ্ধকণ্ঠ বিবেকের পাথুরে চৌকাঠে ঠোকে মাথা, তবু কি তার প্রতি নির্দয় হয়ে থাকতে পারেন তিনি? পারেন না কবি শান্ত হয়ে থাকতে যখন দেখেন;—

"... সরা দেশ/ঘাতকের অশুভ আস্তানা।
.... চতুর্দিকে/মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।"

কবি যখন দেখেন—

"বিপর্যস্ত গোলাপ বাগান,
ভঙ্গুর ডালে বুলবুল গীত গান।
ভুল লক্ষ্যের দিকে সংকেত
দেখায় দিশারী, ডেকে আনে পিছু টান।"

—কবি বুঝতে পারেন, তাঁর প্রত্যাশা ব্যর্থ, এ পৃথিবী তাঁর সেই আদিম লালিত্যে পূর্ণ করুণা নাম্নী কোন নারীর উজর প্রেমে আকাঙ্ক্ষিত জন্মভূমি নয় — পথিক ও তরুণের মতই এ কবিও হয়ে ওঠেন চঞ্চল, বিক্ষোভের সুর বাজে তাঁর বুকে—

".... আমি একলা ডাকতে ডাকতে
ক্লান্ত হয়ে পড়ি ....। পড়ে থাকি
অসহায়, ব্যর্থ। তখন দুক্ষোভে নিজেরই হাত
কামড়ে ধরতে ইচ্ছে হয়, আমার প্রিয়তম স্বপ্নগুলোর
চোখে কালো কাপড় বেঁধে গুলি চালাই ওদের হৃদপিণ্ড লক্ষ্য করে।"

কোন অপরিচিতের কাছে আহত কবি বলেন— "বেঁচে আছি বহুদিন তবু পৃথিবীকে/এখনো রহস্যময় মনে হয়।" যে পৃথিবী তাঁর প্রেমের, তাঁর স্বপ্নে, সুখের, ভাবের, অনুভবের, সেই পৃথিবীর নরক কুণ্ড কবির কাছে আর কালো কাপড়ে ঢাকা থাকেনি, কবি সেই

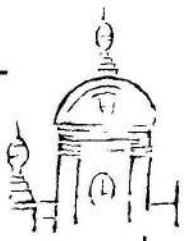

অপরিচিত কে বলেছেন— "বর্বরের দল করেছে দখল/বাসগৃহ আমাদের।" আর বলেছেন, "পিপে পিপে মদ শেষ কতো/ঝলসানো মেষ আর শুয়োর কাবার, প্রতিদিন/ভাঁড়ারে পড়েছে টান।" কবি জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি প্রস্তুত কেন না—"জনগণ প্রতিষ্ঠিত/অনাচার, অজাচার ইত্যাদির চায় প্রতিকার।" জনগণ তাঁকে দিয়েছেন কবিত্বের ভার, দায়িত্ব — সে দায়িত্ব প্রতিবাদের, প্রতিরোধের, ভাঙবার, গড়ে তুলবার।

কবি আজ অনাহারী, শৈশবের সবুজ স্মৃতির কিশলয় গুলি আজ বিস্মৃত — যৌবন ও আজ বিপন্নতার মুখোমুখি, বিপন্নতার মুখে দণ্ডায়মান আজ সে নিজেই। জিজ্ঞাসার কঠোরতায় আজ কবিসত্তার অগ্নিশুদ্ধি পর্ব, সে পর্বে কবির আত্ম উক্তি ঃ

"মৃতের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেলে ভাবনার
স্বরূপ বদলে যায়? ....
শূন্য খাঁচা স্তব্ধতায় কম্পমান, হায়, গানহীন।
মৃতের মুখের কাছে মুখ নিয়ে দুঃখের ভিতরে
ব'সে থাকি কিছুক্ষণ খুব একা, মেঘ হয়ে যাই।"

যে বিশ্বাসের পরশমণিতে ছুঁয়ে কবি কাদামাখা পৃথিবীকে শৈশবের কাদাল্যাপা পৃথিবী করে নিতে অটল থাকতে চেয়েছিলেন, সেই বিশ্বাস আজ যখন বিপন্ন পথিকের দৃঢ়তা, তরুণের প্রেমের মতই; তখন হটকারিতায় আহত খিন্ন বোধ আত্ম অপমানিত কবি *শ্রান্ত। তাঁর শব্দের কমনীয় স্পর্শমোহিত সমাজ-বাস্তবতা-পারিপার্শ্বিকতা* যে বদলে গেছে, তারাই যে আজ তাঁর প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে, সে সত্য আজ কবির চোখের সামনে তাই তাঁর আত্মগ্লানি—

সম্মুখে কাঁপে অমোঘ সর্বনাশ
.... এতকাল ধরে আমার আজ্ঞাবহ
ঘাতক রেখেছে তীক্ষ্ণ কুঠার খাড়া
সেই যূপকাষ্ঠে নিজেই বলির পশু

কবি ধ্যান মগ্ন, অসীম রূপান্তরের চিরন্তন রূপ-মগ্ন, অত্যাচারের শেকল কাটা আগামীর প্রত্যাশিত—অপ্রত্যাশিত কালবৈশাখীর রুদ্ররূপে আত্মস্থ। প্রতিবাদ তাঁর মন্ত্র, পরিবর্তন তাঁর সাধনা—কবি তাপস, কবি সাধক, কবি বিদ্রোহী, কবি পথ ভোলা জ্যোৎস্নার আলো সন্ধানী প্রজাপতি, আত্মভোলা বসন্তের মঞ্জরী খোঁজা চঞ্চল ভ্রমর — কবি ফেরার সূর্যের পথ চাওয়া বিরহী সূর্যমুখী। এ সূর্য রক্তহীন নতুন শতাব্দীর আবাহনের মন্ত্রের উৎসর্গিত রক্তগোলাপ, এ সূর্য সার্বিক কল্যাণের যৌক্তিক দেবতার উদ্দেশ্যে গৈরিক বন্দনা আর সেই জন্যই এ সূর্যোদয়ের পথ চাওয়াই কবির তপস্যা;—

"প্রাণে গেঁথে সূর্যমুখী-উন্মুখতা খুঁজি আজো তাঁকে
.... জীবনের সব মাধুরিমা/করেছি নিঃশেষ শুধু অশেষ
সন্ধানে জ্বলে জ্বলে/তিনি নন বিধাতা অথচ ব্যাপ্ত
সত্তার পরাগে—/তবে কি উপমা তাঁর চৈতন্যের ভাস্বর নীলিমা?"

হৃদয়ের নিভৃত ভাষায়/দুঃখ তার লেখে নাম ঃ আমাদের কবি

চঞ্চল পথিক ইকারুসের মতই দুর্নিবার আগামীর অগ্নি দহনে ভস্ম হয়ে গেছে, সায়োনারা-দয়িতার প্রেমকে বারবণিতার একটি একান্ত নিজস্ব ভালোবাসার মুহূর্তকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারে নি তরুণ — তারা মৃত! কিন্তু কবি কি শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন, নাকি পারেন নি, নাকি পথিক-তরুণের মতো তিনিও লুপ্ত নিশ্চিহ্ন — না আমাদের বিশ্বাস কবি হারেন নি, পরাভূত নন তিনি। প্রাণের পেয়ালা ভরে আছে তাঁর উদ্দীপনার মদ। তাঁর বিদ্রোহ, তাঁর সাধনা সম্পর্কে আমাদের সংশয় জন্মেছিল, আর তাতেই তিনি সবচেয়ে বেশী দুঃখ পেয়েছেন, ক্ষোভ জন্মেছে তাঁর মনে—"জানে না কেউ আমার একান্ত পরিচয় ঃ আমি কে?" "নিঃশব্দ সুরের ধ্যানে শিল্পিত তন্দ্রায়" অভিনিবেশিত তাঁকে আমরা প্রতিবাদের দেশে, বিদ্রোহিনী ভূমিখণ্ডে চিনতে পারিনি, অথচ তিনি তাঁর কাজ করেই গেছেন— 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'রৌদ্র করোটিতে', 'বিধ্বস্ত নিলীমা', 'নিরালোকে দিব্যরথ', 'বন্দী শিবির থেকে', 'দুঃসময়ের মুখোমুখি', 'এক ধরনের অহংকার' — আরো অজস্র অসংখ্য ধারায়, আর সেই জন্যেই তাঁর ক্ষোভ এত ঃ

"আমি তো বিদেশী নই, নই ছদ্মবেশী বাসভূমে—
তবে কেন পরিচয় অন্ধকার ঘরে রাজা, কেন
দেশের দশের কাছে সারাটা জীবন ডুগডুগি
বাজিয়ে শোনাব কথা, ..."

সালামের রক্ত, বরকতের অস্থি-মজ্জা তাঁর শরীরগত — তাই *প্রত্যয়-অপ্রত্যয়ের ধার ধারেন না তিনি।* ষড়যন্ত্রী প্রতিপক্ষের দিকে প্রত্যক্ষই ছুঁড়ে দেন জোরালো জিজ্ঞাসা;—

"ক্ষমতা মাতাল জঙ্গী হে প্রভুরা ভেবেছো তোমরা
তোমাদের হোমরা চোমরা
সভাসদ, চাটুকার সবাই অক্ষত থেকে যাবে চিরদিন?"
তীক্ষ্ণ হুঙ্কার তাঁর,—
"... দিয়েছি গুঁড়িয়ে কতো বর্বরের খুলি? কত শক্তি
সঞ্চিত আমার দুটি বাহুতে, সেও তো আছে জানা/রক্তরক্তি
যতই কর না আজ, ত্রাসের বিস্তার
করুক যতই পাত্রমিত্র তোমাদের, শেষে পাবে না নিস্তার।"

—ভেঙে দিয়েছেন, গুঁড়িয়ে দিয়েছেন কবি সব কিছু। মৌনতার রাজপথে স্তব্ধতার চাদর ঢাকা কলুষিত যা কিছু, সবের শব যাত্রায় কবি একাই সামিল, কেননা গোরস্থান থেকে ফেরার সময়ে তাঁকেই তো আনতে হবে 'একফোঁটা কেমন অনল', 'ইকারুসের আকাশ'। আজ তাঁর হাতে লণ্ঠন দুলছে; যে আলো চায়, তাকেই সে আলো দেবে আজ ঃ

"তোমার পাড়ায় আজ বড়ো অন্ধকার সম্ভবত
বাতিটা জ্বালাতে ভুলে গেছ, আমি অভ্যাসবশতঃ
কেবলি আলোর কথা বলে ফেলি। মস্ত উজবুক
এলোকটা—বলে দাও দ্বিধাহীন। ভয় নেই দেখাবো না মুখ
ভুলেও কস্মিনকালে। তোমরা কি অন্ধকার—প্রিয়?
চলি আমি, এই লণ্ঠনের আলো যে চায় তাকেই পৌঁছে দিও।"
(কবি শামসুর রাহমানের স্মরণোৎসর্গিত)

তমসো মা জ্যোতির্গময়

শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়
প্রথম বর্ষ, রসায়ন বিভাগ

জ্যোতির্ময় দত্ত বহুল প্রচারিত লেখক ('সেলিং লাকি হট কচুরিজ!'), এমন দাবি ওঁর পরতুম গুণগ্রাহীও করবেন না। দাদা, আপনার বই বাজারে কাটে নাকি পোকায় কাটে — এসব পুরনো ইয়ার্কির বাইরে আরেক উচ্চতার বই হয়, যার শব্দগুলো রক্ত মাংসের মধ্যে তিরের ফলার মতো কেটে বসে যায়। 'প্রতিভাস' থেকে প্রকাশিত 'গল্প সংগ্রহ ১' সেইরকম বই।

বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, থ্রিলার নিয়ে এমন অবলীলায় ঘাঁটাঘাঁটি বাংলায় জ্যোতির্ময় দত্ত ছাড়া আর একজনই করেছেন — নারায়ণ সান্যাল। জ্যোতির্ময়ের জীবনের প্রথম গল্পের প্রথম লাইন ঃ 'আমি আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছি।' ছোটোগল্পের তাবৎ সংজ্ঞা নতজানু হয় ওই সুইসাইড নোটটির সামনে, যেখানে তিনি দশপাতা-ব্যাপী বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের পর সিদ্ধান্তে পৌঁছান, ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকেন, তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের একমাত্র উপায়, সম্পূর্ণ অকারণে আত্মহত্যা করা কিংবা নিজের চেয়েও প্রিয় কাউকে হত্যা করা!

ছোটোগল্পেও একাধিক সাবপ্লট গুঁজে লেখার মধ্যে অনেকগুলো জানালা-দরজা খুলে দেওয়া, কোনান ডয়েলের মতো নিখুঁত ডিটেলিং, অজস্র বিষয়ে পড়াশুনার চিহ্নগুলি লেখার মধ্যে রেখে যাওয়া — এসব তো কিছুই নয়। জ্যোতির্ময়ের কলমটি পাঠকের আত্মা স্পর্শ করার মতো সংবেদনশীল। চুচু নামে এক বস্তির ছেলে অলিগলিতে ঘুরতে ঘুরতে কলকাতার বুকে আবিষ্কার করে একটি সত্যিকারের পাহাড়! সেখানে কোনো ট্যানারির গন্ধ নেই। নীল আকাশে জল কেটে উড়ে যায় ইলিশ-রং এরোপ্লেন। রইল নিজের বাড়িঘর নীচে পড়ে। সবাইকে ভুলে ওই পাহাড়েই চুচুর বাকি জীবনটা কেটে যায়। অন্য গল্পে, এমন এক ট্রান্সমিটার আবিষ্কৃত হয়েছে, যা কিছুক্ষণের জন্য চেনা পৃথিবীকে মুছে দিয়ে মানুষকে নিয়ে যায় কাল্পনিক কিন্তু অবিকল বাস্তবের মতো অনুভূতিময় ত্রিমাত্রিক বিজ্ঞাপনের জগতে। এই আবিষ্কারের পর সন্দেহ হয়, আমরা যাকে প্রাকৃতিক বাস্তব বলি, এই গাছ, এই পাহাড়, তা-ও আসলে হয়তো দূর কোনো নক্ষত্র থেকে প্রেরিত প্রাচীন ও পুরো পৃথিবীব্যাপী ট্রান্সমিশনের ফল! নিছক উন্নতমানের কাল্পনিক ত্রিমাত্রিক ছবি, যা এমনকি ছুঁয়ে-শুঁকে অনুভব করা যায়!

মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে, ঝর্নাজলে কুলকুচি করার মতো ইচ্ছে-গুলোকে জ্যোতির্ময় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন। ক্যান্সারগ্রস্ত অপদার্থবিদ তাই ঘোষণা করেন আবেগশূন্য নীরস বিজ্ঞানের অবসান। 'এসে গেছে এক নতুন কবিত্বময় মরমী বিজ্ঞান! নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রের মধ্যবর্তী অন্ধকারে আবিষ্কৃত হয়েছে — বিরহ! ঘূর্ণমান নীহারিকার অন্ধকার কেন্দ্র ভরে আছে — আকাঙ্ক্ষায়! .... যা স্পষ্ট গভীরভাবে আকাঙ্ক্ষিত, তা প্রাপণীয়।' ওদিকে ডিপ্লোম্যাটিক স্বর্গালোকে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের মনে সুখ ছিল না। শেষ পর্যন্ত মর্ত্যের এক কুকুরকে অনুসরণ করে, সময় আর দূরত্বে না জানি কত অতল শঙ্কু অতিক্রম করে যুধিষ্ঠির ফিরে আসেন পৃথিবীতে, চেনাশোনা গন্ধ আর শ্রুতির মধ্যে। বড়ো আনন্দদায়ক এই প্রত্যাবর্তন রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' মনে করিয়ে দেয়।

ব্লার্বে লেখকের জন্ম, পেশা, লেখালিখির ইতিহাস ইত্যাদি কিছু সম্পর্কে কোনো তথ্য দেওয়া নেই। কারণ, জ্যোতির্ময় 'ভালোবাসেন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে। তাঁকে ঘিরে তাই বাংলা সাহিত্যে সেই আবছা আঁধারই রয়ে গেছে, যার অন্য নাম রোমান্টিসিজম। দুর্মর রোমান্টিসিজম।' কিন্তু অনুরাগী পাঠক যখন প্রিয় লেখক সম্বন্ধে জানতে চায়, তাঁর লেখা পড়তে চায়, তার সেই আকাঙ্ক্ষাটি কি প্রাপণীয় নয়? যদ্দুর জানি, ২০০৭-এর নভেম্বরেও 'গল্পসংগ্রহ ২' প্রকাশিত হয়নি। তাঁর লেখা (সম্পাদিত নয়) অন্য কোনো বইয়ের বিজ্ঞাপনও গত তিন-চার বছরে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। নিজেকে এতটা লুকিয়ে রাখবেন না, প্লিজ।

এই আলোচনা শেষ হোক বরুণ রায়ের গল্প দিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তামাম ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় মুখ, ছোটোপর্দার লাইভ সংবাদপাঠক। যদিও কেউ কেউ জানে বরুণ আদ্যন্ত মদ্যপ, নীতিহীন ইত্যাদি। বরুণ কিন্তু একদিন সত্যিই দেখতে পায় দেশের প্রকৃত দৃশ্য — দ্য রিয়েল প্যানোরামা। রাষ্ট্রের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতায় শাসনতন্ত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। লাইভ অনুষ্ঠানে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে ঃ 'অ্যারাইজ, অ্যাব্রারাইজ মাই নেটিভল্যাণ্ড।' শাস্তিস্বরূপ 'তার লাশ পাওয়া গিয়েছিলো পুরোনো কেল্লায় — ভাইটাল স্পটে ছটা গুলি। কিন্তু একেই না বলে দ্য ব্যান্ডমাস্টার! স্যালুট! স্যালুট!! স্যালুট!!!' আজকাল বাংলা গল্প মানেই ছলোছলো জলবায়ুতে সম্পর্কের টানাপোড়েন আর শেষপর্যন্ত নৈতিকতার জয়। আর একদল শহুরে লেখক গ্রাম্য প্রেক্ষাপটে গপ্পো নিয়ে বেজায় গর্বিত, প্রকৃত ভারতবর্ষের কথা লিখেছি। উপন্যাস যত মোটা হবে তত বেশি ক্লাসিক! এসব দেখেশুনে আপনার মুখে যদি ঘনাদাসুলভ একটি ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে, তাহলে এই লেখাগুলোর সংস্পর্শে আসুন। সব্বার থেকে আলাদা একটা ভাইব্রেশন। অন্যরকম আলো। অন্যরকম অন্ধকার। আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

'কুটুম-কাটাম'

শুচিস্মিতা ঘোষ
প্রথম বর্ষ, বাংলা বিভাগ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিত্রকার, গদ্যকার হিসাবে তাঁর পরিচিতি ও কৃতিত্বের মূল্যায়ন বহু আলোচিত বিষয়। ছবি আঁকা ও একই সঙ্গে লেখাকে চিত্ররূপ দেওয়ার পথিকৃৎ তিনি। আর সেই লেখার মধ্যে কি নেই — গল্প, উপন্যাস, উপকথা, কল্পকথা, পত্রসাহিত্য — সবই তাঁর ঝোলা ঢুঁড়ে পাওয়া যায়; অপেক্ষা কেবল সেই সন্ধানী চেতনার। কিন্তু, স্বল্প পরিসরে তাঁর সুবিপুল ও বহুমুখী কর্ম প্রয়াসের আলোচনা করার প্রচেষ্টা নিজের অসম্ভব দুঃসাহসিকতারই নামান্তর মাত্র। তাঁর অনন্যসাধারণ শিল্পীসত্ত্বার একটি বিশেষ দিক — 'কুটুম-কাটাম' নিয়েই এই আলোচনার উদ্যোগ।

গদ্য ও ছবির ভাষার সর্বজনীনতা অবনীন্দ্রনাথের কাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও তিনি বরাবর তাঁর অনুরাগীদের কৌতূহলকে কয়েক যুগ পরেও জাগরুক করে রাখতে পেরেছেন। এটি ব্যাখ্যা করা হয়তো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে কারণ শিল্পীর সার্থকতা ও তার যুগোত্তীর্ণতা কালের আদালতে বিচার্য এবং অবন ঠাকুর এই বিচারে বেকসুর খালাস পেয়ে তাঁর অনুগামী ও অনুরাগীদের কাছে চিরস্মরণীয় রয়ে গেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের একটি নিজস্ব জগৎ আছে যার বিমূর্ত প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সৃষ্ট 'কুটুম-কাটাম'-এ। তাঁর গদ্যের ভাষা যেমন চমকপ্রদ, সেইরকম এই 'কুটুম-কাটাম' শব্দটিও অভিনব। প্রকৃতিতে অবহেলায় ছড়িয়ে থাকা 'কাঠাম' অবন ঠাকুরের 'কুটুম'-বাড়ির লোকজন। গাছের শিকড়, ভাঙা ডাল, বাকল, কাঠের টুকরো — এইসব কাটামদের জন্য তাঁর চোখ 'জোগাড়ে'। আর মন হলেন পাক্কা গিন্নী, যিনি এইসব কাঁচামাল দিয়ে উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন তৈরী করেন। বাগানের এক কোণে, ঝোপে-ঝাড়ে পড়ে থাকা এই সমস্ত অনাদৃত আত্মীয়দের দেখার কাজটি ভারি মজার — "এ চোখ সবসময় থাকে না। রোজ তো বাগানের রাস্তায় চলি, চোখে কিছু পড়ে না। কিন্তু যেদিন খেলনা গড়বার জন্য কাঠ খুঁজতে বের হই — টুপটাপ চোখে পড়ে যায় সব কিছু; — তুলে আনি"। এ গেল রসদ সংগ্রহের পর্ব। এর পরের কাজটিকে প্রাণদান পর্ব বা খাতির যত্নের পর্ব বলাই শ্রেয়। আপাত দৃষ্টিতে সামান্য ঠেকা এইসব কাঠামকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিতে যাওয়ার যে কাজ তার বেশিরভাগটাই আকস্মিক, অল্প কিছুটা পরিকল্পিত — "তাকে যত্নভরে দেখি। আলোতে দেখি, অন্ধকারে দেখি। এদিক দিয়ে দেখি, ওপাশ দিয়ে দেখি। হঠাৎ একসময়ে অদ্ভুতরূপে সে আমার কাছে ধরা দেয়।" অবনীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন যে 'কুটুম-কাটাম' পরিকল্পিত শিল্পোদ্যগ নয়, সে নিজেই তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে। 'খেলনা গড়বার' এই খেলায় তিনি যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ পেয়েছেন তা অবনীন্দ্রনাথের প্রায় আশিটি 'কুটুম-কাটাম' থেকে বোঝা যায়। সামান্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অসামান্যতা রূপ পেয়েছে 'জাহাজ', 'দুয়োরাণীর ছেলে'-তে। তালের আঁটির দেহ, বাঁশের টুকরোর ঘোড়া, হুঁকোর নলের পা, আই-এল স্ট্রবেরি জ্যামের টিনের রঙিন কাগজের রাজপোষাক পড়া এই 'দুয়োরাণীর ছেলে' ই কোথায় যেন রূপকথার সেই রাজপুত্র, যে বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে 'কুটুম-কাটাম'-এ নিজেকে খুঁজে পেয়েছে।

কিভাবের পর অবধারিতভাবেই চলে আসে 'কেন' এই 'পুতুল-গড়া খেলা'? প্রতিষ্ঠিত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্প জগতে এই নতুন আত্মীয়দের কেন আনলেন — এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া হয়তো সম্ভব নয়। ১৮৯২ সালে ২১ বছর বয়সে ছবি আঁকা শুরু। এর অব্যবহিত পরে সাফল্য, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা সবই আসে। কিন্তু হঠাৎ করেই তিনি ছবি আঁকা ছেড়ে দেন ও ১৯৩৩ থেকে 'কুটুম-কাটাম'-এর জন্ম। তবে, ৬২ বছর বয়সে এই খেয়াল কেন হলো তার আভাস অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের কথাতেই পাব— "...এক সময়ে ছবি-টবি ফেলে বসে গেলুম পুতুল গড়তে। চাকর দেখে লজ্জা পায়, বলে 'রং তুলি বের করে দিই'? কিন্তু কেন আমি বসে গেলুম ওভাবে কাঠ-কুটো নিয়ে? না, মন চাইতো নতুন কিছু নিয়ে খেলতে। .... কি জানি, মন ভরে না আর। সবই আয়ত্বে এসে গেছে, নতুনের আনন্দ পাইনে।" এই 'নতুনের আনন্দ' অনুসন্ধানের ফলই বোধ করি 'কুটুম-কাটাম'।

যে সামাজিক ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে অবনীন্দ্রনাথের জন্ম তা সব দিক থেকেই তাঁর শিল্পানুভাবের অনুকূল ছিল। চিত্রকলার প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণ পিতা গুণেন্দ্রনাথ থেকে প্রাপ্ত এবং একই সঙ্গে এই ক্ষেত্রে তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণ দক্ষতা এই বিশিষ্টতাকে অন্য মাত্রায় উন্নীত করেছে। কিন্তু, চিত্রশিল্পীর 'image' থেকে বেরিয়ে এসে, ব্যতিক্রমী শিল্প হিসাবে ভারবর্ষে 'কুটুম-কাটাম'-র জনক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর জীবন বাইরের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি অনুসারী ছিল যার ছাপ 'কুটুম-কাটাম' সহ তাঁর যেন কোন সৃষ্টিতে বর্তমান। শৈশবের কল্পনাপ্রবণ মন যেসব অভিজ্ঞতা ও ঘটনা সঞ্চয় করে রাখে, জীবন সায়াহ্নে এসে তার বহিঃপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী এবং অবনীন্দ্রনাথও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নন। এই কল্পনাচ্ছন্ন সূক্ষ্মতার সঙ্গেই যুক্ত হয়েছিল তার প্রকৃতি চেতনা। সৃষ্টির চরমক্ষণে এসে তাঁকে ও তাঁর শিল্প চেতনাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল প্রকৃতির কাছে; তাই শুধু শৈল্পিক বিচার নয়, 'কুটুম-কাটাম-এর মূল্যায়ণে প্রকৃতি চেতনাও অপরিহার্য— ".... শিল্পের দিক দিয়ে একে বলবো

'বন্ধু শিল্প', কারণ এর গঠনের মূলে রয়েছে একান্ত বন্ধুতা, — মৈত্রী সাধনের একটা সহজ দিক। তোমরা যা' ফেলে দাও আমি তা কুড়িয়ে নিই, — কুটুম্বিতা জমে ওঠে দিনে দিনে — এইটুকুই এ সব গঠনের মূল্য। আর কিছু নয় সত্যি বলছি"। সত্যই, প্রকৃতির সঙ্গে হার্দিক যোগাযোগ না থাকলে বোধহয় 'কুটুম-কাটাম' তার রূপ পেতো না। বর্তমানে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে বড় বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি বলে হয়তো এই 'আশ্চর্য শিল্প'গুলি বিরল। সত্যিকারের বিচার করতে গেলে তাই বাইরের বিশ্লেষণী 'নজর' অপেক্ষা অন্তরের দৃষ্টির ভূমিকা বেশি। ক্যানভাসের চার দেওয়ালে বন্দী কল্পনা আক্ষরিক অর্থেই 'কুটুম-কাটাম'-এ আরো একটি মাত্রা পেল। সাধারণ ভাস্কর্যের সঙ্গে এর তফাৎ এখানেই যে, দ্বিমাত্রিক চিত্রকল্প থেকে ত্রিমাত্রিক উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য হয়ে ওঠার আর্ত ও আরোপিত প্রচেষ্টা এতে নেই। একান্ত ব্যক্তিগত ও স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনার স্বাক্ষর এই 'কুটুম-কাটাম' এবং একথা বলা বাহুল্য যে, অবন ঠাকুর এই প্রয়াসে **সর্বাংশে** সফল।

প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি বিষয় এসে যায় — এই শিল্পকর্মগুলির যথাযথ বিবরণ ও সংরক্ষণের প্রশ্ন। কিছুটা উদাসীনতা, কিছুটা সময়ের প্রকোপকে দায়ী করা হলেও মূল প্রশ্ন থেকে যায় শিল্পীমনস্কতার। বর্তমান স্রোতের শিল্পী ও সে যুগের শিল্পীদের পার্থক্যটাই বড় বেশি করে চোখে ঠেকে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িকতার আগমন এসময়ে স্বাভাবিক, নিছক নির্মাণের আনন্দ শিল্পীমনকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। অবন ঠাকুর যথারীতি এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন যা আবার তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তবে এই শিল্পীসুলভ উদাসীনতার *জন্য* এমন কিছু নিদর্শন উপভোগ করতে আমরা বঞ্চিত হয়েছি যা বাংলা শিল্প জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী; এ কোন ক্ষোভ নয়, অনুরাগী হৃদয়ের আকাঙ্খা মাত্র। যে কোন ক্ষেত্রেই আমরা নতুনত্বের প্রত্যাশী; ব্যতিক্রমী উদাহরণকে অনুসরণ করার সদা উৎসুক মন আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় কারণ — "যত বেশি বেশি দেখব ততই আমাদের লাভ।"

চিত্র যেথা ভয়শূন্য

অঙ্গনা
প্রথম বর্ষ, দর্শন বিভাগ

প্রিয় শিক্ষাব্যবস্থা,

রবি কবির 'শিক্ষার অসন্তোষ' প্রবন্ধটি পড়ে হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে গেল, ভাবলাম তোমার খবর নিই, তাই লিখতে বসলাম চিঠি। তোমার সঙ্গে বহুদিন কথা হয়নি। আচ্ছা, তোমার কী হয়েছে বলোতো? দিনে দিনে অমন বদলে যাচ্ছে কেন তুমি? তোমার বুঝি আর আমার কাছে আসতে ভালো লাগে না? বিশ্বাস কর, তোমার কষ্টটা আমি বুঝি কিন্তু কী করব বল রাজার ওপর তো আর হাত নেই!! তিনি তো বড়ো বড়ো নামীদামী প্রতিষ্ঠান খুলেছেন সেখানে নাকি তোমায় সাদরে চর্চা করা হয়। সবই শোনা কথা। যখনই চাক্ষুষ করি হৃৎপিণ্ড কেঁপে ওঠে আর রাজার উলঙ্গরূপ ফুটে ওঠে চোখের সামনে। যখন দেখি রাজার কবলে পড়ে তোমার অস্তিত্ব একেবারে চৌচির, তখন মনে পড়ে যায় সেই কোন্‌কালে পড়া গল্পটা — 'হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী'। নাকে কানে কুলুপ গুঁজে, চোখে চশমা এঁটে, নাকে সরষের তেল দিয়ে মনের সুখে তারা নাক ডেকে চলেছেন আর আদর ক্ষমতাধারী চেলা চামুণ্ডাদের পাল্লায় পড়ে তোমার হালুয়া টাইট, ওমা! উনি নামী কলেজে পড়ান, দারুণ একেবারে, ওর নামে কিচ্ছুটি বলবেন না — এইভাবেই রাজকর্মচারীগণ আমাদের দেন চুপ করিয়ে।

জানো, চোখের সামনে যখন দেখি তোমার দেহব্যবসা চলছে, ইচ্ছে করে গুম করে দিই ওই শয়তানদের। না বোঝে তোমায়, না পারে বোঝাতে, ওরা বেচে খায় তোমায়! আর আমি কত বুঝতে চাই, জানতে চাই, ভালোবাসতে চাই তোমায়, আপন করে নিতে চাই নিজের সত্তায় — হু! ওরা তোয়াক্কাই করে না। তোমায় নিয়ে বেশী খোঁচালেই পরিশীলিত ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করে। তবেই 'ওরা' বলতে কাদের এত গাল দিচ্ছি, তাই তো? আরে ওরা গো ওরা — সেই নামকরা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যারা নিজেদের একেবারে সিদ্ধপুরুষ ভাবতে শুরু করেছেন একটা নামকরা প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেয়ে। রাজার প্রতিষ্ঠান, স্থায়ী চাকরি — আর কী, আনন্দে নেত্য করে। কলকাতার আনাচে-কানাচে গলির হরি ঘোষের গোয়াল ঘরগুলোতে গুঁতোগুতি করে ঢুকতে পারলেই রেডিমড নোটস, ব্যস গল্প শেষ। দিনের পর দিন এভাবে ওরা তোমায় বেঁচে খায়, আর তৈরী করে এক একটা গণ্ড মুর্খ। ওই গুঁতোগুতি করে ঢোকা অনেকের একজন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, এদিকে প্রশ্ন করো — আচ্ছা ফিলিজফির মধ্যে সাইকোলজি পড়তে হয় কেন? দেখবে নিরুত্তর মুখটা ভাবলেশহীনভাবে তাকিয়ে আছে তোমারই দিকে। এত বছর এই অচলায়তনে আছ কী করে তুমি? ইচ্ছে করে ছিঁড়ে, ভেঙে গতানুগতিক মূর্খামির জাল থেকে তোমায় বের করে আনতে — কিন্তু পারি কই? ওই যে মাথার ওপর বসে আছেন সংস্কৃতিবলে রাজ্যের সংস্কৃতিবান রাজা!! তার দাপটে আজ নামী কলেজগুলো রাজনীতির আখরা আর পানশালা হয়ে উঠেছে আর গুরুরা ভুরি বাজিয়ে গম্ভীর স্বরে কতকগুলো বক্তিমা মেরেই ভাবেন কী না কী করে ফেলেছেন, কচু পোড়া, তোমাকেই বোঝে না, তোমার চর্চা করে। সত্যি হাসব না কাঁদব মাঝে মাঝে ভাবি। খুব মন খারাপ লাগছিল জানো, তাই লিখে ফেললাম। কেমন আছো জানিও, উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি—
তোমার আমি

এ কোনো প্রেমিককে পাঠানো প্রেমিকার চিঠি নয়, আজকের শিক্ষাচর্চা এবং শিক্ষাগুরুদের নগ্নরূপ তুলে ধরার এক প্রয়াস মাত্র। এরকম প্রয়াস যে এই প্রথম তা নয় কিন্তু গণ্ডারকে হাজারবার গুঁতো মারলেও সে নড়ে না, এমনই অবস্থা রাজার এবং রাজকর্মচারীদের। খ্যাতনামা কলেজের ছাত্রী হিসাবে বলতে লজ্জা হয় যে আজ শুধুই গ্ল্যামার বিকিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে চলেছে। অন্তঃসার-শূন্যরূপ তুলে ধরলেই নম্বর হারানোর আশঙ্কা। গণফেলের প্রতিবাদে কফি হাউসের নীচে যতই পথসভা, মিটিং মিছিল করো না কেন তেনাদের কানে ঢোকে না, তারা প্রকৃত শিক্ষা-চর্চাকে বিসর্জন দিয়ে এই নগ্নতাকে বরণ করে বলেন — আসছে বছরে আবার হবে। মানে আবার গণফেল হবে, মিছিল হবে, স্লোগান দেওয়া হবে আর তারা পায়ের উপর পা তুলে মাসান্তে মোটা টাকা নিয়ে আয়েস করবেন আর আমাদের প্রাণ হবে ওষ্ঠাগত, ভ্যাগাবন্ড হয়ে ঘুরতে হবে পথে পথে। সম্প্রতি কোনো এক গণমাধ্যমে দেওয়া বিশ্বরাঙ্কিং-য়ে দেখলাম ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটারও স্থান নেই। এভাবে আর কতদিন চলবে বলতে পারো? বলতে পারো তোমরা? শিক্ষাকে যারা এভাবে বিকৃত করে ছাত্রদরবারে প্রতিপন্ন করেছেন তাদের জানাই ধিক্কার আর সবাই গলা মিলিয়ে বলি—

"হাল ছেড়ো নো বন্ধু
বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে"।।

जौहर की प्रासंगिकता

प्रियांका कुमारी सिंह
स्नातकोत्तर, प्रथम वर्ष, हिंदी विभाग

ये तो जग जाहिर बात है कि प्राचीन काल में जौहर व्रत की प्रथा प्रचलित थी। भले ही आज के समाज में उसे नकारा जा रहा है किन्तु यदि जौहर व्रत कारणों और परिस्थितियों पर दृष्टिपात करें और गौर करे तो पाएंगे कि जौहर करना पवित्र माना जाता था, किन्तु यदि कारणों पर ध्यान दें तो कि इसके कारण और परिस्थितियाँ अत्यन्त ही निन्दनीय है। आज का तथाकथित शिष्ट समाज उसे स्त्रियों पर अत्याचार का, पाखंड का, धर्माडम्बर का नाम देकर अपनी आवाजें बड़ी जोर-शोर से बुलंद करता हो। परन्तु सत्य तो यह है कि यह हमारे समाज की एक चिरन्तन सच्चाई है। प्राचीन काल में तो हम विदेशी अरब आक्रमणकारियों के जुल्म, अत्याचार, अनाचार तथा व्यभिचारो से बचने के लिए जौरह व्रत का पालन किया करती थी, परन्तु आज वर्त्तमान में तो हमें अपनों से ही खतरा है। हम अपने ही घर, राष्ट्र, समाज में सुरक्षित नहीं है। हमारी मर्यादाएँ, हमारी लज्जा, हमारी इज्जत खण्डित, विखण्डित हो रही है और हम निःशब्द, निरुपाय, निर्बल, मूक, विस्फरित, निनिर्मष नेत्रों से अपनी आबरू का जनाजा उठते हुए देखती रह जाती हैं।

हम सब जानते हैं कि जौहर व्रत का पालन मुख्यतः राजपूत राजाओं की स्त्रियाँ तथा कन्यायें किया करती थीं, आपनी सम्मान रक्षा के लिए। उस समय समाज के निचले तबकों में इस प्रथा का प्रचलन प्रायः ना के बराबर था। किन्तु आज हमारा देश जिस गति से यौन शोषण, बलात्कार में प्रगति कर रहा है, उसे देखते हुए आज भी जौहर व्रत प्रांसगिक बन पड़ा है। बल्कि यदि यो कहें कि सिर्फ जौहर ही क्यों भ्रूण हत्या, कन्याजन्म के पश्चात् नदी या सरोवर में बाल कन्या प्रवाह, सतीदाह प्रथा आदि की भी आवश्यकता आज हमारे देश, समाज, तथा राष्ट्र को है। ये सब हमारे भावी हिन्दूस्तान भविष्य को नितान्त आवश्यक माँगो हैं।

चूँकि जौहर और सतीदाह प्रथा एक दूसरे के समानान्तर प्रतीत होती हैं। इस सतीदाह प्रथा को हमारा तथाकथित शिक्षित शिष्ट तथा सम्भ्रान्त समाज शिक्षा का प्रभाव मानता है, तथा इसे स्त्रियों पर अत्याचार, शोषण का नाम देता है। कहीं कहीं तो भाँति-भाँति के प्रदर्शन, धारणा, आन्दोलन, अनशन तक भी होता है। किन्तु यह सब कुछ एक दिनों के लिए ही है। धीरे-धीरे फिर वही चुप्पी छा जाती है और गर्म मामला कैसे ठण्ड हो जाता है पता भी नहीं चलता।

जहाँ पर स्त्रियों की सम्मान रक्षा का प्रश्न उठता है वहाँ सभी मुख खामोश हो जाते हैं। यदि गोधरा और नन्दीग्राम जैसी तमाम घटनायें आकस्मिक रूप से हमारे दिलों-दिमाग पर ही छाप छोड़ गयी हैं। असल में ये सारी घटनायें हमारे हिन्दुस्तान की त्रासदी बन चुकी हैं। आज हमारी माताओं, बहनों, बच्चियों, बोटियों का दामन ताड़-ताड़ हो रहा है, भारत माता की मर्यादा उनके ही सपूतों द्वारा लुटी, नोची जा रही है, स्त्री की प्रतिमा को खण्डित किया जा रहा है, नारी जाति जोकी किसी भी देश, राष्ट्र, समाज का प्रतीक होती हैं, उसे आज भी द्वापर युग की द्रौपदी की भाँति निर्वस्त्र किया जा रहा है, उसे सड़कों पर, चौराहों पर, नुक्कड़ पर घुमाया जा रहा है तथा हिन्दुस्तानी, ये हमारा तथाकथित शिक्षित, सभ्य और संभ्रान्त समाज आँखे फाड़-फाड़ कर इसका नजारा ले रहा है, अपनी आँखे सेंक रहा है और उसमें सहानुभूति का, आनन्द का अनुभव कर रहा है।

यहाँ पर एक गंभीर प्रश्न की सृष्टि होती है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो देश का भविष्य क्या होगा? दरअसल यह विडम्बाना हमारे समाज की है। समाज में पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से हमलोग इतने कामी, व्यभिचारी हो चुके हैं कि आज वर्तमान की दहलीज़ पर खड़े होकर मान्यतायें, अभिलाषायें, फर्ज़ आदि को पैरों तले कुचलते जा रहे है, रौंदते चले जा रहे है। मर्यादायों की छाज्जियाँ उड़ती जा रही है तथा कनक और कामिनी ही इस संसार का चिरन्तन सत्य बनते जा रहे हैं। हमने पुराणों, गाथाओं में सुन रखा है कि-

"यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लार्नि भवति भारतः
अम्युत्थान अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधुनां
बिनाशाय च दुष्कृताम्
धर्मसंस्थापनार्थायं संभवामि युगे युगे।"

अर्थात् जब-जब धर्म की हानि होती हैं तथा अधर्म का बोलबाला होता है तो दुष्टों का दलन करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। द्वापर युग में तो कृष्ण ने अवतार लेकर, त्रेता युग में राम ने अवतार लेकर दृष्टों का संहार किया था, किन्तु आज का हमारा तारणहार कौन है और कहाँ है जो हमें इन पापियों मे उद्धार करेगा? या फिर धरती के पाप को देखकर देवलोक में वास करने वाले देवों को भी लज्जित होना पड़ गया तथा सोचने को बाध्य होना पड़ा कि अवतार ले या न लें? जो भी हो, सबकुछ जानते समझते हुए भी हम मूक तथा निर्निमेष बने रहते हैं तो ऐसी स्थिति में एक अबला को अपना चेहरा छुपाने के लिए कौन सा रास्ता बचे। एक स्त्री को, जिसकी लज्जा के साथ बारम्बर खिलवाड़ किया जाए, उसकी लज्जा का सामूहिक शोषण हो, वो आखिर जाये तो कहाँ जाये? आज की शिक्षित महिलायें जो कि ऐसी जुल्मों का शिकार हैं उनमें से एक आध ही अदालत का दरवाजा खटखटाती है, बाकी अधिकतर या तो आत्महत्या, आत्मयाद, या फिर बलात्कार के बाद मार डाली जाती हैं। यानी मरना हर हाल में है। समाज का एक और वर्ग है जो निम्न बर्ग के नाम से जाना जाता है तथा सबसे ज्यादा शोषण, मान-मर्दन उन्हीं का होता है। उनकी स्त्रियों के साथ जबरदस्ती की जाती है। उनकी मान-मर्यादा, इज्जत के पतंग की तरह उछाला है। यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान न निकला तो वह दिन दूर नही जब इस समाज में फिर से जौहर भूमि बन पड़ेगी और यह जौहर की अग्नि शायद कलयुग में ईश्वर को अवतार लेने पर बाध्यकर देगी।

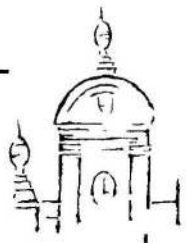

পথ ধরে বেড়োবার আগে...

(পূনমুর্দ্রণ বিভাগ)

The Liberal Ideal

PROF. AMLAN DATTA
Ex-student

Almost all over the civilised world liberalism is in disgrace today. It has been trampled on by the Fascists, held in bitter contempt by the Communists, confidently criticised by the Socialists and only apologetically defended by the Liberals themselves. And it is not for nothing that liberalism has met this fate. Liberal institutions have failed; they have failed to satisfy the only test that counts, the test of their adequacy to meet the problems of our time.

Liberal instutions have failed to fulfil the promise that they once held out so confidently. Yet the failure of liberal institutions does not mean the failure of all that liberalism stood for. Liberalism stood for a certain spirit, certain ideals which it thought could be realised through the institutions it came to defend. We may be firmly convinced of the inadequacy of these institutions and yet recognise the value of the idea liberalism preached. The suggestion that what liberalism preached as an ideal may have a more permanent value than what it taught about social institutions need not appear surprising. It is not unoften that state-ments of differing degrees of generality find place within the fold of a single system of thought; and even when some of these statements are rendered obsolete with the passage of time, other statements of a more durable nature may retain their right to recognition. It is only in a limited sense that a doctrine is apt to be all of a piece; and in practice we may even reject a doctrine— as we may reject liberalism—while we take over the more permanent part of its contribution.

In claiming that the liberal ideal has not lost its value even though liberal institutions stand discredited, it is not suggested that the ideal has completely escaped the influence of the institutions. As a matter of fact, even the theoretic conception of the ideal has been, in the case of many liberal thinkers, rendered confused and incomplete through the influence of mistaken ideas on economic and political institutions. To take at this state only one example, liberal economic doctrine toyed with the idea of "the economic man", and it can reasonably be suggested that this idea obstructed the working out by the liberals of such a complete conception of human nature as an adequate statement of their ideal requires. Yet with all its incompleteness, the liberal ideal has a heart that deserves respect. And liberals with a clear recognition of this essence of their creed have not been entirely absent.

The essence of the liberal ideal lies in its insistence on the value of the individual. Spiritually, individualism and liberalism are inseparable associates. The individual, it has been asserted, is the ultimate centre of all experiences; happiness is a state of consciousness that in any final analysis, can only belong to the individual; and therefore the happiness of society as a whole can only mean the aggregate happiness of the individuals who compose it. If happiness is a good, it is individual happiness which ought to be promoted. It has further been asserted that while every individual is a member of a community, he is in a quite fundamental sense unique; that even when his experiences resemble those of others, the way and the order in which he receives them are stamped with his own individuality and it is a violence to his nature to force him to integrate his experiences in conformity with a generally prescribed pattern. The individual in short should have maximum freedom to arrive at such unique integration of his personality as his distinctive nature demands. Freedom of the individual being the supreme and neither custom nor tradition nor any institution, nor even the state, may claim the allegiance of the individual irrespective of its function in promoting freedom. Restriction on the freedom of any individual is never desirable as such, but should only be introduced when it is calculated to extend to a greater degree the freedom of others.

In what has been stated above the crucial propositions are, firstly, that the happiness of the individual is supremely valuable and secondly that the individual should have maximum opportunity to develop his own distinctive personality. These two propositions are not unrelated. It has been claimed that happiness of the individual depends on the freedom that he enjoys to develop his individuality, on his power and opportunity to integrate his impulses and experiences in a spirit of sympathetic acceptance of their peculiar character. When external compulsion results in the repression of some vital human impulse, there is often a tendency for the repressed impulse to take revenge by reappearing in a form which is both less conducive to the inner contentment of the individual and more antisocial than the originally repressed desire. To take an example, the

impulse of love, when checked, may issue in the form of corroding cynicism or even of wanton cruelty. In the interest of individual happiness it is necessary that society should be reluctant to repress individuality and should be enthusiastic in its promotion. It has further been claimed that active promotion of individuality is calculated to assist not only individual happiness, but also social progress. It is possible to confront this claim with the objection that what is valuable for social progress (and for individual happiness alike) is not all types of freedom but only certain chosen types. It may, for instance, be urged that freedom to create beauty is valuable while freedom to produce ugliness is repugnant, freedom to experiment with truth is desirable, while freedom to propagate falsehood is harmful, that in short the value of freedom depends on the ends that it serves.* A full consideration of such objections may lead one to introduce greater balance in one's emphasis on freedom, but need not induce one to withdraw that emphasis. It is good indeed to recognise that a certain basic discipline is often necessary in order that freedom may be fruitful, but the value of such discipline lies ultimately in its poer to extend freedom and to enable us to undertake adventures in realms that were pre-viously closed to us. Where imposed discipline is glorified without reference to its relation to freedom, both happi-ness and progress stand in danger of being sacrificed. Hence the importance of emphasizing that freedom and not discipline is of primary value.

Where liberals stand for freedom in opposition to an authoritarian tradition or the totalitarian state, what they intend to emphasize is not that all discipline is fruitless, but rather that discipline, in actual practice, is being carried to a point where it ceases to be an ally of freedom and becomes a burden on society. Even conceding that freedom in search of truth and beauty is more important than freedom to pursue their opposities, the question remains whether the cause of these great ends is likely to be served best by the state or any other institution dictating to the individual what constitutes truth and where lies beauty. If we consider the glorious centuries in European history following the Renaissance, with their splendid achievements in natural and social sciences, in art and philosophy, we find that in striking contrast to the monotonous Middle Ages, they offered a wide field for rival trends of thought to flourish together and that it is this capacity to accommodate conflicting points of view which made possible that amazing progress of thought which was witnessed at that time. It seems that thought, released from crippling conformity to tradition and authority, was set a liberty to follow its own laws of development, dividing itself into apparently contradictory trends returning through some great thinker to an attempt at synthesis and branching out again in different directions. It is only through such continuous differentiation and integration, divergence and convergence, that thought can make progress in increasing understanding of manysided reality. It is essential for the unhampered development of thought to allow a plurality of conflicting systems to grow together towards even-widening synthesis, if only because there are endless aspects to reality, and understanding of all these diverse aspects cannot possibly mature within the fold of any single system, however imposing it may appear. For progress of thought it is necessary, therefore, that different individuals should be left free to elaborate their own views of reality without being required to conform to any commonly accepted system. The maximum that may be insisted on is that a person who undertakes an adventure in the realm of ideas should liberally acquaint himself with the more outstanding experiences and conclusions of earlier thinkers. Subject to this basic discipline there should be extensive freedom in the field of thought.

It is permissible and is even necessary to point out that artists and intellectuals have their social responsibilities but it is wrong to be impatient with individuality out of an exaggerated or a misconceived regard for these responsibilities. Those who are engaged in creative pursuits require the support of a sturdy individuality in order to rise to their full heights. For the artist and the thinker it is especially important to preserve the capacity to enter into those personal depths where great ideas are born and great works of art fashioned. Though the experiences that an artist or a thinker receives are largely social in origin, he has to be alone with himself in the privacy of his depths in the gripping task of integrating these experiences into systems of thought and works of art. So much of the highest of human experiences is available to us only in moments of impregnable privacy that a too exclusive emphasis on the virtue of sociability is likely to make life superficial and insolently unaware of its richest possibilities.

Thus both for social progress and for assisting the individual to grow towards the highest experiences of which he is capable, it is necessary, within obvious limits, to retain the liberal emphsis on the value of individuality.

The liberal emphasis on the value of individual freedom played a liberating role when it was first

introduced. Since then circumstance shave changed greatly. But the significane of the liberal ideal has not thereby been exhausted. It might have been exhausted if in the meantime individual freedom had been firmly secured and conditions hostile to the growth of totalitarianism had grown up. That has not been the case. Not less, possibly more, than in the hey-day of liberalism we have today objective conditions which make possible severe regimentation of society. And if there exist today objective conditions making social regimentation a possibility, we have also people with the will and the philosophy to turn this possibility into an actuality.

Those who value individual freedom have to find out ways and means of organising society in a manner that assists the growth of freedom. In arriving at a new conception of social organisation adjusted to the claims of freedom we have to perform a three-fold task. We have, in the first place, to formulate clearly the conditions that must be satisfied in a future society if that society is to succeed in the task of preserving and promoting freedom. It may, for example, be noted that in any such society the individual must be in a position to enjoy that intricate pattern of freedoms which passes under the title of economic freedom; that he must be free from all such political and social compulsions as are not demonstrably in the interest of freedom, rightly conceived; that the culture of such a society must be zealous in emphasizing values, but hesitant in prescribing the ways in which these values can or ought to be realised in life; that in particular, there should be emphasis on reason and "charity" whose guidance can be widely neglected in the regulation of individual life only at the risk of allowing experiments in individual freedom to pave the way to choas, and in reaction from it, to regimentation. Secondly, it is necessary to take into account the materials, present and available today, out of which the society of tomorrow has to be built. To take only one example, the growing technology of our time must be accepted as part of those basic materials which, for good or evil, shall enter into the fabric of future society. Finally, we have to find out how, out of available materials, it is possible to build up forms of society and types of culture, satisfying, to the greatest possible extent, the conditions of freedom.

In framing our ideas regarding the institutions that we require in the circumstances of today for promoting the freedom of the individual, liberalism in its traditional form can offer us little positive guidance. Orthodox liberalism came to associate itself with institutions which, on the evidence of history, have proved their capacity to destroy the ideals which they were supposed to promote. It came to defend the system of private enterprise which has given rise to a high degree of concentration of capital in a few hands, a resulting intensification of class conflict, chaos, on a considerable scale, in the field of international trade and general economic stagnation. It put its faith in the system of parliamentary democracy which satisfies itself with popular elections and representative government. It is a fair index of the inadequacy of this system that Hitler came to power through a popular election. Political democracy will remain fragile and ineffective until it provides for something more than formal "representative" government. It must build itself on education that arms the people with a sense of the importance of their rights and with the knowledge of how to defend them, and extend itself to include economic democracy and to adopt wide spread devices for ensuring direct popular control over and participation in vital legislative and administrative functions. Orthodox liberalism, again, has been, ever since its inception, in firm alliance with nationalism. It can be shown that under prevailing circumstances any country that attempts a purely nationa-list solution of the problems of our time is practically certain to drift towards anarchy, militarism and totalitarianism, which together constituted a tragic negation of the liberal ideal. The liberal ideal is inconsistent with unconditional loyalty to any such arbitrary group as the nation: it must find its logical and its spritual basis in individualism, on the one hand, and humanism on the other. Humanism, and not nationalism, is the natural ally of individualism : the individual in the depth of his nature is a man, and not a member of an arbitrarily demarcated group. Nationalism has not only provided liberalism with an institution unsuited to its spirit; it has prevented liberals from realising clearly the fullest import of the ideal they stand for and, to that extent; it has corrupted the very spirit of liberalism.

To state the liberal ideal in its purest essence, and to suggest ways and means of enthroning that ideal in social life, through institutions which many orthodox liberals may be among the first to oppose, is an important task of our age.* Those who will undertake to fulfil this task will possibly arrive at an ideology which is so far removed from orthodox liberalism as to deserve an altogether new name; but in thus discarding liberalism, the builders of the new philosophy will have paid back their debt to it in the only way in which spiritual debts are repaid.

On Knowing : An Attempt at a Linear Epistemological Model

DIPANJAN RAI CHAUDHURI
Ex-student, Second Year M.Sc., Pure Physics (Outgoing)

[For The General Reader : If the sentences preceded by a single star (*) and the paragraphs preceded by the dagger sign ( ) are omitted, no pre-knowledge of abstract algebra is needed though it is helpful. All the mathematics needed is developed briefly except for the sentences and paragraphs referred to above and the mathematical interlude which ends at the double star (**). In fact most of the article is for the general reader.]

This essay is not written for students of formal philosophy. The author will therefore freely use without apology terms like "mind", "quality", "category" etc., which it would take several treatises to explain. The author wishes to place certain problems of the theory of knowledge before students of the disciplines which are concerned with extracting the raw materials of knowledge — physicists, economists, psychologists, perhaps mathematicians (and others). Perhaps it is sometimes worthwhile to cogitate on what we really have extracted and why and how we do it.

Basic Limitation :

What we know is ultimately composed of sensations and concepts formed in the mind. Let us label any such elementary mental construct as x(i) where i is an index. The term "elementary" is relative. We may, for example, take x(i) to be the mental view of the colour red. But we may break this up into smaller components : the feeling, the affect (*sic*) associated with the colour in my mind,the precise location in the spectrum where I place this colour and the breadth of the area I call red, and so on, each of which I may label x(i). Therefore, "elementary" takes meaning with reference to the problem in hand. The set of all possible elements x(i), comprising all the possible elements that can arise in the human mind in future, the elements that exist at present in my mind, in your mind, in the minds of every person exixting at this instant, and the elements that have existed in the past, will be denoted by S, and called the sense space. The basic limitation is that *our knowledge can, in the final limit, take from only within S.* If reality exists outside S and S distorts this reality then the distortion is irreducible. This is a disheartening limitation. Scientific knowledge is obtained through experiments : actions on nature, reactions, and their interpretation. The interpretation rests finally on the connexion between the different steps of argument, based on logic. If logic, which springs from the mind, be inapplicable to external reality we cannot hope to know anything, ever. This possibility is not really farfetched. E.g. the mind believes in the Principle of Causality : The same cause, *i.e.* the same sequence and assemblage of phenomena at one time point, leads to the same effect, *i.e.* the same (though possibly different from the case of the cause) sequence and assemblage of phenomena at the next time-point. But quantum physics claims that in most cases a single cause is associated with several possible effects, with varying degrees of probability associated with them. Sometimes one effect with varying degrees of probability associated with them. Therefore, basic contradictions arise even within S. The problem of the relationship between S and reality is enormously more complex. Even mathematics founders on the rock of Godel's theorem : In the system of arithmetic propositions exist which cannot be proved or disproved using the axioms of arithmetic and the laws of logic (consistency). People wonder if this holds for all logical systems.

The basic limitation sharply defines the boundaries of knowledge.

The easiest way out is to suppose that S is immutable, existing from time immemorial to time unforseeable, complete and closed, with no interaction with anything else, so that the question of anything else does not arise. Phenomena and change are only apparent : every thing is a part of the Red King's dream. This view has close connexion with certain schools of Hindu and Greek philosophy. We shall start from the opposite view-point.

Postulate I : *The apprehension of objects or*

entities outside the mind by the mind, e.g., the apprehension of a pencil, embodied in a certain element, x(i) belonging to S or a collection of such elements is started from some actual entity present outside the mind.

If we collect certain elements x(i), say n in number, purposefully, i.e., if the elements have an underlying unity in choice, e.g. for the pencil the elements of colour (wavelength, velocity, amplitude), solidity (intermolecular spacing, forces, stability, amplitudes of oscillation etc.) etc., then the collection represents a distinct entity which we call a sense n-tuple, or sense-tuple, or s-tuple x. x corresponds to the pencil or to one aspect of it.

Let x correspond to the material aspect of the pencil in S, i.e., what it looks, feels, sounds like (we can be precise and list coefficients and constants of physical, chemical etc. properties) and y correspond to the uses of the pencil. Clearly x and y together mean something definite and sensible. Let us try to give some mathematical formalism to the concepts of the last two paragraphs.

Categories :

Let us prepare a number n of categories for describing any mental construct in terms of (mentally created) scientific concepts : refractive index, wavelength, dissociation constant, intelligence quotient erythrocyte sedimentation rate, adrenal cortex activity, the law of large numbers and so on. Conceivably, n might tend to infinity, denumerable or non-denumerable. If no restriction was made for convenience of handling n might tend to a continuous infinity. However, no details can be pursued in a general essay of this character.

Every phenomenon under examination can then be categorised. If the total n umber of categories n is defined as the miximum of all possible divisions into categories of all possible phenomena, then every phenomenon can be given n categories by placing a null entry O(i) in the categories we do not apply. O(i) is supposed to be a member of S. Then every phenomenon examined can be formalised as a sense n-tuple x consisting of n elements of the type x(i) belonging to S. If we always take the n categories in a definite order the n-tuples are ordered. A geometrical picture of the different categories marking out different directions in an n-dimensional space emerges and the formalisation becomes easy. Science is the filling (after preparation) of the categories.

The Nature of the Spaces of the x(i) and the x :

We associate two elements x(i) and x(j) of S, *e.g.*, we take the wavelength of red light and the intensity of the red light from a traffic signal. The result is a meaningful concept in the brain combining the two elements i.e. we get another element of S *viz.* x(k). We write

(1) $x(i) + x(j) = x(k)$

Evidently, (2) $x(i) + [x(j) + x(k)] = [x(i) + x(j)] + x(k)$

(3) $x(i) + o(i) = x(i)$ for every x(i) in S

(4) $x(i) + x(j) = x(j) + x(i)$

The mind is a powerful entity. The red wavelength and the rather low intensity are simultaneously apprehended and formed into a new concept. From this compound view we may discharge the low intensity and still retain a concept of redness. The concept of subtraction creeps in :

(5) There exists a process inverse to +. The element in the mind that is instrumental in removing a mental construct from consiciousness we denote by— 1(i) [+ 1(i) naturally appears as the element of cognition]. We define a new operation between any two elements of S which we symbolise by writing the elements in juxtaposition : x(i) x(j). The operation is not very easy to define. It is the abstraction from statements like "the *colour of a sphere*". The difference with + is clear. + is abstracted from statements like : "The pencil is *solid* and *red*."

Then, $x(i)\,x(j) = x(k)$ belonging to S. We write $-1(i)\,x(i) = -\,x(i)$. Clearly $x(i) - x(i) = O(i)$ – (5).

We are led into problems because we have to consider statements like "the colour of noise". The essay was written in a hurry just before the magazine went to the press and there was no time to analyse the point. Side-tracking is simple. In actual search for knowledge we shall discard such combinations and so no contradictions will ensue. The situation is somewhat similar to the case of the real numbers. They form a field except for the fact that zero has no inverse. No problem arises in the cases that can be treated by real analysis because we forbid division by zero.

With this new operation the laws (1) to (5) are valid except for (4) with 1 (i) playing the role of O(i). The inverse operation exists : From the concept "the

colour of a sphere" we can take away mentally "colour" or "sphere" leaving a meaningful construct. Therefore, the operation "of" can be annulled.

(4) obviously does not hold. "The intensity of red" is different from "the red of intensity" The first makes sense, the second is inadmissible. ∴ x(i) x(j) ≠ x(j) x(i). (*However, there is no need to distinguish between right and left unit elements or inverses, as will appear on a little thought.) left multiplication and right multiplication therefore differ in quality. This is quite a happy conclusion *e.g.* for a limited range of description, the left and right quantities in phrases like "the colour of a sphere, "the intensity of red", "the separation of the electrons" differ in quality. Again there was no time to go into this interesting point.

The reader is left to justify

(1) x(i) [x(j) + x(k)] = x(i) x(j) + x(i) x(k).

e.g. the *colour* of a *red solid* = the *colour red* + the *colour* of a *solid.*

In fact, if a particular solid is being thought of both sides reduce to *red.* (10) is not very strong. The scope is also limited.

Let us now consider the space formed by all x = [x(1), x(2), ... x(n)], say S(n). Consider two such sensetuples x and y. For brevity write x = {x(i)}
We define (1) X + y = {x(i) + y(i)}

= [x(1) + y(1), x(2) + y(2), ...]

(2) y (i) x = {y(i) x(i)}

and xy(i) = x(i) y(i)}

*It is easily seen that S(n) fulfils all the conditions for a linear space exept the condition that a linear space is defined over a field. However, all the usual properties of a linear space may be reproduced, remembering the non-commutability of the x(i).

Very often we shall have to consider ceratain properties of a whole sensetuple. The concept of a scalar product enters naturally. We define the scalar product of x and y as x.y = x(1)y(1) + x(2)y(2) + ... x(i)y(i) + ... x(n)y(n).

We find x.y ≠ y.x in general.

*In the case of infinite demensions the questions of convergence will arise. *A rigorous pursuit will lead to problems of completences etc. leading to a Hilbert space.

From our point of view the dot product is unduly carmping because the final result is an element in S. The really useful result would be the embodiment into another sensetuple. Something like an outer product associating two sensetuples to obtain a third sensetuple should be introduced. Unfortunately, there was no time to pursue these highly interesting and complex points. Perhaps further analysis may be undertaken later. Perhaps some-one more qualified might undertake the attempt with more fruithful results.

Reality :

The external entity giving rise to x(i) in S we denote by y(i). The space of all the y(i) we call the essence space, E.

We must now know the relationship between x(i) and y(i). From the mentally apprehended qualities x(i) of the essence elements y(i) we must reach to the elements y(i) themselves. The easiest way out is to assume that from the x(i) no information regarding the y(i) can ever be worked out because the x(i) do not spring from the y(i) but are projected by the mind on the y(i). This view is not very appealing in its ultimate limit. We can distinguish between a pencil and a pen. On this view the apprehended difference is not due to the intrinsic differences between the pencil-essence and the pen-essence but arises simply from an effectively random selection from the non-denumerably infinite choices present before the mind. We do not adopt this view and introduce.

Postulate IIA : *To every x(i) in s there corresponds a unique y(i) in E which produces the x(i).*

Hence a subset E^1 of E generates S. If there are elements in E which are not apprehensible mentally (as is possible and in fact probable) E^1 will be a proper subset of E. Then the complement of E^1 will not come into our scope and we can lable E^1 as E.

Postulate IIB : *To every y(i) corresponds a unique x(i) in S.*

Postulate II (A & B) establishes a one-to-one correspondence between E and S.

Postulate IIC : *The association of the elements of S through + and "of" leads to the elements of S which corresponds to that element of E which is obtained by associating the elements of E which correspond to the first-mentioned elements of S through operations existing on E analogous to these operations on E.*

Postulate II (A, B and C) establishes an isomorphism. Between E and S. E and S have the name logical structure now.

Another postulate is required because there has existed practically from the beginning of logic an excruciatingly painful isolationist trick. Let us suppose 1 and 2 are two human beings with normal colour vision. Let us suppose that there are only two colours in the universe, blue and red, without any intermediate tones. Let us call the colour impression on 1 of his blue B1 and his red R1 and the colour impression on 2 of his blue B2 and his red R2. Then if B2 = R1 and R2 = B1 it would escape detection. It would not be possible to distinguish this case from the case comprising R1 = R2 and B1 = B2. The rose that 1 calls red, 2 also calls red—because both were so taught from childhood. But the colour 1 sees in the rose is the colour 2 sees in the sky and *vice versa*. So we need the following postulate :

Postulate III : *Allowing for individual variation the particular form of one-one correspondence established between E and S is essentially the same in every mind.*

The following argument may be advanced : If experimentally mental activity is shown to reside in the brain (more generally the nerve, brain all complex) and if the brain cells of 1 and 2 are shown to be identical, is not the postulate side-tracked? No. The identification clicks in some-one's brain cells and so we come to the central problem of the circular argument.

The Equation of Knowledge :

We have postulated the isomorphism of E with S.

An E(m) is defined in the same way as S(n) with all the same operations. Now, it is trivial to prove m = n. Mathematically, this follows simply from choice of bases. We give an intuitive proof : A mental category is a mental construct and so crresponds as part of a one-one correspondence with one and only one essential category.

When we formalize the correspondence between E and S we arrive at the *equation of knowledge* : x = By where B is an operator symbilising the operation of the brain complex in taking the impression from the essence space E to the brain or sence space S.

From this place to the double ** there is a mathematical interlude.

Let us investigate the structure of the space of all B.

If x1 = B(y1) and

x2 = B(y2)

Then (1) x = B[y1+y2]

= By1 + By2 in the linear approximation.

and (2) B[y(i)y] = x(i) by in the same approximation.

where x(i) ↔ y(i)

(1) seems sensible enough. (2) needs closer scrutiny. What corresponds in essence world to the "intensity of red" we may write "if of r". On applying B to i and r separately we get "intensity" and "red". Combining by "of" we get "intensity of red" again. However, close study is required to justify this assertion (2).

The operations B are not strictly therefore linear.

The operators B can be made isomorphic to and replaced effectively by two-dimensional arrays of brain activity coefficients b(ij) where i and j each run over 1 to on. The arrays will not differ appreciably from the matrices we know except for differences arising from the rule B[y(i)y = x(i) By . These may be treated consistently by requiring that the operation "of" has no meaning when two elements from E and S or E and S(n) or E(n) and S are in question. The E or S element which is a misfit is replaced by the S or E element (respectively) which corresponds. There was no time to go into the ramifications of this point or the step by step reduction of the operator into a matrix in terms of a suitable basis (extracted from the cate-gories). To this extent this part of the essay is unverified.

The usual matrix-ntuple multiplication lawy may be taken over into the multiplication of the brain-array and the essencetuple. **

Materialism :

Then the law x = By breaks up into n equations

x(j) = b(i1) y(1) + b(i2) y(2) + ... + b(ij) y(j) ... + b(i n) y(n), i runs from 1 to n.

The law of multiplication has been used formally. The strong physical ground becomes clear when we make the following postulates.

The elements of brain activiy may be broadly divided into two classes : (1) in formation gathered directly through our sense from essence materical via the equation of knowledge. (2) information handed down genetically from our ancestors.

Postulate IV : *The two sets of information are of the same nature i.e. the set S is not divided.*

This is the crucial assumption of materialism.

As each element b(ij) and y(j) belong to E the law of multiplication used in the expansion is the "of" law in E.

The expansion shows that x(i) belongs to E. This means that E and S which were taken to be isomorphic are actually one and the same space i.e. brain impressions e.g. throughts and emotions are as much natural phenomena as earthquakes and revolutions. The B are therefore always operators mapping E into E.

Knowledge and its Limits :

The problem of knowledge is a know the y(i). The x(i) we know. Then if we know the b(ij) the y(i) be solved out if the inverse of B exists. The concept of the inverse is elucidated below.

By multiplication of two operators we mean successive application. This may be concretized through the usual law of matrix multiplication. Then B^{-1} the inverse of B is defined by B^{-1} B = I (left inverse) and BB^{-1} = I (right inverse) where I is the unit operator which just maintains status quo.

The indentification of E with S identifies x(i) with y(i) and makes B a truly linear operator. We now use the very general theorem of abstract algebra (Birkhoff and Maclane ; chapter on groups; Rudin : chapter on several variables) : A one-to-one linear correspondence (a linear operator that is one-one on to) is invertible. x = By can then be written as $y = B^{1}x$ ands directly solved if the b(ij) are known. This process is the study of brain activity. As it is one part of the brain *Postulate IV* : The two sets of information are of the same nature that must study another the process will be something like the following. We take a n stuple b from the b(ij) belonging to E(n) and operate with an operator C belonging to the set of the B to obtain a n tuple

c = Cb belonging to S(n)

We retain the previous terminology of E(n) and S(n) because when we refer to the element in S(n) we imply direct apprehension and when we refer to the element in E(n) we know that the element is actually identified with some element in S(n) although quite a deal of thinking and analysis of material and mental phenomena must be made before the indentification is a matter of direct apprehension, although even direct apprehension will not be as direct as it sounds.

Now c is known. Therefore, b i.e. the b (ij) will be known of the c(ij) making up C are known. The different y will be known if the different operators B1, B2, B3 .... etc. are found. The latter knowledge we are transferring to the set of the C. In general one B will give rise to n C.

Three things are possible as the process continues.

(a) The subset of the C will grow at a rate slower than the subset of the B i.e. we shall be able to choose the C in such a manner that although the B are all different some of the C will be the same.

(b) The subsets may grow at the same rate.

(c) The C subset may grow faster.

(a) means that in the attempt to analyse brain activity we are being able to explain more and more in terms of less and less. This is positive progress in knowledge. The other two possibilities indicate zero or negative progress. Upto now the process seems to have followed (a). But the prospect is in no way very rosy. The process of reduction will become more and more difficult as we approach towards the limit which may be a zero which can never actually be reached or a certain irreducible core. Moreover the ghost of Poincare warns us that in this process of successive approximation, after a stage (a) may change through (b) to (c). In this case also progress stops at (b), though the ineducibility is now dynamic.

This is as far as we will go in this essay. There is an artificiality in the attempt in so far as the formalisation has been with an eye towards the discipline of linear algebra. Perhaps this is not the mathematical formalism most suited to this kind of analysis. But the fact that no aesthetically repulsive postulation has been used suggests that the form need only be broadened and deepened. Linearity can only be a first approximation as it assumes (1) no interaction between elements leading to a complete sense aspect elements before and during passage into the sense space via the brain complex.

Indulgence is solicited for lapses in rigour, naturalness and perhaps mathematical soundness as the survey is so preliminary and deductive in character.

'পথের দেবতা'র উৎস সন্ধানে

তপোব্রত ঘোষ

।। এক ।।

'পথের দেবতা' এবং বিভূতিভূষণ

'পথের দেবতা' বিভূতিভূষণের সারস্বত জীবনের আরাধ্য পুরুষ। তাঁর অন্তরতম মানসলোকে এবং কথাসাহিত্যে এই 'পথের দেবতা' চেতনার উদ্ভব ও বিচিত্র বিকাশ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। অথচ বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পঁচিশ বৎসর পরেও সমালোচকেরা তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কৃতির বিচারে 'পথের দেবতা' চেতনাকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয় না।

সাহিত্যজগতে দুই জাতের শিল্পীর দেখা মেলে। প্রথম জাতের শিল্পীর জীবনের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের কোনও সাদৃশ্য নেই। বাংলা সাহিত্যে এর দৃষ্টান্ত মধুসূদন। আবার আর-এক জাতের শিল্পীর জীবনই সাহিত্যে রূপায়িত হয়। তাঁরা জীবনশিল্পী। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'কবিজীবনী' প্রবন্ধটি স্মরণ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ "কোনও ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে ও জীবনের কর্মে উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন। কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল।" —এই অর্থে বিভূতিভূষণ জীবনশিল্পী। 'তৃণাঙ্কুর' গ্রন্থে বিভূতিভূষণও বলেছেন ঃ "সাহিত্য শুধু জগৎটাকে কে কি চোখে দেখেছে তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। বর্ণিত নায়ক-নায়িকার পিছনে শিল্পী তাঁর আবাল্য দীর্ঘ জীবনের সকল সুখ-দুঃখ হাসিকান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন।" নিজের দিকে তাকিয়েই বিভূতিভূষণ একথা বলেছেন।

বিভূতিভূষণের 'পথের দেবতা' চেতনাও তাঁর সমগ্র জীবনভূমি থেকে অঙ্কুরিত, বিকশিত হয়েছে। নিজেকে তিনি একাধিকবার বলেছেন 'অনন্ত পথিক'। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের বাঙালী কথাসাহিত্যিকগণের মধ্যে বিভূতিভূষণই পথ হেঁটেছেন সবথেকে বেশী। তাঁর প্রায় সবগুলি গ্রন্থই পথে পথে রচিত। তাঁর অজস্র দিনলিপিগুলিকে স্বচ্ছন্দে বলা যায় 'পথলিপি'। ভ্রমণ-বহুল জীবন নয়, ভ্রমণই তাঁর জীবন। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের সূত্রপাতে, যখন কলকাতায় চতুষ্কলা সমিতি কল্লোল আন্দোলনের নান্দীপাঠ শুরু করেছে, তখন বিভূতিভূষণ গোরক্ষণী সভার ভ্রাম্যমান প্রচারকের কাজ নিয়ে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছেন। সারস্বতজীবনে এইটি তাঁর 'অভিযাত্রিক' পর্ব। মেঘনা-শীতলক্ষ্যা নদীতীরের শ্যাম-ছায়াঘন গ্রামগুলিকে অতিক্রম করে অবশেষে যাত্রা করেছেন ব্রহ্মদেশ—আরাকান-ইয়োমা রেঞ্জের দুর্গম পথে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে আবার খেলাৎচন্দ্র ঘোষ এস্ট্রেটের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার হ'য়ে তিনি চলে গেছেন বিহারে। জঙ্গলমহালে উদ্দাম ঘোড়া ছুটিয়ে কেটে গেছে কত জ্যোৎস্নারাত্রি। এই পর্বেই রচিত হয়েছে 'পথের পাঁচালী'। বিভূতিভূষণের পরবর্তী জীবনের যে কোনও বৎসরের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ক্লান্তিহীন তৃপ্তিহীন পথ চলা ঃ "কখনও কন্টকাকীর্ণ আরণ্যপথ বেয়ে, কখনও রৌদ্রদগ্ধ মরুবালুর বুক চিরে, কখনও কোকিলকূজিত পুষ্পসুরভিত কুঞ্জবনের মধ্য দিয়ে।" (ঊর্মিমুখর—দিনলিপি)

সমগ্র জীবনব্যাপী ঐ পথচলার আনন্দই ঘনীভূত এবং ঊর্ধ্বায়িত হয়ে সৃষ্টি করেছে 'পথের দেবতা' তত্ত্ব। ঐ তত্ত্বসূত্রেই গ্রথিত হয়েছে তাঁর সৃষ্টির ফুলগুলি। 'মানুষ আকারে বদ্ধ যেজন ঘরে' তার বহি-রঙ্গজীবনের তুচ্ছ ঘটনাপঞ্জী বিভূতিভূষণের জীবনী নয়। 'পথের দেবতা' চেতনাই তাঁর 'স্বপনমুরতি গোপনচারী' সত্তার আসল পরিচয়। এই তাঁর সত্যতর যথার্থ জীবনী। বিভূতিভূষণ তা জানতেন। তাই 'অপরাজিত' উপন্যাসের ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে অপু যে 'পথের দেবতা' চেতনার ব্যাখ্যা করেছে, তাকে প্রায় অবিকল ভাষায় 'তৃণাঙ্কুরে'র ব্যক্তিগত দিনলিপিতে আত্মসাৎ করে প্রমাণ করেছেন 'পথের দেবতা' তত্ত্ব শুধু তাঁর সাহিত্যের একটি তত্ত্ব নয়, তা তাঁর জীবনেরও গভীরতম সত্য।

।। দুই ।।

'পথের দেবতা' কে?

'পথের দেবতা'র অস্পষ্ট পূর্বাভাস পাওয়া যায় বিভূতিভূষণের প্রথম রচনা ছোটগল্প 'উপেক্ষিতা'য়— গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। অবশ্য 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশের সময়, গল্পটির যে শেষ অনুচ্ছেদটিতে 'পথের দেবতা'র তির্যক আভাস দেখা গিয়েছিল, 'মেঘমল্লার' গল্পসংকলনে গৃহীত হওয়ার পরে ঐ অনুচ্ছেদটি বর্জিত হয়। সেজন্য আপাততঃ এই দৃষ্টান্তটি ছেড়ে দিয়ে 'পথের পাঁচালী'র উপসংহার অংশটিকেই এ বিষয়ে প্রথম স্থানের মর্যাদা দিতে হবে। তারপর নামান্তরে রূপান্তরে এই 'পথের দেবতা'ই বারেবারে দেখা দিয়েছেন 'অপরাজিত', 'আরণ্যক', 'দৃষ্টিপ্রদীপ' ও 'দেবযানে'। দিনলিপিগুলির অসংখ্য অনুচ্ছেদ জুড়ে শোনা গেছে তাঁরই পদসঞ্চার।

'তৃণাঙ্কুরে' বিভূতিভূষণ 'পথের দেবতা' সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাকে সর্বসমেত তিনটি সূত্রে সংগ্রথিত করা যায়।

প্রথম সূত্র ।। "মনে হয় যুগে যুগে এই জন্মমৃত্যুচক্র কোন এক বড় দেবশিল্পীর হাতে আবর্তিত হচ্ছে, হয়তো দুহাজার বছর আগে জন্মেছিলাম ইজিপ্টে, যেখানে নলখাগড়ার বনে, শ্যামল নীল নদের তটে কোন দরিদ্র ঘরের মা, বোন, বাপ, ভাই, বন্ধু বান্ধবের দলে এক অপূর্ব শৈশব কেটেছে, তারপর এতকাল পরে আবার ষাটটি বছরের জন্য এসেছি—এখানে আবার অন্য মা, অন্য বাপ, অন্য ভাইবোন, অন্য বন্ধুজন। পাঁচ হাজার বছর পরে আবার কোথায়

চলে যাব কে জানে? এই Cycle of birth and death যিনি নিয়ন্ত্রিত করছেন, আমি তাঁকে কল্পনা করে নিয়েছি—তিনি একজন বড় শিল্পী।" অর্থাৎ এখানে বিভূতিভূষণ বলতে চেয়েছেন যে তাঁর কল্পনায় জন্ম-মৃত্যুচক্র বিচিত্র জীবজীবনের মধ্য দিয়ে অনন্তকাল ধরে কে দেবশিল্পীর হাতে আবর্তিত হ'য়ে চলেছে। বলা বাহুল্য এই দেবশিল্পীই 'পথের দেবতা'।

কিন্তু এই বাহ্য। খণ্ডিত দৃষ্টিতে জন্ম ও মৃত্যুকে পৃথক মনে হলেও বিভূতিভূষণের সত্যতর উপলব্ধিতে মৃত্যুও 'অনন্ত অপরাজিত জীবনেরই একটি অংশ মাত্র। 'স্মৃতির রেখা'য় বিভূতিভূষণের চিন্তায় এই সত্যও ধরা পড়েছিল ঃ

"এই অনিত্য মৃত্যুর পারে, পৃথিবীর পারে এক অনন্ত জীবন—পৃথিবীর এই মৃত্যুস্পৃষ্ট না হ'য়ে অক্ষুণ্ণ অপরাজিত দাঁড়িয়ে আছে—তা তোমার আমার সকলের।" ঐ 'অনন্দ জীবনকেই 'অপরাজিতে' অপু বলেছে 'বৃহত্তর জীবন', বলেছে 'পৃথিবীর জীবনটুকু ঐ বৃহত্তর জীবনের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।' তাই, যেন নিজেকে সংশোধন করে পরবর্তী সূত্রে বিভূতিভূষণ লিখলেন ঃ

"বৃহত্তর জীবনচক্র যুগে যুগে কোন অদৃশ্য দেবতার হাতে এভাবে আবর্তিত হচ্ছে। .... জয় হউক সে দেবতার, তাঁর গতির তেজে সম্মুখের ও পশ্চাতের অমুক্তির অন্ধকার জ্যোর্তিময় হউক তাঁর প্রাণচক্রের নিত্য আবর্তনশীল বিশাল পরিধিতে। .... তিনিই হাত ধরে আমাকে নিয়ে চলেছেন কোথায় তাঁর উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি জানেন।"

বলা বাহুল্য, এই অমুক্তির অন্ধকারে জ্যোর্তিময়, নিত্য আবর্তনশীল, মানুষের পথচলার দোসর দেবতাই 'পথের দেবতা'। 'বৃহত্তর জীবনচক্র' তাঁরই হাতে আবর্তিত হয়। নৈসর্গিক জীবন, মনোজীবন এবং আত্মিক জীবন—এই ত্রিস্তরের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে বৃহত্তর জীবনচক্র। এর মধ্যে নিসর্গ আবার বিভূতিভূষণের কাছে দ্বৈতরূপে প্রকাশিত ঃ একদিকে নিসর্গের কোমলমধুর রূপ, অন্যদিকে নিসর্গের মহানগম্ভীর রূপ। দুর্গম সারেণ্ডা অরণ্যে 'বিরাটের গম্ভীর মূর্তি'র সামনে দাঁড়িয়ে বিভূতিভূষণের মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের প্রকৃতি যেন লিরিক কবিতা, আর এখানে প্রকৃতি যেন এপিক কাব্য লিখে রেখেছে। [দ্রষ্টব্য ঃ দিনলিপি "হে অরণ্য, কথা কও"।] অর্থাৎ দাঁড়াল এই যে—কোমলমধুর নৈসর্গিক জীবন, মহান গম্ভীর নৈসর্গিক জীবন, মনোজীবন এবং সবশেষে বস্তুবিশ্বের বাতাবরণ অতিক্রম করে আত্মিকজীবন [অপু যাকে বলেছে 'এই জগতের পিছনে আর একটা জগৎ' ঃ 'অপরাজিত']—এই স্তরগুলিকে মিলিয়েই 'বৃহত্তর জীবনচক্র' গড়ে উঠেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে শব্দটি 'চক্র' অর্থাৎ চক্রপথে 'পথের দেবতা'র চলাচল ঃ যে বিন্দু থেকে তাঁর যাত্রা শুরু, সেই বিন্দুতে আবার ফিরে এসেই তাঁর একটি পূর্ণ আবর্তন পরিসমাপ্ত। এই প্রসঙ্গে মনে পড়েছে 'দৃষ্টিপ্রদীপে' জিতুর কথা। 'পথের দেবতা'র উদ্দেশে জিতু বলেছে ঃ 'আমি আমার বিরাট চেতনার রথচক্রকে চালিয়ে দিই শতাব্দী থেকে শতাব্দীর পথে, জন্মকে অতিক্রম করে মৃত্যুর পানে, মৃত্যুকে অতিক্রম করে আবার আনন্দভরা নবজন্মের কোন অজানা রহস্যের আশায়।"

এই পথের দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি? বিভূতিভূষণ 'তৃণাঙ্কুরে' বলেছেন ঃ "আমি দীন নই, দুঃখী নই, ক্ষুদ্র নই, মোহগ্রস্ত জড় মান নই, আমি জন্মজন্মান্তরের পথিক আত্মা।" অর্থাৎ মানুষ রূপে যাই হোক স্বরূপে সে 'পথিক আত্মা।' পথের দেবতা যুগযুগান্তর ধরে 'পথিক আত্মা'র হাত ধরে 'আনন্দ ও প্রেমের স্নিগ্ধ ধারার মধ্য দিয়ে" পথ চলেন। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য ঃ 'পথের পাঁচালী'র অপু, 'আরণ্যকে সত্যচরণ, 'দৃষ্টিপ্রদীপে'জিতু, 'দেবযানে'র যতীন প্রত্যেকেই পথিক, সচরাচর যাদের আমরা 'ভবঘুরে চরিত্র' বলে থাকি। বিভূতিভূষণ 'তৃণাঙ্কুরে' নিজেকে 'পথিক আত্মা' কল্পনা করে 'পথের দেবতা'র উদ্দেশ্যে যা বলেছেন তাকে আমরা তৃতীয় এবং শেষ সূত্র বলতে পারি ঃ "গভীর আনন্দরূপে দিলে দেখা এ জীবনে হে অজানা অনন্ত। নিজেকে দিয়ে বুঝেছি তুমি কত বড় শিল্পী, নিজের দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছি তুমি কত বড় দ্রষ্টা, নিজের সৃষ্টিকে দিয়ে বুঝেছি তুমি কত বড় স্রষ্টা।" জনৈক সমালোচক বলেছেন, "পথের দেবতা মানব ভাগ্যবিধাতা। তাঁর ইঙ্গিতে মানুষ পথ চলে।" একথা যে যথার্থ নয়, তারই প্রমাণ ঐ তৃতীয় সূত্র। 'মানব ভাগ্যবিধাতা' শব্দটির মধ্যে অনভিপ্রেত ঐশ্বর্যমূর্তির আভাস আছে। কিন্তু বিভূতিভূষণ বিশুদ্ধ লীলাবাদী মধুর রসের রসিক। 'পথের দেবতা' 'পথিক আত্মা'র লীলাসহচর। আনন্দরূপে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর ইঙ্গিতে মানুষ পথ চলে না, বরং তিনিও মানুষের দোসর হয়ে এগিয়ে চলেন 'বৃহত্তর জীবনচক্র' পথে।

বিভূতিভূষণের কল্পনা আরও সুদূরপ্রসারী। তিনি শুধু মানুষের পথিক সত্তাকেই দেখেননি, বিশ্ব ও কালের মধ্যেও পথিক সত্তাকে আবিষ্কার করেছেন। প্রথমটিকে 'স্মৃতির রেখা'র দিনলিপিতে নিজেই বলেছেন 'পথিকবিশ্ব' 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে জিতুর মুখে নিজের অনুভূতিকেই ভাষা দিয়ে বলেছেন ঃ "বিশ্বের এই পথিক রূপকে ভালবাসি।" পথিক বিশ্বের সঙ্গেই আছে পথিক কালের কল্পনা। 'পথের পাঁচালী'র 'আম আঁটির ভেঁপু' অংশের প্রথম পরিচ্ছেদে নীলকণ্ঠ পাখীর সন্ধানে ইছামতীর কূলে অপুর প্রথম ভ্রমণের প্রেক্ষাপটে দেখা গেছে ঃ "গতিশীল কালের প্রতীক নির্জন শীতের অপরাহ্ন।" শীতের অচিরস্থায়ী দিনান্তের মধ্যেই প্রকৃতিরসিক বিভূতিভূষণ লক্ষ্য করেছিলেন কালের সুস্পষ্ট দ্রুতগতি। এরপর 'পথিককালের' নিগূঢ়াভাস নিয়ে বহুবার শীতের অপরাহ্ন তাঁর রচনায় দেখা গেছে। হরিহরের মৃত্যুর সময়ে এবং 'আরণ্যকে' সত্যচরণের প্রথম অরণ্যদর্শনের পটভূমিতে ঐ একই প্রতীক নিয়ে শীতের অপরাহ্ন দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর রচনায় অপরাহ্ন মাত্রই হয়ে উঠেছে পথিককালের প্রতীক। এই জন্যই অপরাহ্ন তাঁর গল্প উপন্যাসে সর্বাধিক ব্যবহৃত পটভূমি। অনেকে বিভূতিভূষণের এই অপরাহ্ন প্রিয়তার মধ্যে রোমান্টিক বিষণ্ণতাকে খুঁজতে চেয়েছেন। তাঁরা বিষয়টিকে আরও তলিয়ে দেখেননি বলেই মনে হয়।

দেখা গেল 'পথের দেবতা' 'বৃহত্তর জীবনচক্র' পথে চলাচল

করেন, তাঁর ঐ চক্রাবর্তনের দোসর 'পথিক আত্মা', 'পথিক বিশ্ব' ও 'পথিক কাল'।

এবারে 'পথের পাঁচালী'র উপসংহার অংশে 'পথিক আত্মা' অপুর প্রতি পথের দেবতার সম্ভাষণটিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। পথিক আত্মা প্রথমে যাত্রা করে বিশ্বের এক দেশ থেকে অন্য দেশেঃ "...সোনাডাঙায় মাঠ ছাড়িয়ে ইছামতী পার হ'য়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে, দেশ ছেড়ে দেশান্তরের দিকে ....।" তারপর তার যাত্রা জন্ম থেকে জন্মান্তরে ও কাল থেকে কালান্তরে ঃ "দিনরাত্রি পার হয়ে, জন্মমরণ পার হয়ে, মাস বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায় ..... পথ আমার তখনও ফুরায় না ..... চলে .... চলে .... এগিয়েই চলে।" দেশ, জন্ম ও কাল অতিক্রম করে এসেছে অনন্তের আহ্বান ঃ "অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্তকাল আর অনন্ত আকাশ।" বাঙালীর চেতনার সঙ্গে কৃষ্ণের বাঁশীর রূপকল্পটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 'বৈষ্ণব কবির গান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছিলেন ঃ "সৌন্দর্য-স্বরূপের হাতে সমস্ত জগৎই একটি বাঁশী।" কিন্তু পথের দেবতার হাতে বাঁশীর বদলে বীণা তুলে দেওয়া বিভূতিভূষণের স্বোন্মেষণশীল প্রতিভারই দৃষ্টান্ত। এই বীণা সৃষ্টিরই বীণা। 'দৃষ্টিপ্রদীপে' বিভূতিভূষণ বলেছেন ঃ "মর্তে ও অমর্তে তাঁর সৃষ্টিবীণার দুই তার!" অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি বিষয়ে সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 'বীণা'র বিশেষণ রূপে 'অনির্বাণ' শব্দটি ব্যাকরণসম্মত নয়। সম্ভবতঃ 'লিপিকা'র [প্রকাশঃ ১৯২২] প্রথম গীতিগদ্য 'পায়ে চলার পথে'র শেষাংশে "তারার আলোয় অনির্বাণ বেদনায় দেয়ালি-উৎসবে'র পরোক্ষ প্রভাবই এই সুন্দর ভ্রান্তির জন্যে দায়ী।

।। তিন ।।

'ভাবজীবন' এবং 'আনন্দজীবন'

'পথিক আত্মা' মানুষের জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্তেই তার কাছে 'পথের দেবতা'র আহ্বান এসে পৌঁছায়। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে বিভূতিভূষণের কল্পনায় এই মুহূর্তটি কখন দেখা দিয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বিভূতিভূষণের দুঃখতত্ত্বের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। আসলে 'পথের দেবতা' তত্ত্ব আর এই দুঃখতত্ত্ব পরস্পর বেণীবন্ধন রীতিতে সংগ্রথিত। বিভূতিভূষণের দুঃখতত্ত্ব আলোচনায় প্রাক্কালে তারই উৎসমূলে বিরাজিত রবীন্দ্রনাথের "দুঃখ" শীর্ষক প্রবন্ধটির কথা স্মরণীয়।

'ধর্ম' গ্রন্থের ঐ প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ "মানুষের একটমাত্র আপনার ধন" আছে, সেটি দুঃখধন।..... "অতএব দুঃখকে আমরা দুর্বলতাবশত খর্ব করিব না, অস্বীকার করিব না, দুঃখের দ্বারাই আনন্দকে আমরা বড়ো করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য বলিয়া জানিব। ..... মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত। বিশ্বজগতে তেজঃ পদার্থ যেমন— মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানবসমাজে নূতন নূতন কর্মলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিতেছে।....।"

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে। 'দুঃখই গতি'—এই কথাটি বিভূতিভূষণের মানসলোকে একটি দিব্য সংকেতের মতোই ফুটে উঠেছে। ১৯৪৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'তৃণাঙ্কুরে'র দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ প্রায় অনুরূপ কথা বলেছেনঃ "দুঃখ জীবনের বড় সম্পদ, দৈন্য বড় সম্পদ, শোক, দারিদ্র্য, ব্যর্থতা বড়ো সম্পদ, মহৎ সম্পদ।" আরও বলেছেন ঃ "আমার সমগ্র ভাবজীবনের সমষ্টি এইসব দুঃখও বেদনা, অবশ্য হয়তো অনেকটা দুঃখ বাস্তব, অনেকটা কাল্পনিক....।" 'ভীবজীবন' শব্দটি বিভূতিভূষণ বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। এই বেদনাসম্ভব 'ভাবজীবনই' কিন্তু শেষ কথা নয়। বিভূতিভূষণ এর পরেই বলেছেন ঃ "....পথে, ঘাটে, বৈকালের ছায়ায়, পুকুরের রোদে, যে আনন্দজীবনের শুরু, আমি ভেবে মুগ্ধ হই, তা এখনও অটুট অক্ষুণ্ণ রয়েছে—আরও পরিপূর্ণভাবে দেশে বিদেশে তার গতি নিত্যনবতর পথে।" অর্থাৎ দুঃখ ও বেদনা দিয়ে গড়া ভাবজীবনই 'দেশে বিদেশে নিত্য নবতর গতির পথে' 'আনন্দজীবনে' উন্নীত হয়। বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে এই আনন্দ-জীবনের অধিকারী মানুষই যথার্থ যাত্রী ঃ 'পথিক আত্মা'। এই আনন্দ- জীবনের অধিকারীকেই পথের দেবতা পরিয়ে দিয়েছেন "আনন্দ যাত্রার অদৃশ্য তিলক" ['পথের পাঁচালী'র উপসংহার স্মরণীয়]

'পথের পাঁচালী'তে বারবার মৃত্যুর বেদনার মধ্য দিয়ে অপুর 'ভাবজীবন' গড়ে উঠেছে। ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু তার শৈশবে, দুর্গার মৃত্যু তার বাল্যে, হরিহরের মৃত্যু তার কৈশোরে। এক একটি মৃত্যুর বেদনা দিয়ে গড়া 'ভাবজীবন' শৈশব থেকে বাল্যে, বাল্য থেকে কৈশোরে 'নিত্যনবতর গতির পথে' 'আনন্দজীবনে' রূপায়িত হয়েছে এবং পরিশেষে 'পথের দেবতা'র অনির্বাণ বীণার সুরে বৃহত্তর জীবনের আলোক, তাপ, গতি ও প্রাণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন উঠেছে যে 'আম আঁটির ভেঁপু'র শেষে নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগের সময়েই কি 'পথিক আত্মা'র কাছে 'পথের দেবতা'র আহ্বান আসতে পারত না? সেই আহ্বানের জন্য 'অক্রূরসংবাদ' অংশের কি প্রয়োজন ছিল? অন্ততঃ এই যুক্তি দেখিয়েই T. W. Clerk 'পথের পাঁচালীর' ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ 'অক্রূরসংবাদ' অংশটিই পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু বিভূতিভূষণের দুঃখচেতনার মধ্যেই এই প্রশ্নের সম্ভাব্য সদুত্তর লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে হয়। নিশ্চিন্দিপুরের বালক অপুর দুঃখবোধ বিভূতিভূষণের ভাষাতেই "অনেকটা বাস্তব অনেকটা কাল্পনিক"।[দ্রঃ "তৃণাঙ্কুর"] মহাভারতের কর্ণের দুঃখে আকুল হওয়া ঐ কাল্পনিকতারই দৃষ্টান্ত। শিশু ও বালক অপুকে সংসারের বাস্তব দুঃখশোক থেকে অনেকখানি আড়াল করে রেখেছে সর্বজয়া ও দুর্গা। কিন্তু 'অক্রূরসংবাদে' কিশোর অপুকে চলতে হয়েছে নগরের কঠিন রাজপথে, বাস্তব সংসারের নির্মম আঘাত বুক পেতে নিতে হয়েছে।

আমরা স্মরণ করতে পারি, অপুকে নিষ্ঠুর আশ্রয়দাতার চাবুক মারার বেদনাদায়ক ঘটনাটি দিয়েই 'পথের পাঁচালী' সমাপ্ত হয়েছে। এইভাবেই তার অপরিণত 'ভাবজীবন' 'আনন্দ-জীবনে' পরিণতি লাভ করেছে, অপু হয়েছে 'পথিক আত্মা'। এর আগে তার কাছে পথের দেবতার আহ্বান আসা সম্ভব ছিল না।

।। চার ।।

।। চক্রাবর্তন সূত্রের প্রয়োগ ।।

আবার আগের কথায় ফিরে আসি। আমরা বলেছি 'পথের দেবতা' 'বৃহত্তর জীবনচক্র' পথে চলাচল করেন। এর প্রথমে আছে কোমলমধুর নিসর্গজীবন, পরে মহানগম্ভীর নৈসর্গিক জীবন, মনোজীবন ও আত্মিকজীবন। যেহেতু তা চক্রপথ, তাই 'পথের দেবতা' আত্মিকজীবন পরিক্রমান্তে আবার ফিরে আসেন পূর্বস্থানেঃ নৈসর্গিক জীবনে।

অথচ সমালোচকেরা যাওয়াটাকে লক্ষ্য করেছেন, ফিরে আসার নয়। ফলে 'পথের পাঁচালী'র স্রষ্টা বিভূতিভূষণের সাহিত্য জীবনের উপান্তে 'দেবযান' রচনাকে স্মরণ রেখেই তাঁদের মনে হয়েছে যে বিভূতিভূষণ বুঝি শেষ পর্যন্ত আলোকপন্থী আধ্যাত্মবাদী। কিন্তু সত্য তার বিপরীত। 'পথের দেবতা' 'দেবযান' থেকে চক্রাবর্তন পথে আবার অবতরণ করেছেন নিসর্গ জগতে, মর্ত্যপৃথিবীর (এই মধুর মৃত্তিকায়, যেখানে চিরশৈশবের আম আঁটির ভেঁপু চিরকালই বেজে চলেছে।

'পথের দেবতা'র ঐ চক্রাবর্তন সূত্রটি তখনই সার্থক হবে যখন বিভূতিভূষণের রচনার মধ্যে এর সমর্থন মিলবে। আমরা বিভূতি-ভূষণের ছয়টি প্রধান উপন্যাস গ্রহণ করব ঃ 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'দেবযান' এবং 'ইছামতী'। [চিত্র ক ঃ গীতিকাব্যধর্মী নিসর্গজীবন ঃ 'পথের পাঁচালী'

খ	ঃ	মহাকাব্যধর্মী নিসর্গজীবন	ঃ 'অপরাজিত'
ক-খ	ঃ	দুই নিসর্গের যুক্তবেণী	ঃ 'আরণ্যক'
গ	ঃ	মনোজীবন	ঃ 'দৃষ্টিপ্রদীপ'
ঘ	ঃ	আত্মিকজীবন	ঃ 'দেবযান'
ঘ->ক	ঃ	প্রত্যাবর্তন	ঃ'দেবযান'—>'ইছামতী']

'পথের পাঁচালী'তে 'পথের দেবতা'র দোসর হ'য়ে 'পথিক আত্মা' অপু চলেছে পলিমৃত্তিকা-পালিত দক্ষিণবঙ্গের নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের গীতিকাব্যধর্মী [স্মরণীয় বিভূতিভূষণের উক্তি ঃ "বাংলা দেশের প্রকৃতি লিরিক কবিতা।"] নিসর্গলোকের মধ্য দিয়ে ঃ "এইরকম তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়ে পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা দুলানো ধোলো ধোলো বনচালতার ফুল চারিধারে। সুঁড়িপথটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এগাছের ওগাছের তলা দিয়ে বনকলমী, নাটা-কাঁটা, ময়নাঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোনদিকে লইয়া ফেলিতেছে .... সে যেন স্বপ্ন, সে যেন মায়া, চারিপাশ ঘিরিয়া পাখী গান গায়, কুরকুর করিয়া করিয়া ফুল পড়ে, সূর্যাস্তের আলো আরও ঘন ছায়াময় হয়।" পথের পাঁচালীর প্রকৃতি সর্বদাই এইরকম কোমলমধুর লাবণ্যে পরিপূর্ণ। আর এই নিসর্গজীবনের ঊর্ধ্বে অপু দেখতে পায় ঃ "নীল নির্জন আকাশপথে এক উদাস গৃহবিবাগী পথিক দেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর থেকে আরও দূরে মিলিয়ে চলে।"

'অপরাজিত' উপন্যাসে 'পথের দেবতাকে' অনুসরণ করে পথিক অপু এসেছে বিন্ধ্যারণ্যের দুর্গম অঞ্চলে। দেখা দিল প্রকৃতির মহাকাব্যিক মূর্তি ঃ "অস্পষ্ট জ্যোৎস্না ও আঁধারের পিছনকার পাহাড়ের গম্ভীরদর্শন অনাবৃত গ্রানাইট প্রাচীরটা কি অদ্ভুত দেখায়। শালকুসুমের সুবাস ভরা অন্ধকার, মাথার উপরকার আকাশে অগণিত নৈশনক্ষত্র। এখানে...আছে শুধু সে, আর এই বিশাল অরণ্য প্রকৃতির কর্কশ, বন্ধুর, বিরাট সৌন্দর্য—। ....স্তব্ধ রাত্রি, আকাশ অন্ধকার....পৃথিবী অন্ধকার ..... আকাশে বাতাসে অদ্ভুত নীরবতা, আবলুসের তালপাতার ফাঁকে দু'একটা তারা যেন অসীম রহস্যভরা মহাব্যোমের বুকের স্পন্দনের মত দিপ্‌দিপ্‌ করে, বৃহস্পতি স্পষ্টতর হয়, উত্তরপূর্ব কোণের পর্বত-সানুর বনের উপরে কালপুরুষ উঠে, এখানে ওখানে অন্ধকারের বুকে আগুনের আঁচড় কাটিয়া উল্কাপিণ্ড খসিয়া পড়ে। ..... রাত্রির পর রাত্রি এই গতির অপূর্ব লীলা দেখিতে দেখিতে এই শান্ত সনাতন জগৎটা যে কি ভয়ানক রুদ্র গতিবেগ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে তাহার স্নিগ্ধতা ও সনাতনত্বের আড়ালে, সে সম্বন্ধে অপুর মন সচেতন হইয়া উঠিল—অদ্ভুতভাবে সচেতন হইয়া উঠিল।"

'আরণ্যক' উপন্যাসে এই দুই বিপরীত নিসর্গজীবনের যুক্তবেণী গাঁথা হয়েছে। পথিক সত্যচরণ একই সঙ্গে ঐ 'গীতিকাব্যধর্মী' ও 'মহাকাব্যধর্মী' নিসর্গজীবনের যাত্রী। তার যাত্রাপথের একপাশে 'রুক্ষ কর্কশ' লবটুলিয়া বইহারের ভৈরবী মূর্তি 'অন্ধকার রজনীতে কালপুরুষের আগুনের খড়্গ হাতে' দিক্‌বিদিক্‌ ব্যাপ্ত করে দেখা দেয়। আবার অন্যদিকে 'সুমিষ্টি সুরের মধুর ও কোমল বিলাসিতায় আর্দ্র' স্বপ্নময় সরস্বতী কুণ্ডী ঃ 'বন্য নিম গাছের সুবাস ছড়ায় বাতাসে, জলে জলজ লিলির দল ফোটে, জ্যোৎস্নার হিম বাতাসে গাছপালা ও ভোম্‌রা লতার নৈশপুষ্পের মৃদু সুবাস।'

'দৃষ্টিপ্রদীপে' এসে 'পথের দেবতা'কে আর নিসর্গে দেখা গেল না। দেখা গেল দৃষ্টি-প্রদীপের দিব্যদীপ্তিতে জ্যোতির্ময় মনোলোকে। এই উপন্যাসের নায়ক জিতুও পথিক, তবে অপুর মতো প্রকৃতি

প্রেমিক নয়। কিন্তু সে অসাধারণ। তার অতিরিক্ত অনুভূতি শক্তির সাহায্যে সে তার মনোলোকের রহস্যকে বহির্জগতে প্রতিফলিত করতে পারে। সে দেখতে পায় 'অনেক দূরে পাহাড়ের ও বনানীর মাথার ওপরে নীলাকাশ বেয়ে যেন একটা পথ....হলুদ আলোর বিশাল জ্যোর্তিময় পথটা এই পৃথিবীর পর্বতশ্রেণীর ওপর দিয়ে শূন্যভেদ করে মেঘরাজ্যের ওদিকে কোথায় চলে গেছে।" বলা বাহুল্য এই পথ 'সোনাডাঙা মাঠ, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের ধার দিয়ে চলে যাওয়া" পত্রের সগোত্র নয়। আসলে বাস্তবে নিসর্গলোকে এ পথ কোথাও নেই, আছে জিতুর মনোলোকে। উদ্ধৃতাংশে 'যে'—এই সংশয়বাচক শব্দটি সেই দিকেই ইঙ্গিত দেয়। ঐ মনোলোকের পথ বেয়েই চলেছেন 'পথের দেবতা' ঃ "মনে হল কোথায় যেন একজন পথিক আছেন, ঐ নীলাকাশ, ঐ রঙীন মেঘমালা, এই কলরবপূর্ণ জীবনধারার পিছনে তিনি চলেছেন .... চলেছেন। ....।"

'দৃষ্টিপ্রদীপে'ই 'পথিক আত্মা'র চারদিকের বস্তুবিশ্বের ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে এসে অবশেষে লুপ্ত হয়েছে 'দেবযানে'। এখানে দেখা দিল লোকোত্তর আত্মিক জীবন। যতীন সেই আত্মিক জীবনচক্রের যাত্রী। 'দেবযান' শিল্পসৃষ্টি হিসেবে সার্থক কি না, এখানে সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু বিভূতিভূষণের 'পথের দেবতা' চেতনা যে একানে এসেই একটা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই।এখানে 'পথিক আত্মা' মানুষেরও সমস্ত দেহরূপ নির্মোকের মত খসে পড়েছে, বেরিয়ে এসেছে তার চিৎ-শরীর। তার সম্মুখে অনাবৃত হয়েছে জ্যোতির্ময় সপ্তলোক। পথ চলে গেছে "এদেরও দূর, বহুদূর পারে, সব আকাশ ও সময়ের পারে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যেখানে এক হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে—সোম সূর্য নেই, তারকা নেই, অন্ধকার নেই, আলোও নেই—সেই এক বহুদূর দেশে সে গিয়ে পৌঁছেছে ....।" বলা বাহুল্য শিল্পী এখানে হয়ে উঠেছেন তত্ত্বদর্শী। ঐ পথে যখন 'পথের দেবতা'কে দেখা গেল, তখন আর তিনি মানুষের 'পথের দোসর' নন, বিভূতিভূষণের হিন্দু-সংস্কারে অধিবাসিত হয়ে তিনি 'কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু' মূর্তিতে দেখা দিলেন। বিভূতিভূষণ বললেন "বিশ্বজগৎ ওঁর স্বপ্ন .... তুমি, আমি, জন্ম, মরণ, দেশকাল .... সবই তাঁর স্বপ্ন।" কিন্তু এ যে একেবারে আত্মদ্রোহ! কারণ বিভূতিভূষণ নিজেই তো বলেছেন তিনি লীলাবাদী, 'পথিক আত্মা' ও 'পথের দেবতা' পরস্পরের লীলাসহচর। স্বভাবতই বিভূতিভূষণ তাঁর পক্ষে অসম্ভাবিত ঐ অদ্বৈত সৃষ্টিতে অবিচলিত থাকতে পারেননি। তিনি পারতেন না থাকতে। তাই আত্মিকজীবন থেকে সরে এসে যতীন আবার নবজন্ম লাভ করল নবীন শিশু-মূর্তিতে—বাংলাদেশেরই এক গ্রামে। বিভূতিভূষণ জানিয়েছেন, যশোহর জেলারই সেই গ্রাম! অপুর নিশ্চিন্দিপুরও ছিল যশোহর জেলায়, স্বয়ং বিভূতিভূষণের জন্মভূমি বারাকপুরও যশোহর জেলারই গ্রাম। 'দেবযানে' যতীনের দৃষ্টিতে তার জন্মভূমির চিত্রটি এইরকম ঃ "নিবিড় বাঁশবনে ঘুঘু ডাকছে উদাস মধ্যাহ্ন বেলায়, বনে বনে তিৎ-পল্লার হলুদ ফুল ফুটেছে। যতীন অনেকদিন পরে বাংলার শরতের এই সুপরিচিত দৃশ্যগুলি দেখলে। বাঁশ-ঝাড়ে সোনার সড়কির মত নতুন বাঁকের চেরা ঠেলে উঠেছে, বনসিমতলায় বেগুনি ফুল ফুটে ঝোপের মাথা আলো করেছে—বর্ষার শেষে জল মরে যাচ্ছে ডোবায়, পুকুরে নদীতে, তীরের টাটকা কাদায় সাদা বক গেঁড়িগুগলি খুঁজে বেড়াচ্ছে, জলের ধারেই কাশফুলের ঝাড় থেকে হাওয়ায় কাশফুলের সাদা তুলোর মত পাপড়ি উড়ছে।"

এই বর্ণনার সঙ্গে 'পথের পাঁচালী'র গীতিকাব্যধর্মী কোমলমধুর নিসর্গজীবনের বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। অর্থাৎ 'পথিক আত্মা' আবার ফিরে এল পূর্বস্থানে—নিসর্গ-জীবনে। সঙ্গে সঙ্গে লীলাসঙ্গী হয়ে 'পথের দেবতা' ও 'বৃহত্তর জীবনচক্রে'র একটি পূর্ণ আবর্তন সমাপ্ত করে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পদ্মফুলেভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে সোনাডাঙ্গার মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতীর তীরে ফেলে যাওয়া স্থানে ফিরে এলেন। জন্মভূমির তৃণপুষ্পশয্যায় শায়িত পরিশ্রান্ত সেই দেবতাকেই আবার নতুন করে প্রথম মুহূর্তের দৃষ্টিতে দেখলেন বিভূতিভূষণ। 'দেবযানে'র প্রায় চার বৎসর পরে প্রকাশিত 'হে অরণ্য কথা কও' গ্রন্থের একটি দিনলিপিতে সেই অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতাটিই অবিস্মরণীয় বাণীমূর্তি লাভ করল ঃ "... নিস্তব্ধ অপরাহ্নে ছায়াগহন প্রাচীন আমবাগানে ঢুকে দেখেছি বনের কোণে তিনি পত্রশয্যায় ঘুমিয়ে আছেন। ঝুরঝুর করে ঝরা পাপড়ি ঝরে পড়ছে সোঁদালি ফুলের ওঁর শয্যার ওপর। ডালে ডালে বনের পাখি নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্ছে, কত কি বন্যলতার গাছ ওপরের ডাল থেকে নেমে এসে দুলছে ওঁর বুকের কাছে, মুখের কাছে। .... মহাশিল্পী মহাকবি উনি, নিজের অনন্তশয্যার অন্তনিদ্রার স্থানটি নিজের ইচ্ছামত সাজিয়ে বসবেন আমি যেসব ফুল ভালবাসি বা দেখেছি তাই দিয়ে।"

এরপর আর বোধহয় বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না যে কেন বিভূতিভূষণের জীবনের সর্বশেষ উপন্যাসের শিরোনামা ঃ 'ইছামতী'।প্রথম পথিক অপু একদিন ইছামতীর তীরে দাঁড়িয়ে পদাতিক পৃথিবীর সত্যকে প্রথম আবিষ্কার করেছিল। 'পথের পাঁচালী'তে "ইছামতীর চলোর্মিচঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কালপ্রবাহের সঙ্গে পাল্লা" দিয়ে চলেছে। অর্থাৎ দুয়ে মিলে এক না হলেও তারা চলেছে পাশাপাশি। আর জীবনের প্রান্তে সেই স্থানটিতে ফিরে এসেই অপুর স্রষ্টা স্বয়ং বিভূতিভূষণ 'ইছামতী'র জোয়ার ভাঁটার আবর্তনে মৃত্যুঞ্জয়ী "বৃহত্তর জীবনের" অপাবৃত সত্যকে মানসপ্রত্যক্ষ করেছেন ঃ "কত লোকের চিতার ছাই ইছামতীর জল ধুয়ে নিয়ে গেল সাগরের দিকে, জোয়ারে যায়, আবার ভাঁটায় উজিয়ে আসে, এমনি বারবার করতে করতে মিশে গেল দূর সাগরের নীল জলের বুকে। .... মৃত্যুকে কে চিনতে পারে, গরীয়সী মৃত্যু-মাতাকে? পথ প্রদর্শক মায়ামৃগের মত জীবনের পথে পথে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে সে, অপূর্ব রহস্যে ভরা তার অবগুণ্ঠন কখনও খোলে শিশুর কাছে, কখনও বৃদ্ধের কাছে .... তেলাকুচো ফুলের দুলুনিতে অনন্তের সে সুর কানে আসে .... কানে আসে বনৌষধির কটুতিক্ত সুঘ্রাণে, প্রথম হেমন্তে বা শেষ শরতে।" 'পথের পাঁচালী'তে ইছামতী ও জীবনপ্রবাহ ছিল উপমেয়-উপমান সম্পর্কে সম্পর্কিত, আর 'ইছামতী' উপন্যাসে নদীই স্বয়ং 'বৃহত্তর জীবনে'র অমরপ্রবাহ হয়ে উঠে সৃষ্টি করেছে অভেদাঙ্গ অতিশয়োক্তি। নিসর্গজীবনে ফিরে এসে 'তেলাকুচো ফুল' 'বনৌষধির কটুতিক্ত সুঘ্রাণ' 'হেমন্ত ও শহতের' উদ্দীপন বিভাবই পরিপুষ্ট করে তুলেছে ঐ পরমপ্রত্যয়টিকে। এখানেই বিভূতিভূষণের "পথের দেবতা" চেতনার পরাসিদ্ধি।।

অমর্ত্য সেন — কোথা থেকে কোথায়

প্রফেসর দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, অর্থনীতি বিভাগ

এক চিনা ম্যান্ডারিনকে — চিন লাল হওয়ার আগে — আপ্যায়ন করতে এক ইংরেজ নাকি উম্বলডন টেনিস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ খেলা দেখার পর ম্যান্ডারিন ভদ্রলোক বললেন যে বোঝাই যাচ্ছে কোনও সদুদ্দেশ্য সাধনে বলটি নেটের এপার ওপার করা প্রয়োজন, কিন্তু সেই কাজটি চাকর বাকর দিয়ে করানো যায় না?

বছর ষোলো আগে অর্থনীতির প্রখ্যাত অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত আমাকে প্রায় ওই রকম একটি কথা বলেছিলেন। অমর্ত্য সেন তাঁর অতি প্রিয়জন, এই বন্ধুসন্তানকে বরাবরই তিনি খুব স্নেহ করেন, অমর্ত্য অর্থনীতিশাস্ত্র পড়তে গেল তাঁর উপরোধে, তাঁর প্রতি সম্মানেই তিনি ফিরে ফিরে গর্ববোধ করেন। সেই অমর্ত্য নাকি গরীব মায়ের সন্তানদের প্রতিদিন দুধ আরও কী কী বিলোচ্ছে, আর শিশুদের ওজন করছে। তাঁর স্বরে বিরক্তির ছোঁয়া পাওয়ায় আমি বললাম, 'তা কাজটা তো ভালই'। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ভাল কাজ, তবে সে তো থিওরির লোক, নিজের হাতে দুধ বিলোতে তার সময় নষ্ট হয়, বোঝে না?

এতে আমারও তখন মনে হয়েছিল যে এটা বোধ হয় এক রকম খেলা, তাই অমিয়বাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, খেলাতে ক্যাপটেন বাইরে বসে থাকেন না, দলের মধ্যে থেকে তাদের শ্রমের অংশীদার হয়ে জিতবার চেষ্টা করতে হয়, শুধু বাইরে থেকে উৎসাহ দিলে হয় না। অমিয়বাবু—আমার সম্বোধনে মেশোমশাই—আমাকে মৃদু একটা ধমক দিয়েছিলেন মনে পড়ছে। কিন্তু সেদিন তিনি বা আমি, কেউই ঠিকমতো ব্যাপারটা ধরতে পারিনি।

যেমন যখন Poverty and Famines বইটি প্রকাশিত হল সেদিন অনেকেই বইটির তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারেননি। আর সাবটাইটেল An Essay on Entitlement and Deprivation কিছু পাঠকের কাছে ফাঁকা বাগাড়ম্বর মনে হয়েছিল। আজ অবধি অমর্ত্য সেনের কাজ আর তার মূল্য নিয়ে লোকের মনে ধাঁধা আছে, আর তার সমাধানও হয়নি। ভক্তদের (বাম বা দক্ষিণ পন্থায়) নামজপের ফাঁকে ফাঁকে চোখ কান খোলা রাখা যদি বা চলে, নতুন কথা তলিয়ে বোঝবার যতটা খোলা মনে ভাবা দরকার সেটা বোধ হয় সংস্কারবিদ্ধ। গোড়ার অমর্ত্য সেন থেকে আজকের অমর্ত্য সেনে উত্তরণ কিছু অমর্ত্যানুরাগীর কাছেও পাহাড়ের মাথায় শুদ্ধ স্রোতের থেকে সমতলের মন্দগতি খোলা জলে পরিণতি তেমন ভাল ঠেকে না, ব্যাপ্তি না হয় ভাল, কিন্তু তা বলে হাঁটুজল?

পাঠক অনুমতি করলে একবার চেষ্টা করে দেখি, পরিণতি কী বা কেন, আর সে পরিণতি যুক্তির পথেই এসেছে এ কথায় আপনাকে রাজি করতে পারি কি না। এ বিষয়ে টেকনিকাল আলোচনা বেশ খটমটো আর অর্থনীতির ছাত্র নয় এমন পাঠকের হয়ত একেবারেই অপরিচিত। তাই তত্ত্বের স্বাদ যদি দিতে পারি তাহলেই আমার কাজ সম্পন্ন মনে করব—পেট ভরে খাবার সখ থাকলে সাক্ষাৎ সেন মহাশয়ের মোকাবিলা করতে হবে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে কেনেথ অ্যারো একটি লেখায় সবাইকে আশ্চর্য করেন। সে লেখাটির বর্ধিত রূপ হল তাঁর বই Social Choice and Individual Values। সেই বই থেকে একটি নতুন বিষয় সৃষ্টি হল যার নাম Social choice theory বা সামাজিক বাছাই তত্ত্ব। রাজনীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র আর অর্থনীতিশাস্ত্র এ তিনের ঘরেই তার স্থান, আরও অনেক কটা বিষয়ে এই তত্ত্ব (বা তার কোনও প্রকার) প্রাসঙ্গিক। তত্ত্বটি কী আস্তে আস্তে ভাঙি, অর্থাৎ একটু ঘুরে ফিরে তত্ত্বটির দিকে যাব।

আমাদের এখানে স্কুলে ঢোকা মাত্র বাচ্চাদের পরীক্ষা দিতে হয় আর পরীক্ষার ফল শুধু যে পাশ ফেল ঘোষণা করে তাই নয়, কে প্রথম, কে পঞ্চম, কে ছাব্বিশ নম্বরে স্থান পেল সেসব খবর থাকে। এই সারি বিন্যাস কীভাবে কী যুক্তিতে হয়? বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার নম্বর যোগ করে মোট নম্বর অনুযায়ী ছাত্রদের সাজিয়ে দেওয়া হয় প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি মার্কা দিয়ে। সবচেয়ে বেশি নম্বর যার সেই প্রথম। এ আমাদের বহু পরিচিত ব্যবস্থা, আমরা অনেক সময়ে স্কুল কলেজের গণ্ডি পার হয়েও এই প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এই সারিবদ্ধতার চক্করে পড়ে যাই, সব ব্যাপারে এক নম্বর কে এসব প্রশ্ন তুলি।

ইংল্যান্ডে কিন্তু এক আধটা পরীক্ষার বাইরে এমনটা হয় না। পরীক্ষার ফলে শ্রেণী বিন্যাস থাকে, তবে প্রথম (বা অন্য) শ্রেণীতে যারা পড়ল তাদের নাম বর্ণানুক্রম অনুসারে ছাপা হয়। সুতরাং আমাদের পদ্ধতি একমাত্র উপায় এমন কথা সবাই মানে না। কেন, দোষটা কী? নম্বর যোগ যখন করছি তখনই কিন্তু মেনে নিয়েছি—অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে — যে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, যে কোনও বিষয়ে এক নম্বর বেশি পাওয়া অন্য বিষয়ের এক নম্বর কমের ঠিক এক মাপের। অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ের নম্বর সমতুল, commensurable। যদু ইংরেজিতে কাঁচা, পেল চল্লিশ, অংকে পেল নব্বই। যদি এ দুটো বিষয়ে মাত্র পরীক্ষা হয়ে থাকে তাহলে মধুর (ইংরেজি ৬২, অঙ্ক ৬৫) চেয়ে যদুর নম্বর বেশি। ইংরেজি পড়ান যিনি তিনি বললেন ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে যদুর কোনও ধারণাই নেই, আর অঙ্কের মাস্টার বলেন যে যদু সোনার চাঁদ ছেলে, দেখবেন পরের বার অঙ্কয় শ'য়ে শ' নম্বর পাবে। এ দুটি মত কি যোগ করতে পারি? তা না হলে কে বেশি ভাল ছাত্র এটা স্থির করতে নম্বর যোগ করার পদ্ধতি ব্যবহার করি কোন মুখে? যদু অঙ্কয় ভাল, ইংরেজিতে খারাপ,

মধু এর ঠিক উল্টো এই খবর থেকে আমরা কিছুই বলতে পারব না। যদু-মধু কে সব মিলিয়ে বেশি ভাল। শিক্ষকরা এক এক জন যদু-মধুর আপেক্ষিক মূল্যায়ন এক এক রকম করবেন। নম্বর যোগ করা বন্ধ করলে কে সেরা কে নয় কীভাবে ঠিক করি?

লেখাপড়ার ব্যাপারে বিলেতে না হয় এই দুই তিন সাজায় না, কিন্তু অর্থনীতিক মূল্যায়নের বেলাতে ওরকম করলে চলবে কি? দেশের কল্যাণ কিসে বেশি কিসে কম পরিষ্কার না জানলে কী পরামর্শ অর্থনীতিবিদ সরকারকে দেবেন? আর্থনীতিক কল্যাণতত্ত্ব নাম যে বিষয়টি তাতে এর সদুত্তর নেই?

আছে, তবে সে উত্তরে কারুর মন ভরে না। Utilitarianism বা উপযোগবাদ থেকে একটা রাস্তা পাওয়া যায়। ভোগ্যবস্তু থেকে লোকে উপযোগিতা (utility) পায়। উপযোগবাদ হল "অন্য সর্বদিক উপেক্ষাপূর্বক কেবল উপযোগিতার মানদণ্ডে কার্যাদির ন্যায়-অন্যায় বিচার; প্রচুরতম লোকের প্রভুততম উপকার সাধনই কর্মের উদ্দেশ্য।" (সংসদ ইংরেজি-বাংলা অভিধান)। ওই প্রভুততম উপকার কী করে মাপ করব? সকলের উপযোগিতা যোগ করে দেখতে হবে কী করলে এই যোগফলটি সর্বাধিক হয়। মুশকিল এই যে ওই পোড়া যোগ করা এখান ঢুকে পড়েছে। পরীক্ষার নম্বরে যে কারণে যোগ করা বোধ হয় ঠিক নয় মনে হয়েছে এবার বিভিন্ন লোকের উপযোগিতা যোগের বিরুদ্ধে সেই কারণগুলো আরও বড়।

যোগ না হয় না-ই করলাম, উপযোগিতা কিসে কার কতটা এই প্রশ্নটা পাল্টে তো আমরা লোকের পছন্দ-অপছন্দ এরকম বলতে পারি। এই পছন্দের একটা সারি থাকা উচিত লোকের মাথায়। যে কোনও দুটি বিকল্প সম্বন্ধে সে বলতে পারে কোনটা তার বেশি পছন্দ; বা সমান ভাল লাগে (শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী, কারে রেখে কারে ফেলি?)। প্রত্যেকের সারিগুলো পেলে আমরা তার থেকে একটা "সামাজিক সারি" তৈরি করবার চেষ্টা করতে পারি—আর সেটা পেলেই আমাদের কেল্লা ফতে।

অ্যারো এই সামাজিক সারি তৈরি করবার একটি বিধি খুঁজছিলেন। সামাজিক সারি তো ব্যক্তিগত সারির পছন্দ অপছন্দ থেকেই বানানো হবে তবে উপযোগিতা যোগকরা বা ওই রকম গোয়ার্তুমি না করে অনেক রকম উপায়ের কথা ভাবা যায়। দেশের সবচেয়ে মোক্ষম সিদ্ধান্তগুলো যেসব জায়গায় নেওয়া হয়, যেমন লোকসভা, সুপ্রিম কোর্ট, সেখানে মতবিরোধে মীমাংসা হয় সংখ্যা গরিষ্ঠতা দিয়ে। আবার লোকসভায় আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে আমরা দেখি কার কটা ভোট (Simple majority, plurality)। এগুলো ছাড়া অন্য পাঁচটা নিয়ম পেতে পারি যাতে ব্যক্তিগত সারিগুলো থেকে একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য সুষ্ঠু পথে ওই সামাজিক সারি গড়ে তুলতে পারি।

এই যে সামাজিক কল্যাণবিধি, সেটাকে কিছু শর্ত মানতে হবে। এ শর্তগুলো অ্যারোর বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণে যে রকম দাঁড়িয়েছে তা হল ঃ

১. Unrestricted domain — ব্যক্তিগত সারিগুলো কেমন হবে তার কোনও বাধানিষেধ নেই। বিধি ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা বলতে পারব না ওই যে ওরা, ওদের কথা ধর্তব্যের মধ্যে মনে করছি না।

২. Weak Pareto Criterion — দুটি বিকল্পের একটিকে অন্যটির চেয়ে বেশি পছন্দ যদি প্রত্যেকে করে তা হলে সামাজিক সারিতে সবার বেশি পছন্দকেই বেশি পছন্দ বলে দেখাতে হবে।

৩. Independence of Irrelevant Alternatives — ব্যক্তিগত সারিতে যদি কোনও দুটি বিকল্পের মধ্যে পছন্দ না পাল্টায় সামাজিক সারিতে তাদের মধ্যে কোনটি উপরে কোনটি নীচে এও পাল্টাবে না। ধরুন তিনটে পালা, বিদ্যাসাগর, হিটলার, লেনিন। এ নিয়ে সব ব্যক্তিগত সারি দেখি, নানারকম সাজানো পাই। কিন্তু যদি কোনও কারণে বিদ্যাসাগর পালা বর্জন করতে হয় তাতে হিটলার আর লেনিনের মধ্যে কোনটা বেশি ভাল লোকদের মতে একই রইল, কিন্তু সামাজিক সারিতে পাল্টে গেল, এটা হবে না।

৪. Non-dictatorship — স্কুলের পরীক্ষাতে প্রথম হলে বৃত্তি দেওয়া হবে। এদিকে শিক্ষকরা কে সবচেয়ে ভাল বলতে পারছেন না, তাঁরা নম্বর যোগ বন্ধ করেছেন। হেডমাস্টার মশাই বলেন যে আপনারা না পারলে কি হয়, আমি বলাই এর নাম করছি, সেই সেরা। এ রকমটা হবে না।

অ্যারো প্রমাণ করেন যে এই চার শর্ত মানে এমন কোনও বিধি থাকতে পারে না। যদি কোনও বিধি চারটেই শর্ত মানে বলে ধরা যায় তাহলে যে সামাজিক সারি পাব তাতে দেখব তিন বিকল্প ক খ আর গ-এর মধ্যে ক খ-এর চেয়ে ভাল, খ গ এর চেয়ে ভাল আর গ ক এর থেকে ভাল (Failure of transitivity)। অর্থাৎ সারিক্রম দাঁড় করানোই যাচ্ছে না। এ উপপাদ্যটি গল্পচ্ছলে সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়মের প্রসঙ্গে ওই failure of transitivity উদাহরণ বলে দেখানো হয়। উদাহরণ ঠিকই, তবে অ্যারোর উপপাদ্য যে কোনও বিধি সম্পর্কে খাটে, যদি সে বিধি ওই চার শর্ত মানে।

এই প্রজ্ঞার পর কি বা ক্ষমা? অর্থনীতিবিদ কি তাহলে কত ধানে কত চাল, কিসে কী হয় এ সব খবর দেওয়াতে আটকে থাকবেন? দেশের দশের ভাল কিসে বলতে তাদের মানা? অ্যারোর উপপাদ্য তো নেতিবাদী একটি গর্ত খুঁড়েছে, দেশের লোকের মত থেকে ভাল মন্দ বিচারের পদ্ধতিতে পৌঁছতে গেলে সেই গর্তে পড়ে ছটফট করতে হবে। তবে কি যুক্তি ছেড়ে গাজোয়ারীর রাস্তা ধরব আমরা? বলা বাহুল্য অর্থনীতিবিদ মাত্রেই ঠুঁটো হয়ে থাকতে রাজি হননি, স্বয়ং অ্যারো থেকে অনেকেই গাড্ডা থেকে বেরবার অনেক চেষ্টা করেন।

এ বিষয়ে অমর্ত্য সেনের কাজকর্মের শুরু ষাটের দশকে। প্রথম দিকে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে সামাজিক সারি করার চেষ্টা করেন। অ্যারো নিজেই (এবং ডানকান ব্ল্যাক) দেখিয়েছিলেন যে এক নম্বর শর্ত (unrestricted domain) একটু আলগা করলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা

বিধিতে সামাজিক সারিক্রম পাওয়া যায়। শর্তটি আলগা না করে হচ্ছে না তাই আলগা করা, তবে শুধু সমানধর্মী লোকেদের মত হিসাবে পড়বে এ তো বড় বেশি গাজোয়ারী। পারলে যেটুকু আলগা না করলে নয় ততটুকু করতে পারলে কিছুটা স্বস্তি হয়, সমস্যার সমাধান পুরো হচ্ছে না কিন্তু যা হোক চলনসই একটা বুদ্ধি বাতলানো গেল। অমর্ত্য সেন এ নিয়ে অনুসন্ধান চালান, প্রথমে একা, পরে তাঁর প্রিয় ছাত্র প্রশান্ত পট্টনায়কের সহযোগে এই প্রসঙ্গের খুব পরিষ্কার একটা উত্তরও পান।

অনেকে ধন্য ধন্য করছে আর প্রসন্নভাবে বিনয়ের মুদ্রা বিন্যাস করে বসে থাকা অমর্ত্য সেনের ধাত নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিধি হিসাবে রাজনীতিতে চললেও, অর্থনীতিতে খুব অর্থবহ নয় বলে তাঁর মত তিনি কিছুদিন পরে ছাপার হরফে জানিয়েছেন। সংখ্যাগুরু হয়ে সংখ্যালঘুর উপর অত্যাচার রাজনীতিতেও সম্ভব, অর্থনীতিতে তো বটেই। যে-কোনও লোকের কাছ থেকে তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পাঁচজনের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া পাঁচজন বলল ভাল, বিরুদ্ধে মাত্র একজন। তা ছাড়া অ্যারো উপপাদ্যের মোকাবিলা করতে তার শর্তগুলোকে আলগা করাও মনে ধরে না। শর্ত রেখে যদি transitivity না পাই তাহলে কি সব গেল? ক খ, খ গ, গ ক এই চক্র না হলেই তো হয়। এই চেষ্টাতে অমর্ত্য transitivity গোষ্ঠীরই অন্য কটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দিয়ে হয় কিনা দেখলেন (quasi-transitivity, acyclicity)। এ প্রচেষ্টাতে গোড়ায় কিছু সুফল পেলেও শেষ অবধি যা টের পাওয়া গেল যে অ্যারোর উপপাদ্য খাঁটি তো বটেই, আর তাগড়া (robust)। অর্থাৎ এটা সেটা বুদ্ধি করে গাড্ডা পেরিয়েছি ভাবতে ভাবতে আবার পা হড়কায়। উপপাদ্যটি যেমন সাজানো হয়েছে তার থেকে একটু অন্য ব্যবস্থা করলে একটু অন্যভাবে ওই নেতি নেতি সিদ্ধান্তে পৌঁছয়। পলকা উপপাদ্য নাড়া দিলেই চিৎপটাং, অ্যারো উপপাদ্য সেরকম নয়, শক্তসমর্থ আর তার ডাক নাম নিখিল।

বেশ সবার উপযোগিতা যোগ করে ভালমন্দের বিচার করতেন বেন্থাম থেকে মার্শাল, পিসু অবধি অর্থনীতিবিদরা, তা ওরকম খুঁৎখুঁৎ করে যোগ করা ছেড়ে এখন বোঝ। যোগের বিরুদ্ধে আপত্তির এক বড় কারণ হল এতে বিভিন্ন ব্যক্তির উপযোগিতা তুলনা করতে হয়। কিন্তু তুলনা একেবারে করা যাবে না, ব্যক্তির উপযোগিতা আসলে তার অন্তরের সত্তার ছায়া, আর আমি তুমি বিভিন্ন ব্যক্তি, দুই সত্তা পাশাপাশি ফেলে তুলনা করব সাধ্যি কি — এই মত যেন বাড়াবাড়ি। অমর্ত্য সেন তাই আংশিক তুলনার পথ খুঁজলেন যাতে পাকা উত্তর না হলেও সদুত্তরের সম্ভাবনা থাকে।

শুধু উপযোগিতা বা তারই আর এক প্রকার, পছন্দ সারিক্রম (preference ordering) ব্যবহার করতে হবে তাই বা কেন? ব্যক্তি সত্তার ছায়া সে বেশ কথা, কিন্তু ছায়াতে কি আসলের সব রূপ ধরতে পারা যায়? আলোটা এপাশ ওপাশ করলে সেই সত্তার অন্য অবয়ব ফুটে উঠতে পারে অন্য ধরনের ছায়ায়। তা ছাড়া সামাজিক কল্যাণের আলোচনায় ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাম্য বা হক অধিকার ও কোনটারও উল্লেখ হয় না এ তাজ্জব ব্যাপার।

এ সবই খিড়কির দরজা দিয়ে উপযোগিতা বা পছন্দ সারিতে ঢুকে পড়েছে এ কথাটা সম্পূর্ণ ভুল না হতে পারে। যদি আত্মমর্যাদা নিয়ে জীবনযাপনের প্রশ্নে যাই তা হলে এখানেও সেই সমস্যা। কিন্তু কী করে কী হচ্ছে বা হচ্ছে কিনা এটা তো আড়ালে রাখলে চলবে না, প্রকাশ্যে আলোচনা করতে হয়।

এ রকম প্রকাশ্যে আলোচনা করতে অমর্ত্য সেন minimal liberty (একছিটে ব্যক্তিস্বাধীনতা?) এ প্রসঙ্গে এনে ফেলে যে তুলকালাম কাণ্ড করেছিলেন তার জের আটদশ বছর পণ্ডিতি ত্রৈমাসিকগুলোর পাতায় চলেছিল। ১৯৭০ সালে অমর্ত্যের The Impossibility of A Paretian Liberal নামে লেখাটি বেরোয়। একটুখানি ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে তিনি ধরেছিলেন যে প্রতি ব্যক্তির কিছু কিছু ব্যাপারে (বাড়িতে পাজামা না লুঙ্গি, মুগের ডালে চিনি, না চিনি না) শেষ কথার হক থাকবে। অর্থাৎ সে ব্যাপারে তার পছন্দ সবাই মান্য করবে, ঘরেও মানবে আর সমাজও মানবে। প্যারেটো নিয়ম তো বলে যে যদি দুটি বিকল্প ক আর খ-এর মধ্যে সবাই ক বেশি ভাল বলে তা হলে সামাজিক মতে ক বেশি ভাল। এবার তিনি প্রমাণ করেন যে তেমন তেমন ব্যক্তিগত সারিক্রম হলে (unres-tricted domain) প্যারেটো নিয়ম আর ওইটুকু ব্যক্তিস্বাধীনতা একসঙ্গে ধরা চলে না।

প্রমাণটি শক্ত নয়, কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে যে গল্পটা ফাঁদলেন সেটা খুবই সরল ও মনোজ্ঞ। দুটি লোক আছে, একজন অতি শালীন অপরজন কামুক। লেডি চ্যাটারলির প্রেমিক বইটির অমার্জিত সংস্করণ এক কপি মাত্র আছে। তিন রকম ব্যবস্থা সম্ভব, (ক) শালীনবাবু পড়বেন (খ) কামুকবাবু পড়বেন আর (গ) কেউ পড়বেন না। শালীনবাবুর পছন্দক্রম গ ক খ — কেউ না পড়াই ভাল, তবে ওই দুশ্চরিত্র আস্কারা পাবে তার চেয়ে আমিই পড়ি। কামুকবাবুর ক্রম ক খ গ — ওই ভণ্ডটা পড়ুক, শিক্ষা হবে তার, নইলে আমি পড়ি, না পড়ে বই ফেলে রাখা এ আবার কী?

ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কামুকবাবু যদি না পড়ার চেয়ে পড়তে পছন্দ করেন তাহলে খ গ-এর চেয়ে ভাল বলে সমাজ মানতে বাধ্য। শালীনবাবু পড়তে না হলে বেঁচে যান, তাই গ ক-এর চেয়ে ভাল এতে সমাজ রাজি। কিন্তু প্যারেটো নিয়ম বলছে দুজনেই ক খ-এর চেয়ে বেশি পছন্দ করেন তাই ক খ-এর চেয়ে ভাল বলে ধরতে হবে। এই দেখুন ভাল খারাপ জোড়া জোড়ায় পেলাম খ গ, গ ক, ক খ। সেই চক্করে পড়লাম।

এ নিয়ে নাম করা ত্রৈমাসিকগুলোর পাতায় কত না তর্ক, কত না আলোচনা। প্রমাণ কিন্তু অটল, তবে আলোচনায় স্বাধীনতা, হক, অধিকার এইসব ধারণাগুলো অনেকটা পরিষ্কার হল। প্যারোটো নিয়মের মতো আপাত নির্বিরোধী বিধান যে অনেক নষ্টের গোড়া হতে পারে সেটা আরও নানাভাবে অমর্ত্য আর তাঁর কিছু সঙ্গী দেখিয়েছেন। কিন্তু এই "অস্বাভাবিক" ফলটির জন্য অনেকে দায়ী

করেছেন ওই দুই বাবুর পছন্দ সারিতে পরস্পরের বই পড়া নিয়ে মত থাকা। ঠিক কথা, বাবুদুটি নিজের চরকাতে তেল দিলে এ গল্পের উদাহরণটি খাটত না। দুটো কথা — উদাহরণটি উদাহরণই, তত্ত্বের প্রমাণটি এই উদাহরণ না খাটলে ভুল, তা নয়। দু'নম্বর কথা, ওই দুই বাবু কি "অস্বাভাবিক"? প্রচুর লোক তো এরকম হয়, এ রকম পছন্দ ভোগসুখের বাইরের কথা নিয়ে আসছে উপযোগিতা বা পছন্দ সারিতে বলে হিসাবের বাইরে ঠেলে দেব?

এখান থেকে অমর্ত্য সেন উল্টো দিকে রওনা হলেন। কল্যাণ-অর্থনীতি বিষয়টির ঠুঁটো অবস্থার কারণ, তিনি বললেন, আমরা যা তথ্য পাওয়া যায় তা ব্যবহার না করে শুধুমাত্র পছন্দ সারিক্রম থেকে সামাজিক চয়নে পৌঁছতে চেষ্টা করছি। এই ভুলের নাম তিনি দিলেন Welfarism, কল্যাণবাদ।

কল্যাণবাদের শুচিবাই বেশ চড়া ধাতের, কখন মূল্যবোধের ছোঁয়া লেগে যুক্তির ইমারত অশুচি হয় এই ভয়ে শুধু মাত্র উপযোগিতা বা পছন্দসারি দিয়ে কাজ সারতে হবে। বিভিন্ন ব্যক্তির উপযোগিতা তুলনা যে তুলনার কাজটি করছে তার মূল্যবোধ দিয়ে নির্ধারণ হয়, প্রকৃতির নিয়মে নয়। যতই বোঝান — মূল্যবোধ এসে পড়লে যা খুশি হতে পারে, তাই বা কেন? পুরো মিল না হতে পারে, অনেকটা বারোয়ারী জায়গা পেতে পারি, কথা বলা যায়, অঘোরপন্থী কাপালিক আর কটা? — পাকা কল্যাণবাদী কর্ণপাত করবে না। উপযোগিতা সম্বন্ধে তথ্য হিসাবে শুধুমাত্র পছন্দের সারি ছাড়পত্র পাবে, আর উপযোগিতার বাইরের কোনও খবরই গ্রাহ্য হবে না। প্রথমটি অ্যারো সমস্যার সমাধান বন্ধ করে, দ্বিতীয়টি কল্যাণমূলক অর্থনীতির অন্য প্রশ্নগুলো আলোচনার বাইরে ঠেলে দেয়। গরিবের জন্য কিছু করা চাই বলছেন, কে গরিব কীভাবে স্থির করব বলুন তো? ধরুন কিছুটা টাকা গরিবের জন্য বরাদ্দ হয়েছে, যার যার উপযোগিতা কম তাদের মধ্যে বিলানো হবে। উপযোগিতা রামের শ্যামের চেয়ে কম (বা বেশি) বলবার জো আছে? আচ্ছা ওই যে নাদুস-নুদুস সুবেশধারী বেশ কিছু লোক দেখা যাচ্ছে ওরা বোধহয় বড়লোক, আর ওদের বাদ দিলে বাকিরা গরিব? কি সর্বনাশ, এ সব খবর আমাদের পছন্দ সারিগুলোতে তো নেই, সেখানে দেখছি বেশি সবাই কমের চেয়ে পছন্দ করে। এ ছকে আমরা শোষণ বন্ধ করো বলতে পারব না, 'সমান কাজের সমান মজুরি' বা বলি কী করে?

বেন্থ্যামপন্থী উপযোগিতাবাদ অবশ্য উপযোগিতা তুলনীয় মনে করে, আর এ পথে অ্যারোর সমস্যা সমাধানও সম্ভব। কিন্তু অনেক তথ্য উপযোগিতায় ঢোকানো যায় না। সামাজিক কল্যাণ বলতে আমরা সহজ বুদ্ধিতে মনে করি, সাম্য, ন্যায় ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের স্বাধীনতা এ সব আমাদের উদ্দিষ্ট। দারিদ্র্যমোচন সোজাসুজি ভোগের উপযোগিতা বাড়ায় না, তবে ভোগীরা যদি সবাই এরকম মনে করি তা হলে প্রত্যেকের উপযোগিতাও একরকম হবে। প্রান্তিক উপযোগিতাও একরকম, আর ভোগ বাড়লে কমে। তা হলে সকলের আয় সমান হলে মোট উপযোগিতা সবচেয়ে বেশি হবে। শেষ রক্ষে হল কি? সবাই তাদের উপভোগ করার ক্ষমতায় সমান এটা তো ঘটনা নয়, এটা আমাদের সংকল্পের সহায়ক বিশ্বাস হতে পারে। এ বিশ্বাসে আমরা কি চাইব প্রত্যেকে কুস্তি করে, ধ্রুপদ গায়, নিরামিষাশী?

মানুষে মানুষে অনেক ফারাক থাকে, তবে যেমন সবার এক ভোট সেই রকম কিছু প্রস্তাব এখানে লুকিয়ে আছে? কিন্তু সমান আয় দিলে সমান ন্যায় হচ্ছে কি? কিছুটা টাকা যদি ভাগ করে দিতে হয় দুটি লোকের মধ্যে — একজন আনন্দের উপাসক, ভোগে দক্ষ; অন্যজন আজন্ম রোগেভুগে খিটখিটে তেতো স্বভাবের পঙ্গু — উপযোগিতা দেখে আমরা দক্ষ ভোগীকেই ওই টাকাটা দেব যাতে আচ্ছা করে ভোগ করে সমাজের মোট উপযোগিতা অনেকটা বাড়ায়। আজন্ম রোগে পঙ্গু এমন মানুষ তো কিছুতেই আনন্দ করতে জানে না — তাই তিনি পড়ে মার খাবেন দু' ভাবে। এমনিতেই নিরানন্দ জীবনের লড়াই তার ওপর ভোগে অদক্ষতার দরুন বাড়তি টাকা অন্যরা পায়।

আবার টেনেমেনে একটা গল্প খাড়া করা যায় যাতে পঙ্গু লোকটির প্রান্তিক উপযোগিতা ভীষণ বেশি। কেন, কোত্থেকে হল এ সব প্রশ্ন না করলে যা আমার আপনার মন চায়, অর্থাৎ বঞ্চিত লোকটিই বাড়তি টাকাটা পাবে এই ফল দেখানো যাবে। কিন্তু টানতে টানতে কোথায় পৌঁছেছি খেয়াল আছে তো?

তাছাড়া ধরুন আমাদের রোগে ভোগা পঙ্গুটি হালে দীক্ষা নিয়েছেন — গুরুর কাছে শুধু বীজমন্ত্র নয় আরও শিখেছেন ভগবান ভক্তকে পরীক্ষা করতে কত কষ্ট দেন, কিন্তু ইনি তো আসল ভক্ত, হাসিমুখে সব কষ্টের মোকাবিলা করেন। না ভুল বলেছি, তাঁর কষ্টই নেই, প্রভু পরীক্ষা করবেন এ তো গর্বের কথা, দুঃখ কষ্ট এমন ভাববে কেন? এবার সেই বেন্থামবাদীরা কী বুদ্ধি করবে?

উদাহরণ আর যুক্তিগুলো সবই অমর্ত্য সেনের। তাঁর মতে কেউ খুঁৎখুতে বা অল্পে সন্তুষ্ট এটা বড় কথা নয়, দেখতে হবে সে বঞ্চিত কি না। বঞ্চনার মাপ করতে কতটা ভোগ্যবস্তুতে তার অধিকার শেষ কথা নয়, কারণ বস্তুর আদর তা দিয়ে কী করা যায় সেজন্যে। কতটা উপযোগিতা সে বিচারও দেখলাম অনেক ক্ষেত্রে খাপ খায় না, ভুল সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে। কিসে মানুষের সাম্য আমাদের উদ্দিষ্ট—না, সমাজজীবনে অংশগ্রহণ করে আর পাঁচজনের মতো মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকারে। সকলে এক নয়, আলাদা, তাই প্রত্যেকের জন্য ব্যবস্থাও আলাদা হবে যাতে তারা সফল জীবনযাপন করতে পারে। এই করতে পারাকে অমর্ত্য সেন সক্ষমতা (capability) নাম দিয়েছেন। ঠিক হল না, লোকে যা যা করে সফল জীবনযাপন করতে চায় সেগুলোকে তিনি বলেন ক্রিয়া বা functioning। আর সক্ষমতা আসলে নানা প্রকার ক্রিয়া সম্পন্ন করবার নানা কার্য ক্ষমতার সমাহার যাকে তিনি capibility set বলেন। এই সেট-টি বাড়াতে পারলে লোকের স্বাধীনতা বাড়ে।

এই গোছের আলোচনা অনেকে তেমন পছন্দ করেন না —

বলেন কি জানি মশাই, দর্শন হতে পারে কিন্তু এতে আমাদের ইকনমিক্স্ কই? ঘুরে তাহলে সেই পঙ্গুর কথা পাড়ি, সাম্য বলতে আয়-সাম্য মনে করলে কি ঠিক হবে? আর পাঁচজনের মতো জীবনযাপন করতে সে সমান টাকায় পারবে? সামান্য বহু ব্যাপারে সে পিছিয়ে থাকবে না যদি তার জন্য positive discrimination করা হয়? অমর্ত্য সেনের এ কথা বলতে চোখের জলে ভাসতে হয় না, সক্ষমতাই জীবনযাপনের পরিমাপ মনে করলে আপনিই এই মতে পৌঁছতে হবে। অন্যরাও এমন মতে পৌঁছতে পারেন, তবে তাদের হৃদয় হয়ত যুক্তির মাথায় হাঁটে! আপেল ফল তো খসে মাটিতেই পড়বে নিউটনের ঠাকুমা তা জানতেন না? গ্রহ তারা চন্দ্র যে নিয়মে চলছে সেই নিয়মেই আপেল পড়তে বাধ্য এ প্রমাণে আমাদের জ্ঞান কিছুমাত্র বাড়েনি? খুচরো অনেক কথা লোকে জানে, সেগুলো আলগা কথা না পাকা কথা বুঝতে প্রণালীবদ্ধ (systematic) বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আমাদের সমাজে মেয়েরা ঠিক পুরুষের মাথার উপর নয় বললে অনেকে বিরক্ত হন—সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আরও কত কি বলেন। অমর্ত্য যে শিশুদের ওজন করছিল সেটাতে বিলনো দুধে শিশুকন্যার ওজন তেমন বাড়ে না, শিশুপুত্রের তুলনায় এটা হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়া একটা বড় শিক্ষা। পিতৃতন্ত্র কতদূর তার শিকড় বিছিয়েছে আমরা মোটেই জানি না, জানতে চাইও না। হ্যাঁ, রাজপুত, জাঠ এদের কথা আলাদা, আমাদের বাঙালির মধ্যে অন্যরকম বলে ভাবতে ভালবাসি। অমর্ত্যের একটি হিসাব — যদি আমাদের ভারতে নারী পুরুষ অনুপাত নিদেনপক্ষে আফ্রিকার মতো হত — পশ্চিমের উন্নত দেশের কথা ছেড়েই দিই — তা হলে আরও তিন কোটি নারী থাকত এ দেশে। নেই কেন? প্রাকৃতিক নিয়মে থাকা উচিত ছিল, মানুষের নিয়মে বাঁচতে পারেনি কারণ মানুষ নাকি পুরুষমানুষ। এখনও আমাদের দেশের নারী অত্যাচার অপচার মেনে নেয়, মানিয়ে নিতে শেখে জন্মাবধি। হই হল্লা না করলে তাদের কষ্ঠবোধ কম হতে পারে, কষ্ট কম, বঞ্চনা কম? সাম্যের এই দিকটা অনেক রাজনীতিতে সাম্যবাদী দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। এ বিষয়ে তত্ত্ব, তথ্য দুই-ই অমর্ত্য হাজির করেছেন — বঞ্চনার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটা।

দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, অসম বন্টন প্রথা এ সব বড় চেনা রোগ। এগুলোর প্রতিবিধান অর্থনীতিবিদের হাতে নেই কিন্তু যাদের হাতে তারা কী করবে এ বিষয়টা তাদের হাতে ফেলে রাখা যায় না। তাই এ সবের কারণ, চেহারা, প্রকার, এ সব অর্থনীতির অঙ্গ, এর আলোচনা করতে হবে যতদূর সম্ভব যুক্তির স্তরে। আর মাপজোকও করতে হবে। ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প দুটোই মাপার নিয়ম আছে। এক দল আছে যাঁরা চট করে মেপে ফেলেন—ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলা ছাব্বিশ ইঞ্চি, কোমর ছাব্বিশ ইঞ্চি....। আর যদি ফিতে ভাল হয়, নানা রকম মাপ পাওয়া যায়। কিন্তু কী মাপলাম সব সময়ে বোঝা যায় না। দারিদ্র্যের হিসাবে একটা আয় ধরা হয় সীমারেখা। এর চেয়ে কম আয় যার সে দরিদ্র। জনসংখ্যার যে অনুপাত দরিদ্র সেটা কম হলে ভাল হচ্ছে বলতে হবে। কিন্তু যদি যারা সবচেয়ে গরিব তাদের কাছ থেকে আয় কেড়ে নিয়ে যারা ওই লাইনের ঠিক তলায় আছে তাদের দিই, তাহলে দরিদ্র অনুপাত কমে যাবে। কিছু লোক সীমারেখার তলা থেকে এখন উপরে। আর একদম তলায় যারা, তারা না খেতে পেয়ে মরে গেলে আর একটু উন্নতি হবে অনুপাতে। এ শুনে আপনি শিউরে উঠবেন জানি, কিন্তু ওই গরিবি মাপবার বুদ্ধিটা ছাড়ব না তো, বদলাব। কেন শিউরে উঠলেন জানলে সে রকম আর না হয় এমন করে বদলাব। এই আলোচনায় আমাদের ন্যায়বোধ নিজেই ঢুকে পড়ল আপনার শিউরে ওঠায়। তা হলে উচিত কি? না ad hoc ন্যায় অন্যায় হাততালি শিউরে ওঠা ছেড়ে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এগনো, ন্যায়বোধকে একটা অ্যাকসিওম আকারে আলোচনার গোড়ায় ঢোকানো গেলে মাপ জোকের ধরন কেমন হবে সেটা ঠিক করা যায়।

সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনাতে প্রায়ই জাতীয় আয় বা মাথা-প্রতি আয় ঢুকে পড়ে। জীবনযাত্রার মান নিয়েও কথা হয়। এগুলোও মাপতে গেলে হড়কে যায়, সোজাসুজি মাপজোক করতে গেলে যা মাপতে চাই তা আড়ালে চলে যায়। অমর্ত্য সেন অনেকটা এই সব সমাজকল্যাণের সূচক নির্ধারণের কাজ করেছেন। দারিদ্র্যের যেমন সেন সূচক চালু হয়েছে, অন্য ব্যাপারে তার নাম ব্যবহার না করলেও তার বিশ্লেষণের ব্যবহার হয়েছে। Capability set-এর ব্যবহারে নানা জট আছে, সব তুলনা করতে পারা যায় না, যেমন স্বাধীনতা বাড়ছে কি কমছে সব ক্ষেত্রে অদ্বর্থক উত্তর পাওয়া যায় না। তা বলে তো আমরা ছেড়ে দিতে পারি না, যা সহজে মাপা যায় গোনা যায় তাতে অনেক শক্ত প্রশ্নের জবাব নেই। শক্ত প্রশ্নের আলগা জবারের বেশি যদি না-ই পাই একেবারে পাকা ভুল উত্তরের চেয়ে তো ভাল।

দেখুন আস্তে আস্তে কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম। আজ চল্লিশ বছরে কত বিষয়ে কত কাজ করলেন অমর্ত্য, তার কোনটা কে ভাল বলল, কে তর্ক জুড়ল এ ভাবতে গেলে খেই হারিয়ে যায়। কিন্তু দেখুন মোটা গল্পটায় কোনও ছেদ, কোন লাফ নেই। গোড়া থেকে আজ অবধি প্রশ্ন একটাই লোকের ভাল হয় কিসে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে যুক্তিরই সূত্রে অনেকটা দূর আসতে হল। যাত্রার তো শেষ নেই, Jean Dreze অমর্ত্যর প্রিয় ছাত্র, তার সঙ্গে লেখা Hunger and Public Action দিয়ে শুরু করে আরও কিছু বই সম্পাদনা করে চলেছেন।

ভরসার কথা কর্তারাও আজকাল অমর্ত্য সেন কী বলেন জানতে চাচ্ছেন।

EDITORS AND PUBLICATION SECRETARIES OF THE PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

YEAR	EDITORS	SECRETARIES
1914-15	Pramatha Nath Banerjee	Jogesh Chandra Chakravarti
1915-17	Mohit Kumar Sen Gupta	Prafulla Kumar Sircar
1917-18	Saroj Kumar Das	Ramaprasad Mukhopadhyay
1918-19	Amiya Kumar Sen	Mahmood Hasan
1919-20	Mahmood Hasan	Paran Chandra Gangooli
1920-21	Phiroze E. Dastoor	Shyama Prasad Mookherjee
1921-22	Shyama Prasad Mookherjee	Bimal Kumar Bhattacharya
	Brajakanta Guha	Uma Prasad Mookherjee
1922-23	Uma Prasad Mookherjee	Akshyay Kumar Sarkar
1923-24	Subodh Chandra Sen Gupta	Bimal Prasad Mukherjee
1924-25	Subodh Chandra Sen Gupta	Bijoy Lal Lahiri
1925-26	Asit K. Mukherjee	Sunit Mahbub Murshed
1926-27	Humayun Kabir	Lokesh Chandra Guha Roy
1927-28	Hirendranath Mukherjee	Sunit Kumar Indra
1928-29	Sunit Kumar Indra	Syed Mahbub Murshed
1929-30	Taraknath Sen	Ajit Nath Roy
1930-31	Bhabatosh Dutta	Ajit Nath Roy
1931-32	Ajit Nath Roy	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1932-33	Sachindra Kumar Majumdar	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1933-34	Nikhilnath Chakravarty	Girindra Nath Chakravarti
1934-35	Ardhendu Bakshi	Sudhir Kumar Ghosh
1935-36	Kalidas Lahiri	Prabhat Kumar Sircar
1936-37	Asok Mitra	Arun Kumar Chandra
1937-38	Bimal Chandra Sinha	Ram Chandra Mukherjee
1938-39	Pratap Chandra Sen	Abu Sayeed Chowdhury
	Nirmal Chandra Sen Gupta	
1939-40	A. O. M. Mahiudin	Bimal Chandra Dutta
1941-42	Arun Banerjee	Golam Karim
1942-46	*(No Publication)*	
1947-48	Sudhindranath Gupta	Nirmal Kumar Sarkar
1948-49	Subir Kumar Sen	Bangendu Gangopadhyay
1949-50	Dilip Kumar Kar	Sourindra Mohan Chakravarti
1950-51	Kamal Kumar Ghatak	Mans Muktamani
1951-52	Sipra Sarkar	Kalyan Kumar Das Gupta
1952-53	Arun Kumar Das Gupta	Jyotirmoy Pal Chaudhuri
1953-54	Ashin Ranjan Das Gupta	Pradip Das
1954-55	Sukhamoy Chakravarty	Pradip Ranjan Sarbadhikari
1955-56	Amiya Kumar Sen	Devendra Nath Banerjee
1956-57	Ashok Kumar Chatterjee	Subal Das Gupta
1957-58	Asoke Sanjoy Guha	Debaki Nandan Mondal
1958-59	Ketaki Kushari	Tapan Kumar Lahiri
1959-60	Gayatri Chakrabarty	Rupendra Majumdar
1960-61	Tapan Kumar Chakravarty	Ashim Chatterjee
1961-62	Gautam Chakravarty	Ajoy Kumar Banerjee
1962-63	Badal Mukherjee	Alok Kumar Mukherjee
	Mihir Bhattacharya	

YEAR	EDITORS	SECRETARIES
1963-64	Pranab Kumar Chatterjee	Pritis Nandy
1964-65	Subhash Basu	Biswanath Maity
1965-66	*(No Publication)*	
1966-67	Sanjay Kshetry	Gautam Bhadra
1967-68	*(No Publication)*	
1968-69	Abhijit Sen	Rebanta Ghosh
1969-72	*(No Publication)*	
1972-73	Anup Kumar Sinha	Rudrangshu Mukherjee
1973-74	Rudrangshu Mukherjee	Swapan Chakravarty
1974-75	Swapan Chakravarty	Suranjan Das
1975-76	Sankar Nath Sen	Paramita Banerjee
1977-78	Sugata Bose, Gautam Basu	
1978-81	*(No Publication)*	
1981-82	Debasis Banerjee, Somak Ray Chaudhury	Banya Dutta
1982-83	*(No Publication)*	
1983-84	Sudipta Sen, Bishnupriya Ghosh	Subrata Sen
1985-86	Brinda Bose, Anjan Guhathakurta	Chandrayee Niyogi
1986-87	Subha Mukherjee, Apurba Saha	Jayita Ghosh
1987-88	*(No Publication)*	
1988-89	Anindya Dutta, Suddhasatwa Bandyopadhyay	Sachita Bhowmik
1989-90	Abheek Barman, Amitendu Pali, Adrish Biswas	Debashis Das
1990-92	Jayanta Ray, Shiladitya Sarkar	Pratik Mitra, Chandrani Majumdar
	Debraj Bhattacharya, Pathikrit Sengupta	Sanjoy Chakraborty
1993-95	Soumya Sundar Mukhopadhya	Ananda Sankar Roy
	Arjun Deb Sen Sharma, Debanuj Dasgupta	Soumya Sundar Mukherjee
	Santanu Das	
1995-96	Sanjoy Chakraborty, Saibal Basu	Arijit Bhattacharya
1996-98	Bodhisattva Kar, Anirban Mukherjee	Raja Bhattacharya, Ashis Pathak
	Anindyo Sengupta, Kumar Kislay	
1998-2000	Riddhi Sankar Ray, Lincoln Roy	Roshni Mukherjee
	Ashok Kesari, Phalguni Ghosh	
2000-2001	Paromita Chakraborti, Sapna Gupta	Lincoln Roy
	Soumitro Ghosh, Kunal Singh	
2001-2002	Arjun Chatterjee, Uditi Sen	
	Deblina Sengupta, Nabaruna Bhattacharya	Atig Ghosh Roy
	Saubhik Ghosh	
2002-2003	Riya Bhattacharjee, Shatarupa Banerjee	Abheek Banerjee
	Shibaprasad, Amritava Dey, Shubro Bhattacharya	
2003-2004	*(No Publication)*	
2004-2005	Devapriya Roy, Vivek Shaw	Ahbirup Dam
2005-2006	Arka Chattopadhyay, Kausik Baisya	Priyankar Dey
2006-2007	Sharmishtha Ghosh (Joint Publication)	Debojyoti Mondol
2007-2008	Avishek Ghoshal,	Soumik Ghosh
	Sharmishtha Roy	